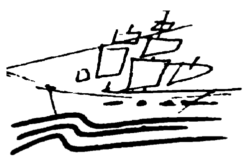
মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল

অভিজিৎ সেন



ঙ চি ল

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৬৫

প্রকাশক
অনিমা বিশ্বাস
গাঙচিল
'মাটির বাড়ি'
ওঙ্কারপার্ক, ঘোলাবাজার
কলকাতা ৭০০ ১১১

পরিবেশক
দোয়েল
শাখা অফিস ও বিক্রয় কেন্দ্র
৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

ছেপেছেন
ডি. ডি. অ্যাণ্ড কোং ৬৫ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদচিত্র ও অলংকরণ
হিরণ মিত্র

শ্রীমতী সমাপ্তি ঘোষ
শ্রীসুজিত ঘোষ
কল্যাণীয়েষু

উপন্যাস শুরুর আগে

আজ থেকে সতেরো-আঠারো বছর আগে যামিনীমোহন ঘোষ, আই. সি. এস-এর লেখা একখানা চটি বই আমার হাতে আসে। বইখানার নাম Magh Raiders in Bengal. ষোলো-সতেরো শতকে বঙ্গোপসাগরের পর্তুগিজ হার্মাদ এবং মগদের যৌথ জলদস্যুবৃত্তি বাংলার উপকূল অঞ্চলের নদীতীরবর্তী গ্রামগুলোকে জনশূন্য করে ফেলেছিল।

এই যে প্রায় তিনশো বছর ধরে এই রকম একটা লাগাতার উৎপাত বাংলার মানুষের অশেষ দুঃখদুর্দশার কারণ হয়েছিল তার কোনো ইতিহাস বা নির্ভরযোগ্য বিবরণ আমাদের সমসাময়িক দলিল বা কাব্যকাহিনিতে কোথাও বিশেষ কিছু নেই।

আমার স্মৃতিতে কয়েকটা শব্দ আছে, মউগ্যা, মঘাই দা, মগের মুল্লুক, মগ্‌রা, রোমার কাত্তিক, এই রকম আরো দু-চারটা হয়তো চেষ্টা করলে মনে পড়বে। 'মউগ্যা' অর্থাৎ মগপরিবাদে দুষ্ট বংশের মানুষ। মঘাই দায়ের ধাতব অংশ অনেকটা লম্বা হয়। 'মগ্‌রা' শব্দটা আমরা বরিশালের বাঙালেরা এখনো, এদেশে পঞ্চাশ বছর পার করেও, ব্যবহার করি। অর্থ—(মগের মতো) একগুঁয়ে। 'রোমার কাত্তিক' অর্থাৎ রোমান ক্যাথলিক।

যামিনীমোহন ঘোষের লেখায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কিংবা কায়স্থ কুলপঞ্জি থেকে উদ্ধৃত কিছু শ্লোক আছে। পরে এ বিষয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে মগ বিষয়ের যে কোনো লেখাতেই এই শ্লোকগুলোর উদ্ধৃতি পেয়েছি। অল্পশিক্ষিত সংস্কৃতে লেখা সেই শ্লোকগুলোর একটি 'ততঃ সুরূপা-মনিরূপা-কর্পূরমঞ্জরী এতাঃ কন্যা মঘেন নীতা' একটি উপন্যাস নির্মাণের প্রেরণা হতে বাধ্য।

ষোলো-সতেরো কিংবা আঠোরো শতকে এই সব ঘটনা ঘটেছিল। মগ-পর্তুগিজ দৌরাত্ম্যে নানা ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক বিপর্যয় তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে সুরূপা-মনিরূপা-কর্পূর মঞ্জরীদের ব্যক্তিগত ট্রাজেডি, তাদের মা-বাপ-ভাইদের পারিবারিক ট্রাজেডি। তৈরি হয়েছে ভরার মেয়েদের কাহিনি। আর এসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতপাত নিয়ে সামাজিক কদাচার, মগরা ব্রাহ্মণ্য বা ব্রাহ্মণ্য মগরামি। জড়িয়ে আছে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও অন্যান্য সমুদ্র বণিক, বঙ্গোপসাগরে তাদের বাণিজ্য এবং পারস্পারিক দ্বন্দ্ব।

অভিজিৎ সেন

"কিন্তু এক লেখকের পঞ্চাশটি গল্প পরপর (পড়া)? তাও আবার এমন পাঠক যার বিস্ময়বোধ আর তেমন অবশিষ্ট নেই, অগ্নিমান্দ্য দোষে না ভুগলেও আস্বাদন কিঞ্চিৎ উদ্গারপ্রবণ। কী যাদু আছে অভিজিৎ সেনে যে তিনি এমন টেনে রাখতে পারেন?"

অমিয় দেব

"পরিস্থিতির বৈচিত্র্য উদ্ভাবনে, চরিত্র পরিকল্পনায়— বিশেষ করে নারী চরিত্রের একেবারে স্বতন্ত্র সংকট উদ্ঘাটনে লেখকের সিদ্ধি প্রথম শ্রেণীর।... বিস্মিত হয়েছিলাম তাঁর উপন্যাস পড়ে— আরো বিস্ময়কর লাগল তাঁর গল্পের মানুষের মেলা।"

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

"একসঙ্গে এতগুলো গল্প পড়তে পড়তে মন হয়েছে, এই গল্পকারের (এবং ঔপন্যাসিকেরও) এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা এতদিন পর্যন্ত অন্য কোনো কথাশিল্পীর লেখায় পাইনি। তাছাড়া, একসঙ্গে এত বৈচিত্র্যের সমন্বয়? বোধহয় না।"

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

অনেক বছর বাদে তার দ্বিতীয় বিবাহের দিনে শর্মিষ্ঠার তরফে আউলাকেশি দেছেলবা এবং ক্ষেমংকরের তরফে স্বয়ং ফৌজদার ইউসুফ জাহাঙ্গিরকে নিয়ে উকিল এবং সাক্ষীরা যখন অন্দরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'সায়েমা বিবি, মহম্মদ নাসির দুশো টাকা দেনমোহরের বদলে তোমাকে শাদি করতে চান। তুমি কি তা কবুল করলে', শর্মিষ্ঠা চুপ করে বসে থাকল।

শর্মিষ্ঠার, গতকালই যাঁর ধর্মান্তর হয়ে নতুন নাম হয়েছে সায়েমা, তখন হঠাৎ তার শিশুবয়সের সবসময়ের পাহারাদার বোবা আবুর কথা মনে পড়ল।

শর্মিষ্ঠার নাম তখন ছিল খুকি, বয়স খুব বেশি হলে ছয়। সেই সময় সতেরো-আঠারো বছরের আবুকে বিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্যর বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দিয়ে গেল তার বাপ। অন্য সব বাইরের কাজ ছাড়াও বিষ্ণুপ্রিয়র এই দুরন্ত মেয়েটিকে শুধু দেখাশুনা নয়, রক্ষা করার দায়িত্বও যেন এসে পড়েছিল আবুর উপরে। একটা

সময় এমনও হল হাজার কাজকর্মের মাঝখানে আবুর একটা বাড়তি ইন্দ্রিয় অথবা সব কটা ইন্দ্রিয়র একটা বাড়তি তৎপরতা খুকির জন্য সজাগ থাকত। আবুর অবশ্য দুটো প্রধান ইন্দ্রিয়রই অভাব ছিল। তা সত্ত্বেও বিষ্ণুপ্রিয়দের মনে হত এই বালিকাকে রক্ষা করার কাজে আবুর কোনো বিকল্প নেই।

আবু তাকে একবার কুমিরের মুখ থেকে টেনে আনে। একবার কুড়াল হাতে সামনে হেঁটে যাওয়া আবুর পিছন পিছন ছুটতে গিয়ে খুকির কপালে ধারালো কুড়ালের ফলা লেগে যায়। আবুর বোবা চিৎকারের বীভৎসতায় খুকি নিজের ব্যথা এবং তজ্জনিত কান্না সব ভুলে গেল। বোবা মানুষের আর্তনাদ চারদিক থেকে ঘিরে বল্লমে বেঁধা পশুর চিৎকারের থেকেও ভয়াল।

খুকি আতঙ্কে নিজের ব্যথা ও রক্তপাত ভুলে গেল। বিস্মিত, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে বোবার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ইঙ্গিতে চিৎকার করতে না করল তাকে। বোবা আবু চিৎকার থামাল এবং অবাক হয়ে বুঝবার চেষ্টা করল খুকিকে।

সেই থেকে শব্দের পৃথিবীতে আবুকে খুকির পাঠ দেওয়া শুরু। বাবা, মা, খাব, উঃ, আঃ,— এ রকম প্রাথমিক পাঁচিশ-ত্রিশটি শব্দ বোবা শিখল খুকির প্রত্যক্ষ শিক্ষকতায়। এ যেন একটা খেলা, যখন টের পেল, দু'জনেই প্রবল উত্তেজনা। আবার যখন টের পেল, এ হল অধ্যবসায়, দু'জনের কী ঐকান্তিক নিষ্ঠা!

সেই বোবা আবুকে কেন মনে পড়ল তার?

বাঙালি ঘরে শিশুকন্যা তিন বছর বয়স থেকেই জানে বিয়ে কাকে বলে। প্রায় ওই বয়স থেকেই তাকে যেসব কথা বলা হয়, যেসব ব্রত পালন করতে শেখানো হয়, তার মধ্যে সতিন কী, সতিনের জ্বালা যন্ত্রণা কাকে বলে। সেসব পাঠ থাকে। শিশুকন্যাকে আদর করা হয় তাকে রাজপুত্তুরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার বা লোভ দেখিয়ে। ভয় দেখানো হয় ঠিক এর উলটো করে।

'তোরে বোবার লগে বিয়া দিমু, দাড়া, হারাডা দিন বোবার লগে সুবারি গাছ বাইতে পারবি তহন!' এ রকম শাসানি কিংবা 'কিলো খুকি, বোবারে বিয়া করবি?' এ রকম রসিকতা তাকে শুনতে হত।

এসব শুনে সুন্দরী খুকি কখনো আরক্তিম হত, কেননা সে অনেকটাই জানত

যারা এসব কথা বলত তাদের মধ্যে একজন ছিল তার ঠাকুরমা, সে বুড়ি তার বিয়ের এক বছর আগেই মারা যায়। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও বৃদ্ধা কবিরাজকে বলেছিল, 'আমারে নাতিন জামাই দেইখ্যা যাওয়ার মতো পরমায়ু দেন, স্যানমশায়! আমি নাতিন-জামাই দেখুম।'

কিন্তু সে সাধ আর তার মেটেনি। বস্তুত, তার মৃত্যুর কারণে শর্মিষ্ঠার বিয়ে এক বছর পিছিয়ে দিতে হয়।

আর একজন তাদের বাড়ির তথা গ্রামের ধাই পিরমি। পঞ্চাশোর্ধ্ব এই স্ত্রীলোকটিকে খাতির করত না এমন বউঝি তাবৎ অঞ্চলে ছিল না। আবার তার অবাধ অশ্লীল মুখখানাকে ভয় করত না এমন কোনো পুরুষমানুষও অঞ্চলে ছিল না।

সে বলত, 'বোঝলেন সোনা বউ, এই পাঁচিশ-ছাব্বিশ বছরে কম-সে-কম আড়াই-তিন হাজার পোলা-মাইয়া বাইর করছি কিন্তু আপনার মাইয়ার মতো এমন সুন্দরী আর একখানও বাইর করি নাই।'

তারপর স্নেহঝরা চোখে খুকির দিকে তাকিয়ে কিছু রসিকতা করত। হামেসাই যেসব রসিকতায় অশ্লীলতা থাকত। খুকির মা সত্যভামা তখন বলত, 'ইস্!' মুখখান ধুইয়া একখান পান খাও ঠাকুরঝি।'

সেই পিরমি তাকে এই কথাটা প্রথম বলেছিল। অনেক কথার মধ্যে এই কথাটা তার মনে আছে কথাটার মধ্যে যে অপরিচিত বৈচিত্র আছে, সেই কারণে। একদিন আবুর পিছনে পিছনে তাকে দৌড়তে দেখে বলেছিল, 'ও খুকিবিবি, ও খুকিবিবি, থামো থামো, আবু মুসার পোলা আবু নিশার এক লক্ষ ট্যাহার দ্যানমোহরের বদলে তোমারে শাদি করতে চায়। তুমি হেয়া কবুল করলা? কবুল?'

হারিয়ে গিয়েছিল সে। উকিল আবার জিজ্ঞেস করল, 'বিবি সায়েমা, মহম্মদ নাসির দুশো টাকা দেনমোহরের বদলে তোমাকে শাদি করতে চান। তুমি কি কবুল করলে?'

চার পাঁচ ক্রোশের মধ্যে যে সমুদ্র, সেই সমুদ্র দিয়ে দেশি-বিদেশি সওদাগরের নাও পুবমুখী পশ্চিমমুখী যায়। সওদাগরের নৌকা যায়, দুর্দান্ত মগের কোশা শিকার ধরার উদ্দেশ্যে এধারে-ওধারে চলা-ফেরা করে,

নদীনালার মুখে, সমুদ্রের আনাচে-কানাচে ওত পেতে থাকে। মগদের দোসর যারা বড় বড় জাহাজ নিয়ে বাঙালখাড়ি এফোড়-ওফোড় করে, সেই পর্তুগিজরা বাণিজ্য করে বড় বড় জাহাজ নিয়ে। বাণিজ্য করে আবার জলদস্যুবৃত্তিও করে। সুবর্ণরেখা, গঙ্গা, মেঘনা, ইরাবতীর মোহনায় সওদাগরি বহরের উপরে হানাদারিতে লাভ অনেক। মগের কোশা উপকূলের বিশ পঁচিশ ক্রোশ ভিতরে পর্যন্ত ঢুকে আসে, গ্রামকে গ্রাম লুঠ করে। খুন জখম ধর্ষণ করে। বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ ধরে নিয়ে গিয়ে দাস বাজারে কিংবা পর্তুগিজদের কাছে বিক্রি করে। পর্তুগিজরা আবার সেই দাস দাসীদের দূর দূর দেশে নিয়ে যায়। বাংলার দাস দাসীদের সুনাম ভারত সমুদ্রের সীমানা ছাড়িয়ে অতলান্ত সাগরের কিনারার দেশেও শোনা যায়। যেমন নরমসরম এবং সুন্দর তাদের চেহারা, তেমনি ভালো তাদের স্বভাব চরিত্র। আফ্রিকা, এমনকী দক্ষিণ ভারতের দাস দাসীদের মতো তারা ক্রোধী নয়, হিংস্র নয়।

সমুদ্রের চার-পাঁচ ক্রোশের মধ্যেও যারা থাকে, তাদের অধিকাংশই সমুদ্র কোনোদিন দেখেনি। কেউ কেউ শুনেছে সমুদ্রের জলের শেষ সীমানা নেই। সেই জল লবণাক্ত। সেখানে শুধু হার্মাদ আর মগেরাই নৌকা কিংবা জাহাজে চলাফেরা করে বেড়ায়।

এই হল অরাজকতা বা মগের মুলুকের উপকূল। সুবর্ণরেখার পিপলি বন্দর থেকে ইরাবতীর মোহনা পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। মগদের রাজা আরাকানের সীমানা চট্টগ্রামের পশ্চিমের যাবতীয় জলস্থল অন্তরীক্ষ তার দুর্দান্ত প্রজাদের উপহার দিয়েছে। যেমন তেমন উপহার নয়, যা খুশি তাই করার অঙ্গীকারে এই বিস্তৃত ভূ এবং জলখণ্ড ভোগ করার উপহার। এমন শোনা যায় যে মগদের দেশে ভয়ে আকাশে পাখিও ওড়ে না।

এর ফলে পনেরো শতক থেকে আঠেরো শতক পর্যন্ত মোটামুটি সময়ে এই অঞ্চলের শুধু যে ধর্ম, সমাজ, জাতপাতের অনুপাত বা রূপ ভিন্ন হয়ে যায়, তাই নয়, এই শয়ে শয়ে বা হাজারে হাজারে যোজন বিস্তৃত এই অঞ্চলের ভূগোলও পালটে গিয়েছিল। জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল অযুত জনপদ, বনভূমি এসে গ্রাস করেছিল সেইসব অঞ্চল। লক্ষ লক্ষ মানুষ উৎখাত হয়েছিল, লক্ষ মানুষ হারিয়েছে তার স্বজন, বিচ্ছিন্ন হয়েছে স্থানকালপাত্রের স্বাভাবিক অবস্থান থেকে। বাংলার খাড়ির উপকূল আবাদের সময় মানুষ জঙ্গলের পশুকেও এভাবে উৎখাত করেনি, যেমন মগ এবং পর্তুগিজেরা

মানুষকে নিধন করেছে, উৎখাত করেছে। মানুষের চরিত্রের মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা, লোভ, ভয়াবহতা আছে, পৃথিবীর অন্য কোনো জানোয়ারের মধ্যে তেমন নেই।

মগ হার্মাদের দৌরাত্ম্যকে আশ্রয় করে এই সময়ে বাংলার উপকূলে আরো বিচিত্র কাণ্ড ঘটতে শুরু করে। ব্রাহ্মণ্য আত্মনিগ্রহ জাতপাতকে আশ্রয় করে সমাজকে রক্ষা করার নামে, নিষ্কলুষ রাখার ছলনায় সমাজ দেহকেই ধ্বংস করতে শুরু করে। পৃথিবীতে এমন দেশ বিরল যেখানে হতভাগ্য নিগৃহীতদেরই সমাজ দণ্ড দেয়, এমন দণ্ড যা বংশানুক্রমে চলতে থাকে। শর্মিষ্ঠা সদ্যসদ্য এই বিগ্রহের একটা চরম পর্যায় পার হয়ে এসেছে।

শর্মিষ্ঠা ওরফে সায়েমাকে আউলাকেশি দেছেলবা বলল, 'কও দিদি, কবুল। কবুল কর দিদি। মানুষের বাইচ্যা থাকাটা মানুষের বড় ধর্ম। সেই মহাধর্ম পালন করতে গিয়া তুমি হিন্দু থাক, না খ্রিস্টান হও, না মুসলমান হও, সব পরের বিবেচনা। আমি তোমার থিকা কম দুঃখী না, কম জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করি নাই। কও দিদি কবুল? মানুষের ধর্ম মানুষ থাকা, আর সব বাইরের।'

শর্মিষ্ঠা ওরফে সায়েমা চুপ করে ছিল। চুপ করে ছিল এই কারণে নয় যে ধর্মান্তরিত হতে তার মানসিক বিপর্যয় হয়েছে। এই কারণে নয় যে আউলাকেশি অপেক্ষা জীবনকে এই কদিনেই সে কিছু কম বুঝেছে। এই কারণে যে সে তার এত কালের জীবনধারণা থেকে বিচ্যুত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন উপলব্ধিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ জিনিসটা ধাতস্থ হতে সময় লাগে।

সে অস্ফুটে বলল, 'কবুল!'

আউলাকেশি তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল মুখে। কারা যেন কলকল করে বলে উঠল, 'কবুল করছে, কবুল করছে বিবি।' ভিতরের আঙিনা থেকে খুরশিদা বেওয়ার গানের দল কলকণ্ঠে বিয়ের গীত শুরু করল ঢোলক বাজিয়ে। বিচিত্র সেই গানের পদ যা শর্মিষ্ঠা আগে কখনো শোনেনি। বিচিত্র তার সুর। ভালো লাগছে তার। ভালো লাগতে শুরু করল তার। খুরশিদা তার জন্য সবার দোয়া মাগে·

উজান বাইয়া আইলোরে নাও আল্লা
ভাটি বাইয়া যায়,

আল্লা ধর ধর ধররে নাও
ধরন নাহি যায়।
আইবুড়া সায়েমা হাজির না হইলে
আল্লা জোড়ে হাজুত দেয়,
পানির কুম্ভীর বনের বাঘা আল্লা
তারাও দোয়া দেয়।
উজান বাইয়া আইলোরে নাও আল্লা
ভাটি বাইয়া যায়—

আউলাকেশি শর্মিষ্ঠার মুখখানা দুহাতের মধ্যে ধরে রেখে বলল, 'আইজ তোমারে একখান কথা কই মাইয়া, তোমার মতো আমিও মগের উচ্ছিষ্ট, মউগ্যা। আরো একখান কথা শোন মাইয়া, তোমার বাপ বিষ্ণুপ্রিয় সম্পর্কে আমার জ্ঞাতি ভাইপো। হেই সুবাদে তুমি আমার নাতিন। তুমি এসব কথা জান না, কারণ যে মাইয়ারে মগে হার্মাদে টানাটানি করছে, হের লগে কেউ সম্পর্ক স্বীকার করে না। এখন তোমার লগে আমার নতুন কইর‍্যা সম্পর্ক হইল। ভালো থাকপা তুমি, ক্ষেমংকর মানুষটা সাচ্চা।'

২

কার্তিক মাসের প্রথম শনিবারে বঙ্গোপসাগরের ভিতর দিক থেকে আচমকা একটা ঝড় উঠে এসে মেঘনা নদীর উপকূলে আছড়ে পড়েছিল। বছরের এই সময় যখন মৌসুমি বায়ুর ফেরার পালা, তখন এ ধরনের ছোট ও বড় ঝড় কখনো-কখনো হয়। ঝড় যদি তেমন শক্তিশালী হয় তাহলে পনেরো-ষোলো হাত উঁচু সমুদ্রের ঢেউ উপকূলে অনেকটা ভিতর পর্যন্ত ধাওয়া করে আসে। এমন নয় যে প্রতি বছরই এ রকম ঝড় এসে উপকূলে আছড়ে পড়ে। তবে

পাঁচ বছর সাত বছরের মধ্যে একটা দুটো সামুদ্রিক ঝড় যা মহীরুহকে উপড়ে ফেলে, সমুদ্রকে দশ ক্রোশ ভিতরে ঢুকিয়ে আনে। শস্য, বৃক্ষ, উদ্ভিদ ধ্বংস করে, দূষিত করে সমস্ত পুকুর ও জলাশয়। দেশে রাজা কিংবা প্রজা কর্তৃক মহাপাপ সংঘটিত হলেই এমন হয়, আর মহাপাপ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার কেউ নেই। ব্যাপক ধ্বংস ও জীবনহানি হয়, দীর্ঘ সময় ধরে হতে থাকে। কখনো এমন হয় উঁচু গাছের ডালপালা ছাড়া আশ্রয়ের আর কোনো স্থান থাকে না।

শনিবারের ঝড়টা এমন শক্তিশালী ছিল না। তবুও সোহাগপাশার ফৌজদার ইউসুফ জাহাঙ্গিরের কাছে (যে নিজেকে এ অঞ্চলে মোগল নওয়ারার মিরবহর বলে) পরদিন অর্থাৎ রবিবারে খবর আসে যে মেঘনার দ্বিতীয় মুখ ইলশা নদীর চড়ায় একখানা বড় জাহাজ আটকে আছে। ঝড়ই যে জাহাজখানাকে বিপথে চালিয়ে নিয়ে এসেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা মেঘনা নদীর উভয় মুখেই জলের গভীরতা এত কম যে কোনো ইউরোপীয় জাহাজ এই পথ দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। এই জাহাজখানা দেশীয় বা আরবি জাহাজ নয়।

সোহাগপাশার অবস্থিতি ইলশা নদীর মোহনা থেকে উত্তরে অর্থাৎ নদীর চার-পাঁচ ক্রোশ উপরে। সোহাগপাশা বন্দর কিন্তু সেখানে সামুদ্রিক জাহাজ আসার মতো ব্যবস্থা নেই। বস্তুত মেঘনার এই দ্বিতীয় মোহনায় সমুদ্রের গভীরতা এত কম যে সমুদ্রের জাহাজ ঢুকতে পারে না। সোহাগপাশা তাই নদী বন্দর এবং ফৌজদারের সদর দপ্তর হিসাবে একটি ব্যস্ত শহর হয়ে গড়ে উঠেছে। ইউসুফ জাহাঙ্গির যেহেতু মূলত এই নদী-নালা-জঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলের ফৌজদার, তার মূল দায়িত্ব অবশ্য সমুদ্রপথে আসা বহিরাগত জলদস্যুদের প্রতিহত করা। সে এ অঞ্চলে মোগল নওয়ারার প্রধানও।

খবর পাবার পর ইউসুফ জাহাঙ্গিরের বহরের খানদশেক কোশা এবং ঘুরাব যুদ্ধযান বড় জাহাজখানাকে ঘিরে ফেলল। না, দেশীয় বাঘেলা বা ঢাঙ্গি নয়, আরব্য ধাও ও নয়। যদিও ঝড়ে পতাকা এবং পাল ছিড়ে গেছে, তবুও চেনা যাচ্ছে অন্তত তিন হাজার মনি ইউরোপীয় জাহাজ। ইউসুফ জাহাঙ্গিরের যে দলটি জাহাজখানা ঘিরেছে তাদের দলপতি ইগনেশিয়াস ডি সিলভা। সে পর্তুগিজ ফিরিঙ্গি এবং ইউরোপীয় ভাষা জানে। জাহাজখানার নাম পোর্টা মারিয়া। ছেঁড়া পতাকাতে প্রমাণ সেখানা ওলন্দাজ। জাহাজখানা

বাণিজ্যতরী। কিন্তু ইগনেশিয়াস কামান সাজিয়ে চিৎকার করে কাপ্তানকে বাইরে বেরিয়ে আসতে আদেশ দিল। কেননা, ভারত সমুদ্রে, বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যতরী এবং জলদস্যুদের জাহাজে কোনো তফাত নেই। যে বণিক, দস্যু হতে তার মুহূর্ত দেরি লাগে না।

জাহাজের কাপ্তান এবং একজন বিশিষ্ট ওলন্দাজ বণিক জাহাজ থেকে কোশায় নামলে ইগনেশিয়াস তাদের সোহাগপাশার ফৌজদারের কাছে নিয়ে এল। ঝড় থেমে গেলেও মাঝেমধ্যেই জোরালো এক এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে। ওলন্দাজ বণিক লোকটি জ্বরে ভুগছে, তার চিকিৎসার দরকার। জাহাজের চিকিৎসকের ওষুধে তার জ্বর কমছে না। কাজেই ফৌজদারের কাছে তার প্রার্থনা যাতে কোনো ভালো চিকিৎসক তাকে একটু দেখে। ইউসুফ জাহাঙ্গির তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক তথা নওয়ারার সেরা কবিরাজ ক্ষেমংকর সেনকে ডেকে পাঠাল।

জাহাজের কাপ্তান ফৌজদারকে একটি হিরের আংটি উপহার দিল এবং তার জাহাজ মেরামতির বন্দোবস্তের জন্য সহায়তা প্রার্থনা করল। উপরন্তু এই অগভীর নদী মুখ থেকে জাহাজকে গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাওয়ার উপায় জানতে চাইল।

ইউসুফ জাহাঙ্গির নওয়ারার জ্যোতিষী রামরতন ভট্টাচার্যকে ডেকে পাঠাল এবং জানতে চাইল সামনে ভরাকোটাল কবে।

ভট্টাচার্যের পাঁজি দেখতে হল না। বলল, সামনের আঠারোই কার্তিক অমাবস্যার দিন সমুদ্রে ভরাকোটালের বান আসবে। জাহাজ সেদিন সমুদ্রে নেমে যেতে পারবে বলেই মনে হয়।

মেরামতির বন্দোবস্ত হলে ইউসুফ দুই বিদেশিকে খানাপিনায় আপ্যায়ন করল। ওলন্দাজ বণিকের নাম ইয়েকব। মিরবহরের আপ্যায়নে সে সম্মানিত হল বটে কিন্তু দুর্বল এবং জ্বরতপ্ত শরীরে সে খাদ্য কিংবা পানীয় তেমন গ্রহণ করতে পারল না।

ইতিমধ্যে ক্ষেমংকর এসে পড়াতে ইয়েকবকে অতিথিশালায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। খেতে খেতে কাপ্তান জানাল গত পরশুদিন কুড়ি-পঁচিশখানা জালিয়া এবং কোশা নৌকার একটা বহরকে তারা পশ্চিমমুখী

যেতে দেখেছে। কোশাগুলো আকারে ছোট হলেও প্রায় চিনা জাংকের মতো শক্তিশালী যুদ্ধ যান।

ইউসুফ জাহাঙ্গির চিন্তিত হল। জিজ্ঞেস করল, 'আরোহীরা এ দেশীয়?'

কাপ্তান 'বলল, 'আরোহীরা চিনাদের মতো, মঙ্গোলীয়।'

ফৌজদার আরো চিন্তিত হল।

কাপ্তানের যা বর্ণনা তাতে কোশায় চড়ে ইলশার মোহনা পার করে যারা সুন্দরবনের দিকে চলে গেছে, তারা মগ জলদস্যু ছাড়া আর কেউ নয়। মির কাপ্তানের কাগজপত্র তার দপ্তরে জমা রাখার নির্দেশ দিল। বঙ্গোপসাগরের বাণিজ্য এবং রাজনীতি দুইই দ্রুত পালটাচ্ছে। ইউসুফ জাহাঙ্গির সতর্ক প্রশ্ন করল কাপ্তানকে।

'কোথা থেকে জাহাজ ভাসিয়েছেন আপনি?'

'মসুলিপত্তন থেকে।'

'কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল?'

'বাটাভিয়া।'

ইউসুফ জানে আচে থেকে বালি অবধি বন্দরগুলোর দখল এখন ওলন্দাজদের হাতে। এ অঞ্চলের মশলার ব্যবসায়ে কোনো ভাগীদার তারা বরদাস্ত করছে না। বেশির ভাগ মোগল ফৌজদারের মতো সমুদ্রবাণিজ্যে তারও কিছু পুঁজি খাটে।

আগেকার সুবেদার মিরজুমলা আসলে সমুদ্রবণিকই ছিল। শায়েস্তা খানেরও বিশাল পুঁজি নিয়োজিত আছে বাণিজ্যে। কিন্তু এই মুহূর্তে বোধহয় বাণিজ্য থেকে রোজগারের প্রয়োজন আর নেই তার। শোনা যায় দৈনিক এব লক্ষ টাকা খরচ করে সুবেদার। সোনার বাংলায় ক্ষমতাশালী মানুষের টাকা রোজগারের অজস্র উপায়।

ইউসুফ কাপ্তান ইয়েকবের সঙ্গে বুঝেশুনে আচরণ করে। সুবেদার মগদের দমন এবং তাদের হাত থেকে চট্টগ্রাম কেড়ে নেবার জন্য বাটাভিয়ার ওলন্দাজদের সাহায্য নিচ্ছে।

৩

ব্রাহ্মণপ্রধান ধাত্রীনগর গ্রামে বাৎসরিক কালীপুজোর প্রচলন আছে। এবার কালীপুজো আঠেরোই কার্তিক। বিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্যের বাড়িতে পুজো না হলেও তার জ্ঞাতিদের বাড়িতে হয়।

বিষ্ণুপ্রিয় আচার-আচরণে এবং বিশ্বাসে বৈষ্ণব।

এই গ্রাম পত্তনিতে চন্দ্রদ্বীপরাজের অনুগ্রহ ছিল। তাদের তান্ত্রিকগুরুর স্বজন ছিল এই গ্রামের আদিপুরুষরা। তান্ত্রিক দেবদেবীর পুজোআচ্চা এখনো এ গ্রামের বেশির ভাগ পরিবারে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

কেবল বিষ্ণুপ্রিয় আদি, দু-তিনটি পরিবার এক বা দুই প্রজন্ম আগে থেকেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রবর্তিত ভক্তিধর্মস্রোতে অবগাহনের প্রচেষ্টা শুরু করেছে। প্রচেষ্টা বলাই ভালো, কেননা শাক্তপ্রধান এই গ্রামটিতে বৈষ্ণব আচরণ তেমন সহজ ছিল না।

তবে যে কোনো রকম ভাবস্রোতকে আত্মস্থ করার এবং প্রচলিত প্রধান স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে নেবার বাঙালিসুলভ প্রচেষ্টার অভাব কোনো দিনই এদেশে ছিল না।

ফলে বিষ্ণুপ্রিয় ইত্যাদি তিনটি পরিবারের দৈনন্দিন ধর্মাচার থেকে শাক্ত অনুষ্ঠানের উগ্রতা কমলেও একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি। নিজেদের বাড়িতে কালীপুজো না হলেও বিষ্ণুপ্রিয়র বাড়ি থেকে শরিকদের বাড়ির মণ্ডপে একটি উপাচারপূর্ণ তামার খুঞ্চা নিবেদনের জন্য যেত।

সকালে স্ত্রী সত্যভামা যখন নৈবেদ্যর খুঞ্চায় ধূপ-দ্বীপ-ফুল-বেলপাতা-সুপারি-আতপচাল-নারকেল ইত্যাদি সাজাচ্ছিল, বিষ্ণুপ্রিয় তখন বাড়িতে মাছ বিক্রি করতে আসা জেলের সঙ্গে দরদামে প্রবৃত্ত।

তাদের সংসারে দুই কন্যা, বিষ্ণুপ্রিয়র একজন স্বামী-পরিত্যক্ত বোন, যার যৌবন এখনো যায়নি এবং একজন দাসী ও একজন ভৃত্য ছিল। এতগুলো মানুষের ব্যঞ্জনের জন্য মাছ খুব কম লাগার কথা নয়। মাছ বাছা হয়ে গেলে বিষ্ণুপ্রিয় তার স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'দেখ, এইতে হইবে তো?'

সত্যভামা পিছন ফিরে বলল, 'আমি আবার কী দেখুম', পরে মাছ দেখে বলল, 'অত মাছ নিতে আছ, ভাজতে তেল লাগবে কত হিসাব আছে?'

বিষ্ণুপ্রিয় উদার হেসে বলল, 'আইজ উৎসবের দিন, মাইয়ারা আনন্দ করইয়া খাইবে।'

বিষ্ণুপ্রিয়র পরিবার বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত হওয়ার কারণে মাংসাশী নয়। কিন্তু বাঙালি কেন যেন মাছকে পুরোপরি আমিষ মান্যতা দিতে রাজি নয়। তাই গৃহী বৈষ্ণবদের বাড়িতে মাছ নিয়মিতই ভোজ্য তালিকায় থাকে।

দাম মিটিয়ে নিয়ে জেলে চলে যেতে বিষ্ণুপ্রিয় দাসীকে ডেকে বলল মাছগুলো নিযে যেতে।

সত্যভামা বলল, 'বাড়িতে কালীপুজোর আয়োজন করলেই হয়। পরের বাড়িতে খুঞ্চা নিয়া যাইতে অপমান লাগে।'

বিষ্ণুপ্রিয় বলল, 'ও কথা কইও না। কালী আমাগো আরাধ্যা না। আমরা বৈষ্ণব, মহাপ্রভুর নব্য ধর্মের অনুসারী। শক্তিপুজোর আড়ম্বর এখন ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়লেও, সেও তো অর্বাচীন। আমাগো ঠাকুরদাদার আমলেই ঘরে ঘরে এমন কালী কিংবা চণ্ডীপুজোর আয়োজনের কথা শোনা যাইত না। শক্তিদেবীরা বড় বেশি তামসিক।'

সত্যভামা আর একবার চেঁচিয়ে দাসীকে বলল, 'আইশঠা জায়গায় গোবর-ন্যাতা বুলাইলি না, সাবিত্রী?'

একজন ভিখারিনি এসে অঙ্গনে দাঁড়াল।

'জয় নিতাই, জয় রাধারানি, একমুঠা ভিক্ষা দেবে গো দিদি?'

সত্যভামা তার বড় কন্যা শর্মিষ্ঠাকে ডেকে বলল, 'একমুঠা ভিক্ষা দে চন্দ্রাকে খুকি।' তারপরে ভিখারিনিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোরা নবদ্বীপ থিকা কবে ফিরলি চন্দ্রা?'

চন্দ্রাবলী নামের বোষ্টমী কাঁধের ঝোলা নামিয়ে গোবর-নিকানো আঙিনার একপাশে গুছিয়ে বসল। বলল, 'এই তো পাঁচ-সাত দিন হল ফিরেছি দিদি। আহা কত কী দেখলাম গো, কত বড় বড় গোঁসাই, আখরা

আর লীলাকাণ্ড, কত আশ্রম, গোঁসাইদের পায়ের ধুলো ছড়ানো পথঘাট, সেথার বৃক্ষলতাও যেন কেষ্টনাম করে গো! আহা-হা-জয় নিতাই, জয় নিতাই!'

চন্দ্রাবলীর চোখ চিকচিক করে উঠল।

তার কথা বলার সময় সত্যভামা চন্দ্রার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে ছিল। একটু বিস্মিত চোখের দৃষ্টি তার। চন্দ্রা থামতেই সে বলে উঠল, 'ওমা, চন্দ্রা, তোর মুখের ভাষা দেখি একেবারে পালটাইয়া গেছে। তিনমাসে তোর তো অনেক উন্নতি হইছে!'

বিষয়টা বিষ্ণুপ্রিয়ও খেয়াল না করে পারেনি। সে নিজে কিশোর বয়সে তিন বছর বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদ্বীপে ছিল। তাদের বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের জোরালো পুরুষালি ভাষার কাছে শান্তিপুর নবদ্বীপের ভাষা যে মধুর শোনায়, সে তো তার ভালোই জানা আছে। সেই কিশোর বয়সে নবদ্বীপের সতীর্থদের কাছে ভাষার কারণে লাঞ্ছনা কম জোটেনি। এমনকী তাদের সংস্কৃত উচ্চারণও কর্কশ এবং স্থূল। তিন বছর থাকার পরেও শান্তিপুরি ভাষার টান এবং উচ্চারণ তার জিহ্বায় স্পষ্ট হয়নি। মাঝখান থেকে তার যা হয়েছে তা হল সারাজীবন ধরে এক মিশ্র মুখের ভাষা সে ব্যবহার করে যাচ্ছে। অথচ এই চন্দ্রাবলীর মুখে শান্তিপুরি ভাষার টান এবং মিষ্টত্ব কত অল্প সময়েই কেমন পাকাপাকিভাবে বসে গেছে!

সত্যভামা আবার বলল, 'পুণ্য তোরাই করতে পারো। আমাগো ঘর-গিরস্থি সামলাইয়া তো আর বিদেশ যাওয়া, তীর্থ করা কিছুই সম্ভব না। একদিন সময় কর্‌ইয়া আইস্, গপ্পো শুনুম তোর।'

কাব্য ও ব্যাকরণের পাঠ নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়কে পিতৃবিয়োগের কারণে দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল। এক বছর পরে সংসার আবার সুস্থিত হতে বিষ্ণুপ্রিয় চন্দ্রদ্বীপেরই ফুল্লশ্রীতে দু-বছর পড়েছিল। এভাবেই সে নবদ্বীপের অসম্পূর্ণ পাঠ সম্পূর্ণ করেছিল। অধিকন্তু সে ন্যায় এবং ফারসিতেও পাঠ নিয়েছিল।

সে একবার ভাবল চন্দ্রাবলীর কাছে নবদ্বীপের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের এবং বৈষ্ণব সাধকদের সম্পর্কে জানতে চাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই তার দ্বিধা হল। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর পঞ্চাশ বছর যেতে না যেতেই বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং উপগোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীপ্রধান তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের আরো খানিকটা দখল করবার জন্য

সবসময় চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিষ্ণুপ্রিয়র নবদ্বীপ বাসকালে একটি আশ্রমের মহান্তর ইহলীলা সংবরণ হতে তার দুই প্রভাবশালী শিষ্য আশ্রমের দখল নেবার জন্য নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা পর্যন্ত সংগঠিত করে। যথার্থ বৈষ্ণব মহাত্মাগণ যথার্থ বৈষ্ণব আদর্শ অনুযায়ী এইসব প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোয় এইসব ভণ্ডরাই এখন নবদ্বীপের একটা বড় অংশের এবং বড় বড় মঠের স্বামী।

'তোমরা কোন মঠের অনুসারী?' বিষ্ণুপ্রিয় চন্দ্রাবলীকে সতর্ক প্রশ্ন করল।

'আমরা প্রভুপাদ প্রেমানন্দ গোস্বামীর ঘরের লোক গো জামাই দাদা,' চন্দ্রাবলীর কণ্ঠের উচ্ছ্বাস উপস্থিত কারোরই কান এড়াল না।

সত্যভামার গ্রাম সম্পর্কে বিষ্ণুপ্রিয়কে 'জামাই দাদা' সম্বোধন করে চন্দ্রাবলী। বছর খানেক হল ধাত্রীগ্রামের রাধেশ্যাম বৈরাগীর বৈষ্ণবী হয়ে সে এ গ্রামেই বসবাস করছে। এই নিম্নবর্গের বোষ্টম-বোষ্টমিদের আচার-অভিচার-সামাজিক-বৈবাহিক এবং পারিবারিক রীতিপদ্ধতি ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের ধার ধারে না। অবশ্য 'ধার ধারে না' কথাটা বলা খুব সঙ্গত নয় হয়তো। আসলে তাদের এইসব ব্যাপার-স্যাপারে খুব গোপনীয়তাও পালন করে তারা। চার-পাঁচ প্রজন্ম আগেও সমাজের নিচু অংশের এইসব মানুষ বুদ্ধপন্থা, অঘোরপন্থা কিংবা অন্যান্য ব্রতচারী ধর্মাচারে আবদ্ধ ছিল। সংস্কারহীন, নানা কারণে অধঃপতিত এইসব মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অথবা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে এক সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি করছিল। মহাপ্রভুর 'হরের্নামৈব কেবলম' মহামন্ত্র এই প্রক্রিয়াকে বেশ খানিকটা রোধ করতে সমর্থ হয়েছে। দলে দলে এইসব নিম্নবর্গী মানুষ নিত্যানন্দ প্রভু সংগঠিত বৈষ্ণবীয় আধারে আশ্রয় পেয়ে প্রবল ইসলামিকরণের স্রোতকে বেশ খানিকটা ঠেকাতে পেরেছে। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে তারা তাদের প্রাক্তন তান্ত্রিক গুহ্যাচার কিংবা কদর্য জীবনাচারকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছে। নানাভাবে, নানা ধরনে, নানা গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের পূর্বতন ধ্যান-ধারণা এবং আচার, যাকে তারা সগর্বে সাধন বলে প্রচার করে, রয়ে গেছে।

'কোন পথ দিয়ে তোমরা নবদ্বীপ ধামে গেলে চন্দ্রাবলী?'

বিষ্ণুপ্রিয়র সেই কিশোর বয়সের নবদ্বীপে আর একবার ঘুরে আসার বাসনা মন থেকে কিছুতেই অন্তর্হিত হয় না। তার একা-পুরুষ-মানুষের

সংসারের কথা ছেড়ে দিলেও এই দুর্গম দীর্ঘ জলপথের বিপদের কথা ভেবে কখনোই আর মহাপ্রভুর বাল্যযৌবন লীলার সেই মহাপুণ্যস্থান দর্শন করার বাসনা চরিতার্থ হয় না। যে তিন বছর নবদ্বীপধামে সে ছিল, তখনো বোধ বুদ্ধি পরিপক্ক হয়নি। ফলে সবই যেন অসম্পূর্ণ রয়েছে। এখন এই পরিণত বুদ্ধিতে একবার যদি সে যেতে পারত!

'গেলাম একদল সওদাগরের সঙ্গে', চন্দ্রাবলী বলল, 'তাদের ছিল চল্লিশ-পঞ্চাশখানা নাও। আমাদের মতো আরো পনেরো-বিশখানা তীর্থযাত্রীর নাও, গেরস্থের নাও ভিড়ে গেল তাদের সঙ্গে। সেই বহর সোঁদরবনের ভিতর দিয়ে গিয়ে পড়ল ইছামতী নদীতে। ইছামতী দিয়ে গেলাম জলঙ্গি, তা বাদে তো গঙ্গা বেয়ে একেবারে নবদ্বীপের ঘাটে। সে এক এলাহি ব্যাপার।'

বিষ্ণুপ্রিয়র কানে 'এলাহি ব্যাপার' শব্দটা পৃথকভাবে আঘাত করল। 'এলাহি ব্যাপার!' কী অর্থ হয় শব্দটার? আরবি ইলাহি বাংলা বিশেষ্যর কেমন চমৎকার বিশেষণ দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলাভাষা যেন দু-হাতে বিদেশি শব্দ আত্মস্থ করছে। কাব্যের ভাষাও কি এ রকম দ্রুত বদলে যাবে? সে যত্ন করে ফারসি শিক্ষা করেছে। প্রথমত, ফারসি রাজভাষা, সম্যক জানা থাকলে তো বটেই, অল্প জানা থাকলেও মুসলমান রাজদরবারে অথবা রাজস্ব, নৌবহর কিংবা সৈন্য বিভাগের নানা দফতরে চাকরি পাওয়া খুব অসুবিধার নয় এখন। পাঁচ ক্রোশ দূরের সোহাগপাশায় একটি বন্দর তৈরি হয়েছিল অনেক আগেই। বর্তমানে সেখানে জাহাজ ও যুদ্ধপোত নির্মাণের কেন্দ্র স্থাপনের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। তার বন্ধু, ক্ষেমংকর সেন সোহাগ পাশার ফৌজদার এবং মিরবহর ইউসুফ জাহাঙ্গিরের প্রধান চিকিৎসক হয়েছে। সে সোহাগপাশাতেই বেশির ভাগ সময় থাকে। বিষ্ণুপ্রিয় নব্যন্যায়, স্মৃতি, কাব্য এবং ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে একরকম কৌতূহলবশতই জ্যোতিষচর্চা করেছিল। ফুল্লশ্রীতে কবি-কর্ণপুর বিজয় গুপ্তের সময় থেকেই বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষার কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল। জ্যোতিষার্ণব সূর্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সে সময় ফুল্লশ্রীতে অভ্রান্ত গণক হিসাবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। গণনা ছাড়া বিষ্ণুপ্রিয় তাঁর কাছে জ্যোতিষ অধ্যয়ন করেছিল।

ক্ষেমংকরের জ্যোতিষে বিশ্বাস নেই। বিষ্ণুপ্রিয়র সঙ্গে অনেকবারই তার এ বিষয়ে বাক্য বিনিময় হয়েছে। তর্ক প্রতিবারেই এক চরম প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে শেষ পর্যন্ত অমীমাংসায় শেষ হয়ে গেছে। বিশ্বাস ক্ষেমংকরের না

থাকলেও মিরবহর ইউসুফ জাহাঙ্গির খানের আছে। তার একজন গণক দরকার। তাকে যুদ্ধযাত্রা করতে হয়, নদীতে এবং কখনো কখনো সমুদ্রে বহর ভাসাতে হয়, যুদ্ধ ও শান্তি স্থির করতে হয়, চুক্তি এবং চুক্তিভঙ্গ করতে হয়।

এসবের জন্য তিথি-নক্ষত্র এবং দিন-ক্ষণ স্থির করতে হয়। শুভাশুভ নির্ণয় করতে হয়। সোহাগপাশার দফতরে একজন জ্যোতিষ পণ্ডিতের বিশেষ দরকার একথা ক্ষেমংকর সেনের জানা আছে। সে বিষ্ণুপ্রিয়র জন্য গোপনে চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে। এত গোপনে যে বিষ্ণুপ্রিয়কে পর্যন্ত এখনো বিষয়টা জানায়নি। ফৌজদারের বর্তমান জ্যোতিষী রামরতন ভট্টাচার্য বৃদ্ধ হয়েছে। তার ছেলে রামজীবন জাহাঙ্গির নগরে নবাব দপ্তরে জ্যোতিষীর কাজ করে। সপরিবারে সে সেখানেই থাকে। কাজেই ফৌজদারের কাছে উমেদারি করার এটাই উপযুক্ত সময়। বিষ্ণুপ্রিয়কে না জানানোর কারণ আর কিছু নয়, যদি তার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ না হয়, বিষ্ণুপ্রিয় আশাহত হবে। সাধারণভাবে অপ্রাপ্তি এক কথা, আশাহত হওয়া অন্য। সদ্য বিষ্ণুপ্রিয়র সাংসারিক এবং আর্থিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। প্রথমে শরিকদের সঙ্গে যৌথমালিকানার সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ এবং অবশেষে জমিজমা, বাড়ির চৌহদ্দি সবকিছুর মীমাংসা ভাগাভাগিতে আপাতত নিষ্পত্তি।

ফলত, বিষ্ণুপ্রিয় এই মুহূর্তে স্বস্তিতে থাকলেও আর্থিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত।

ক্ষেমংকর সেনের বাড়ি ধাত্রীনগরেই। চন্দ্রদ্বীপের বিখ্যাত কবিরাজ প্রমথ সেনের সে দত্তকপুত্র, বহুকাল পর্যন্ত গ্রামের মানুষ এমনই জানত। বস্তুত, তিন বছর বয়সে ক্ষেমংকর যখন ধাত্রীনগরের বাড়িতে আসে তখন প্রমথ সেন বেশ ঘটা করেই দত্তক গ্রহণের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয় শৈশবেই মাত্র চার-পাঁচ বছর ক্ষেমংকরের সাহচর্য পেয়েছে। তারপরে মাঝে মধ্যে তাদের দেখা হত। সেই শৈশব থেকেই ক্ষেমংকর বিষ্ণুপ্রিয়র নায়ক চরিত্র অথচ দুজনের মধ্যে সেই ছোটবেলা থেকেই ছিল আকাশপাতাল পার্থক্য। ক্ষেমংকর জাতপাতের ধার ধারে না, জ্যোতিষে বিশ্বাস নেই, ঈশ্বর বিষয়েও তার কোনো আগ্রহ নেই। অথচ এই সমস্ত ব্যাপারেই বিষ্ণুপ্রিয়র অসীম বিশ্বাস।

তাদের সেই শৈশবেই কী করে যেন রটে যায় যে ক্ষেমংকর প্রমথর বিবাহ বহির্ভূত সন্তান। এতে এতকাল কোনোরূপ রাখঢাক কিংবা সমাজ নষ্ট হওয়ার ভীতি ছিল না। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে উচ্চবর্গীয়

বাঙালি সমাজে নিত্যনতুন বিধিবিধান কী করে যেন বেশ জাঁকিয়ে বসছে। শতাধিক বছর আগে রঘুনন্দন নতুন করে কিছু বিধান হিন্দুসমাজের উপর চাপিয়েছে বটে কিন্তু সে সব যত না মর্মান্তিক হয়েছে, তার থেকে কুল পঞ্জিকারগণের প্রতিষ্ঠিত নিত্যনতুন নিয়ম, প্রথা, অহংকারের মিথ্যা কুলরীতি সমাজকে ক্রমশ সংকুচিত করে ফেলছে।

সমাজকে ভয় পায় না এমন মানুষ এদেশে হয় না। কাজেই চোখের সামনে থেকে ক্ষেমংকরকে সরিয়ে দিলেন প্রমথ কবিরাজ, প্রথমে ইদিলপুরে তাঁর এক সতীর্থের কাছে, পরে কাশীতে ভারতবিখ্যাত আয়ুর্বেদাচার্য ত্রিভুবন গুপ্তর কাছে।

কায়স্থ এবং বৈদ্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ, বিবাহ বহির্ভূত উপপত্নী রাখা, এমনকী ক্রীতদাসী ও সাধারণ দাসীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন তেমন কোনো সমাজনিন্দিত বিষয় এই সেদিনও ছিল না। কিন্তু এখন হয়েছে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতিদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা এক প্রবল সামাজিক মর্যাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের দেখাদেখি নিম্নবর্গী জাতিসমূহও তাদের সমাজে কুলীন প্রথা চালু করেছে।

ক্ষেমংকর জীবনের বেশি সময়টাই অন্যত্র মানুষ হয়েছে। যাবতীয় শিক্ষা শেষ করার পর প্রমথ সেনের নবিশ হিসাবে ধাত্রীনগরে এসে স্থায়ী হয়। মাত্র চার বছর হল সে ধাত্রীনগরের বাসিন্দা। অবশ্য তাকে বেশির ভাগ সময়ই সোহাগপাশায় থাকতে হয়। তার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ।

বিষ্ণুপ্রিয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নদর্শী। চন্দ্রাবলীর নবদ্বীপ প্রসঙ্গ উঠতেই সে আলোচনার বাস্তবকে অতিক্রম করে তার নিজস্ব চিন্তায় চলে গিয়েছিল।

গৃহপ্রাঙ্গণের সীমানা গুল্মলতার মালঞ্চে প্রকীর্ণ। সত্যভামার খুব ফুল ও মঞ্জুরীর শখ। সীমানার বাঁশের বেড়ার উপরে লতানো কী এক নাম-না-জানা উদ্ভিদ ঘন সবুজ। সেই ঘন সবুজের মধ্যে চুনির মতো উজ্জ্বল লাল রঙের অতি ক্ষুদ্র এক ধরনের ফুল। কী ফুল এগুলো? বেড়ার বাইরে বাঁ দিকে ঘেঁষে পাঁচ-ছটা হলুদ করবী ফুলের গাছ। সব গাছ এই হেমন্তের সকালেও শিশিরস্নাত প্রফুল্ল। যেমন তাদের চিরিচিরি পাতার বাহার, তেমনি প্রাণবন্ত হলুদ ফুল তাদের! আহা মরে যাই— এমন মনে হল বিষ্ণুপ্রিয়র।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু কথা মনে পড়ল তার। বাগানের ভিতরে একটা হরীতকীর গাছ আছে। খাওয়ার পরে মুখশুদ্ধির জন্য হরীতকী ব্যবহার

করে বিষ্ণুপ্রিয়। তলায় পড়ে থাকা হরীতকী দেখে ক্ষেমংকরের জন্য কিছু নিয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ল তার। হরীতকী গাছ এদেশে খুব বেশি দেখা যায় না। কবিরাজি ওষুধে লাগে এই ফল। সে বেশ কিছু পাকা ফল কুড়াল গাছের তলা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ক্ষেমংকরের তো গতকালই গ্রামে ফেরার কথা ছিল। গতকাল না হলেও আজকের কালীপূজার দিনে ক্ষেমংকর নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরেছে। ক্ষেমংকর গ্রামে শেষ এসেছিল মাসখানেক আগে, সে সময় সে একবার বিষ্ণুপ্রিয়র বাড়িতেও এসেছিল। বিষ্ণুপ্রিয়র কনিষ্ঠ কন্যাটির বয়স ন-দশ বছর। এই মেয়েটির জন্মের পর ক্ষেমংকর বছর দুয়েক এসে গ্রামের বাড়িতে ছিল। এই দেবশিশুর মতো সুন্দর শিশুটিকে একেবারে হামাগুড়ি দেওয়ার সময় থেকে দেখে, ছুঁয়েছেনে ক্ষেমংকর যেমন অপরিসীম আনন্দ পেত, তেমনি এক বিস্ময়কর আবিষ্কারের অভিজ্ঞতাও হত তার। মানব শিশু কীভাবে পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিতি হতে থাকে, কীভাবে তার বোধ এবং অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে তার বিচারবোধ, ভারী বিস্ময়ের সঙ্গে ক্ষেমংকর এসব লক্ষ করত। ইতিপূর্বে খুব কাছ থেকে কোনো শিশুকে এভাবে বড় হতে দেখেনি সে। বিস্ময় ছাড়া ব্যাপারটার মধ্যে তার চিকিৎসক অনুসন্ধিৎসা সমান সক্রিয় ছিল।

প্রমথনাথের তিন ভাই প্রবল কালীভক্ত। বাড়িতে পূজাও হয়। ক্ষেমংকর সম্পর্কে বিষ্ণুপ্রিয় যতটুকু জানে সে নাস্তিক। কিন্তু এ ব্যাপারে কখনোই সে সোচ্চার নয়। উৎসব অনুষ্ঠানে গ্রামে আসার উপলক্ষ তৈরি হয়। আসলে কবিরাজ বাড়ির সঙ্গে গ্রামের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় একটা দায়িত্বের কথা ক্ষেমংকর মনে রাখে। কিছুকাল ধরে এই গ্রাম এবং আশপাশের দশ-পাঁচটা গ্রামের চিকিৎসা তো প্রমথ কবিরাজই করে গেছে। তার অবর্তমানে সে কাজের দায়িত্ব ক্ষেমংকর অস্বীকার করেনি। বেশ কিছু ফল সংগ্রহ করে ধুতির কোঁচড় ভর্তি করল বিষ্ণুপ্রিয়। ফলগুলো ক্ষেমংকরের সঙ্গে দেখা করার একটা অজুহাত হবে।

'অজুহাত' শব্দটা তার চিন্তাকে প্রতিহত করল। ক্ষেমংকরের সঙ্গে তার দেখা করার জন্য অজুহাত দরকার হয় না। শব্দটা যেন ক্ষেমংকরকে ছোট করবে এমন ভেবে ভাষাকে গুটিয়ে নিতে চাইল সে মনে মনে। সঙ্গে সঙ্গে এও তার মনে হল, সোহাগপাশার সর্দার-ই সইরালের সদর দপ্তরে তার একটা চাকরি একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

শর্মিষ্ঠা বিষ্ণুপ্রিয় সত্যভামার প্রথম সন্তান। পনেরো ক্রোশ দূরে উজিরপুর গ্রামে তার বিয়ে হয়েছে। ষোলো-সতেরো বছর বয়সি শর্মিষ্ঠা অসামান্য রূপসী। উজিরপুর পণ্ডিতদের গ্রাম। শর্মিষ্ঠার স্বামী রামকুমার ভট্টাচার্যের বয়স কুড়ি-একুশ বছর। পিতৃ-পিতামহর টোলের নতুন শিক্ষক সে। শর্মিষ্ঠার শ্বশুর গোপীকান্ত নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়র সহপাঠী ছিল। ছাত্রাবস্থায় তারা অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিল। সেই বন্ধুত্বকে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে পরম প্রিয় কুটুম্বিতার বন্ধনে বেঁধেছে তারা।

ধাত্রীনগরের কালীপূজার উৎসবের আকর্ষণ কন্যাদেরও টেনে আনে। রামকুমার সেই কারণে শর্মিষ্ঠাকে বাপের বাড়িতে রেখে গেছে। তার টোল এবং হেমন্তকালীন ফসল কাটার বন্দোবস্তে বাবাকে সাহায্য করাটা এই মুহূর্তে অনেক জরুরি। ফলে সে উজিরপুরে ফিরে গেছে এই শর্তে যে দিন দশেক পরে শর্মিষ্ঠাকে ফেরত নিতে এসে দু-চারদিন এ বাড়িতে থেকে যাবে।

ভিক্ষা দিতে এলে বোষ্টমি চোখ তুলে মুহূর্তে জরিপ করল শর্মিষ্ঠাকে। 'জয় হোক রাধারানি, জয় হোক। কী রূপ দিয়েছে গো বিধি তোমায়! আহা-হা-মরে যাই গো-মরে যাই! তা কেষ্ট ঠাকুরটিকে দেখছি না তো? আসেনি নাকি গো?'

চন্দ্রাবলী মাস দুয়েকের তীর্থ ভ্রমণেই নবদ্বীপ-শান্তিপুরের কথার টান এবং সুর শিখে ফেলেছে। দক্ষিণের মানুষের কর্কশ ভাষাভঙ্গি সে যে সাবধানে পরিহার করে চলেছে এ যেন সবাই খেয়াল করে, এমন ভাব তার। কিন্তু অপরিচিত ভঙ্গি এবং ক্রিয়াপদের হ্রস্ব অভিশ্রুতিতে শর্মিষ্ঠার কেমন যেন হাসি পায়। সে অবশ্য কাব্যের ভাষা জানে। বাংলা এবং সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই শিক্ষিত কাণ্ডজ্ঞান আছে তার।

সে সলজ্জ হাসল। বলল, 'খুব ঘুইর‍্যা আইলা তোমরা, না? না, তিনি ফিইর‍্যা গেছেন। কাজ আছে। আবার দশ দিন বাদে নিতে আসবেন।'

চন্দ্রাবলী তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। সত্যিই, রূপ হলে এমনই হতে হয়। ভগবান কোনো জায়গায় এতটুকু খুঁত রাখেনি।

নাকে নোলক, কানে কুণ্ডল আর গলায় হাঁসুলি শর্মিষ্ঠার। কোমরে রুপোর গোট এবং পায়ে রুপোর তোড়া। তার যেন আবির্ভাব।

চন্দ্রাবলী বলল, 'তোমাকে দেখলে রাধারানি দর্শনের পুণ্য হয়। যুগলে দেখতে পেলে জীবন সার্থক হত গো। খবর পেলে ঠিক আসব। কবে আসবেন বললে?'

শর্মিষ্ঠা বলল, 'দশ-বারো দিন পরে।'

সত্যভামা সজ্জিত খুঞ্চাখানা ঠাকুর ঘরে ঢেকে রাখতে গেলে চন্দ্রা চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোল খালি কেন, রাধারানি? জামাই কি ব্রহ্মচারী?'

শর্মিষ্ঠা এ প্রশ্নে আচমকা দিশাহারা বোধ করল। গৌর মুখমণ্ডলে চকিতে রক্তের ঝলক ছড়িয়ে পড়ল। সে মুখ নামিয়ে নিল। কিন্তু সে শুধু সামান্য সময়ের জন্য। পরক্ষণেই মুখ তুলে সে চন্দ্রাবলীর চোখে চোখ রাখল।

চন্দ্রা দেখল বিশালাক্ষী বালিকার চোখ দুটি আরক্ত হয়েছে এবং সে দু'টি ঈষৎ তির্যক, ভ্রূকুটিকুটিল।

চন্দ্রা সত্যসত্যই আতঙ্কিত হল। এমন নিরীহ একটা প্রশ্নের এমন প্রতিক্রিয়া হবে, তা সে বুঝতে পারেনি। বলল, 'মা গো মা, না জানতে কী বা ভুল করে ফেলেছি গো রাধারানি, রাগ কোরো না। জানতে তো মন চায়। পাঁচ-ছ বছব হল না তোমার বিয়ে হয়েছে। ছেলে কোলে নিয়ে আসবে, আমাদের আনন্দ হবে, মায়ের কাছ থেকে কাপড় চেয়ে নেব একখানা, নয়?'

শর্মিষ্ঠা কোনো কথা না বলে মুখ ঘুরিয়ে ভিতরে চলে গেল।

চন্দ্রাবলী তার বোষ্টমি ঝুলি গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল। মনে মনে বলল, এ রাগের পিছনে কোনো টাগ আছে। অদৃশ্য সত্যভামার উদ্দেশে সে উচ্চস্বরে বলল, 'আজ যাই গো দিদি, জয় রাধে।'

বিষ্ণুপ্রিয় ভিতরে আসতে আসতে বোষ্টমির শেষ কথা কটি এবং কন্যার রাগী মুখে ঘরে ঢুকে যাওয়া খেয়াল করল। মন বিষণ্ণ হল তার। ইদিলপুরের জামাইয়ের বাড়ির মেয়েমহলে ইতিমধ্যেই কথা উঠতে শুরু করেছে। এইসব বিষয় নিয়ে যখন কথা হয়, বহু সময়ই তা হয় অত্যন্ত কুরুচিকর, স্থূল। যে সব কথা হয়, সে সব কথার কোনো উত্তর হয় না।

বিষ্ণুপ্রিয় স্ত্রীর কাছ থেকে ইতিমধ্যেই সে সব শুনেছে। উপদেশ দিয়েছে, 'মাইয়ারে কইও চুপ কইর‍্যা থাকতে। সময় হইলে উত্তর দেওয়া যাবে। আর উত্তর দেওয়ার দরকারই বা কী?'

এই হল বিষ্ণুপ্রিয়, ভাবুক, নির্বিরোধ। মনে তার অপরিসীম শান্তি। ঈশ্বর এবং প্রকৃতির কাছে ভারী কৃতজ্ঞ মানুষেরা যেমন হয়। হালে সে রাজশক্তির কাছেও কৃতজ্ঞতা বোধ করে। শায়েস্তা খাঁর শাসনে বাংলার এই নিম্নাঞ্চলও অনেকটাই সুশৃঙ্খল এখন। চুরি ডাকাতি যেমন বন্ধ, তেমনি মগের হামলার কথাও লোকে অনেক দিন শোনেনি।

৪

ধাত্রীনগর গ্রামটির বয়স মাত্র তিন পুরুষ। ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামটির ব্রাহ্মণ্য কর্তৃত্ব প্রশ্নাতীত। রাজা রামচন্দ্র রায়ের আমলে দক্ষিণে সমুদ্রের কাছাকাছি দশমিনা নামের বর্ধিষ্ণু গ্রামটি বারবার মগের আক্রমণে ক্রমশ পরিত্যক্ত হয়। সেই দশমিনার এবং তার আশপাশের আরো দুই চারটি গ্রামের মানুষ রাজার কাছ থেকে সোহাগপাশার কাছাকাছি এই স্থানটি চেয়ে নেয়। এক পুরুষের মধ্যেই ধাত্রীনগর গ্রামটি বেশ বর্ধিষ্ণু হয়ে উঠল।

গ্রামপত্তনের ব্যাপারে যারা আগ্রহী ছিল ক্ষেমংকর সেনের ঠাকুর্দা জগৎচন্দ্র তাদের মধ্যে প্রধান। জগৎচন্দ্র রাজার চিকিৎসকদের অন্যতম ছিল।

সোহাগপাশা এবং ধাত্রীনগরের জন্মকাল প্রায় একই সময় হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক কারণে প্রথমটি অতি দ্রুত উন্নতি করতে লাগল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই মোগল ফৌজদারের স্থানীয় দপ্তরের গুরুত্ব ছাড়াও প্রথমটি বন্দর হিসাবে দ্রুত বাড়তে বাড়তে বর্তমানে একটি ব্যস্ত শহর। দেশি-বিদেশি বহু জাতের মানুষ, বহু ধর্মের গোষ্ঠী, বহু ভাষা ও কৃষ্টির সহাবস্থান এখন সোহাগপাশায়। সমুদ্রগামী জাহাজ এই বন্দরে আসতে পারে না বটে কিন্তু চাঁদপুর, যুগদিয়া, জাহাঙ্গির নগর, সোনারগাঁ এমনকী সর্বোপরি চট্টগ্রামের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগের ফলে সমুদ্র বণিকের দালাল এবং চরেরা এখানে খুব সক্রিয়। দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে সোহাগপাশার।

অন্যদিকে ধাত্রীনগর আরেকটি ইদিলপুর কিংবা আরেকটি ফুল্লশ্রী হওয়ার ব্রাহ্মণ্য লক্ষ্যে অবিচল। শাস্ত্রের চর্চা এবং ব্রাহ্মণ্য পাণ্ডিত্যের পীঠস্থান হবে ধাত্রীনগর, এখানকার ব্রাহ্মণপ্রধানদের লক্ষ্য তাই।

ক্ষেমংকর গতকাল শেষ বেলায় ধাত্রীনগরে এসে পৌঁছেছে। ধাত্রীনগরের বাড়িতে প্রমথনাথের বিধবা বৃদ্ধা মহামায়া দাসদাসীদের নিয়ে একা থাকে। প্রমথ ছিল ঘোর শাক্ত, কিছুদিন তন্ত্র নিয়েও নাড়াচাড়া করেছিল। কাজেই কবিরাজ বাড়ির কালীপূজার আড়ম্বর আছে।

ক্ষেমংকর তিন বছর বয়স থেকে এ সংসারে আছে। প্রমথনাথ যখন বুঝে গেল যে মহামায়ার সন্তান ধারণের কোনো সম্ভাবনা নেই, তখনই ক্ষেমংকরকে সে দত্তক নেয় এমনই জনশ্রুতি।

অবশ্য দত্তক গ্রহণের অনুষ্ঠান কেউ চাক্ষুষ দেখেনি। কিন্তু তিন বছর বয়সে ক্ষেমংকরকে যখন এ বাড়িতে আনা হয় প্রমথনাথ তখন ব্যাপক উৎসবের আয়োজন করেছিল। পূজা, পার্বণ, কথকতা ইত্যাদি যাবতীয় অনুষ্ঠান, যা মানুষকে স্বাভাবিক কারণে তুষ্ট করে, তিনদিন ধরে কবিরাজবাড়ি মাতিয়ে রেখেছিল। লোকজনকে খাওয়ানো হয়েছিল দুদিন ধরে। মহামায়া তাঁর গম্ভীর, স্থিরপ্রত্যয় স্বামীকে চিনত। চিনলেও প্রথমবারের মতো দ্বিতীয়বারেও গজগজ করতে করতে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিল। দ্বিতীয়বারের ব্যাপারটা হল ক্ষেমংকরকে পুত্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং নিজ গৃহে নিয়ে আসা। মহামায়ার বিরক্তি এবং হতাশা যুগপৎ ছিল। হতাশাই বেশি কেননা প্রমথের ঘরে সে সন্তানের জন্ম দিতে পারেনি। বন্ধ্যা রমণীর যেসব লাঞ্ছনা প্রাপ্য, সেসব তার যথেষ্টই জুটেছে। ফলে প্রমথনাথ যখন তাকে না জানিয়ে দ্বিতীয়বার দার গ্রহণ করল, মহামায়া আহত হয়েছিল।

'আপনি আমাকে না জানিয়ে এ কাজ করলেন কেন?' প্রমথর কাছে সে সরাসরি এরকম প্রশ্ন করেছিল।

প্রমথ সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল।

বলেছিল 'প্রয়োজন ছিল।'

বস্তুত, পুরুষ যদি তার পারিবারিক স্থিতাবস্থা এবং শান্তির ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হত, তাহলে আরো একটি বা দুটি বিবাহ করার জন্য পূর্বেকার স্ত্রীদের অনুমতির কোনো প্রয়োজন হত না। কিন্তু প্রমথ মহামায়াকে গভীরভাবে ভালোবাসত। সন্তান না হওয়ার সামাজিক এবং পারিবারিক লাঞ্ছনা তারও কিছুটা প্রাপ্য ছিল। কিন্তু পুরুষ হওয়ার সুবাদে সাধারণের বিশ্বাস অনুযায়ী তার এক ধরনের নিরাপত্তাও ছিল।

যৌবনের প্রবল দিনগুলিতে এ বিষয়ে প্রমথের যন্ত্রণা ছিল একেবারেই নিজের অন্তঃস্থল থেকেও। চিকিৎসক হিসাবে সে জানত সন্তানের জন্মদানের ত্রুটি স্ত্রীলোকের একচেটিয়া নয়, পুরুষের দেহেও বন্ধ্যাত্বের কারণ সংগুপ্ত থাকতে পারে।

কিন্তু নিতান্ত অভিজ্ঞাতালব্ধ উপায় ছাড়া প্রমথর নিজেকে পরীক্ষা করার কোনো উপায় ছিল না। তাদের কিংবা তার জানা অন্য কোনো চিকিৎসাবিধিতে বন্ধ্যাত্বর বা বন্ধ্যাত্ব নিষ্পত্তি করার কোনো পদ্ধতি নেই।

প্রমথর যখন বিয়ে হয়. তখন তার বয়স আঠারো বছর। মহামায়ার এগারো। এরপরে পাঁচ-সাত বছর কেটে যাওয়ার পরেও যখন মহামায়া সন্তানবতী হল না, তখন স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হল সে বন্ধ্যা।

বন্ধ্যা স্ত্রীদের স্বামীরা পবিত্র পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে অবশ্যই আরো একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। শেষে মহামায়ার বয়স যখন কুড়ি বছর পার হয়ে গেল, সে নিজেই প্রমথকে আর একটা বিয়ে করার কথা বলল।

'আপনি আবার বিয়ে করুন', সে বলল।

'কেন? আবার বিয়ে করব কেন?' প্রমথ জানতে চাইল।

'বংশরক্ষা করা তো আপনার কর্তব্য, মহামায়ার কণ্ঠে তেমন দৃঢ়তা না থাকলেও সে তখনো কেঁদে ফেলেনি। কিন্তু প্রমথ যেন দেখতে পাচ্ছিল গলার কোন জায়গাটায় কান্নাটা আটকে আছে তার।

'বংশ তো আছে, ভাইদের বংশ আছে না?' প্রমথ স্ত্রীকে যথার্থই আশ্বস্ত করতে চেয়েছিল। চিকিৎসক হিসাবে তার মনে প্রশ্ন জেগে উঠেছিল।

সে আবার বলল, 'তা ছাড়া আমাদের সন্তান হওয়ার সময় তো আর পেরিয়ে যায়নি। তা ছাড়া আমি আর একটা বিয়ে করলে যে এ সমস্যা মিটবে, এ কথা তোমাকে কে বলল?'

মহামায়া ঠিক ধরতে পারল না কথাটা।

প্রমথ বলল, 'শারীরিক ত্রুটিটা আমারও তো হতে পারে।'

'তাই কখনো হয় নাকি?' মহামায়ার জীবনে এত বড় বিস্ময় যেন আর কখনো আসেনি।

প্রমথ হাসল। বলল, 'হয়। বন্ধ্যাত্ব স্ত্রীলোকের একচেটিয়া ব্যাপার নয়। আর একটি বিয়ে করলে তোমাকে গঞ্জনা দেবার একজন লোক বাড়তে পারে কিন্তু তাতে যে আমার বংশরক্ষা হবে, এমন নিশ্চিতি কোথায়?'

মহামায়া এক ধরনের স্বস্তি পেয়েছিল মনে মনে। এমনকী, কবিরাজবাড়িতে আশ্রিতা দূর সম্পর্কের এক শ্বাশুড়ি মহিলাকে ইঙ্গিতের উত্তরে একদিন উলটো প্রশ্ন করে বসেছিল এই বলে যে, 'আপনাদের ছেলে ঠিক আছে তো?'

যথাসময়ে প্রমথর কানে এই কথা এসে পৌঁছালেও সে মহামায়াকে ভর্ৎসনা করেনি। বরং মনে মনে কৌতুকবোধ করেছিল এবং একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে বারবার লাঞ্ছিত হওয়া স্ত্রীর হাতে যে একটা অস্ত্র সে তুলে দিতে পেরেছিল, এতে এক ধরনের তৃপ্তিও সে পেয়েছিল।

এর প্রায় এক যুগ পরে প্রমথনাথ দ্বিতীয়বাব বিয়ে করে ধাত্রীনগরের বাড়ির কাউকে না জানিয়ে। এমনকী মহামায়াকেও নয়। ঘটনাটা খুব আকস্মিকভাবে ঘটেছিল এবং উনচল্লিশ বছর বয়সে, যখন প্রমথ প্রায় ধরেই নিয়েছিল যে শরীরের ক্ষুধাতৃষ্ণা আর তেমন পরাক্রমশালী হবে না, তখনি ঘটনাটা ঘটল। সেই বয়সে তার নতুন করে এই উপলব্ধি হয়েছিল যে শরীরের ক্ষুধা আয়ত্তে রাখার অভ্যাস কিছুটা রপ্ত হলেও, পুরুষের মুগ্ধ হওয়ার আর্তি সারা জীবনে কখনোই তাকে ছেড়ে যায় না।

মেহেদিগঞ্জে জমিদার মোতাহার হোসেন খানের গৃহস্থালিতে প্রমথনাথের অবাধ না হলেও স্বচ্ছন্দ যাতায়াত ছিল। চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে প্রমথর জন্য অন্দরমহলের পর্দাও তেমন অপ্রতিরোধ্য ছিল না কখনো। অবশেষে খানের ছোট ছেলে মতিয়ুর যখন ভয়ংকর সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হয়, প্রমথর কাছে খান বাড়ির পর্দা পুরোপুরিই উঠে যায়।

একুশ দিন যমের সঙ্গে লড়াই করে প্রমথনাথ জয়ী হল এবং নিজের নৌকায় ফিরে এসে ধাত্রীনগরে প্রত্যাবর্তনের জন্য যখন প্রস্তুতি শুরু করল, সেই সময়ে তার বাল্যবন্ধু ত্রিপুরা ঘোষ তার সঙ্গে দেখা করতে এল।

মতিয়ুরের প্রাণসংশয় অবস্থা দূর হওয়ার কারণে প্রমথ রাত্রিজাগরণজনিত ক্লেশ এবং স্নায়ুত্রাসজনিত উৎকণ্ঠা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। উপরন্তু কৃতজ্ঞ মোতাহার হোসেন নিষ্কর একখণ্ড জমি, যার পরিমাণ ত্রিশ বিঘা, ইতিমধ্যেই অঙ্গীকার করে বসে আছে। প্রমথ খুশি। আর দিন তিনেক বাদে স্বগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করতে পারবে বলে মনও প্রফুল্ল।

এমন সময় ত্রিপুরা এল। ত্রিপুরা মেঘনা উপকূলের শ্রীরামপুর গ্রামের বাসিন্দা। বিগত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে মেঘনা শ্রীরামপুরসহ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড

ক্রমশ গ্রাস করে ফেলতে এখানকার অধিবাসীরা যে যার সুযোগসুবিধা মতো অন্যত্র সরে গেছে। অনেক বর্ধিষ্ণু পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে ধ্বংসও হয়ে গেছে। এই ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে ত্রিপুরাদের পরিবারও পড়ে।

শ্রীরামপুরে প্রমথনাথের মামাবড়ি। তার জন্মস্থানও বটে। শৈশব এবং কৈশোরের স্মৃতিতে মেঘনার করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া গ্রামটি ভাস্বর।

ত্রিপুরা তার কৈশোরের সাথী। তার বংশানুক্রমিক পদবি ঘোষ। তারা সে সময়ে পরস্পরের শুধু সাথী নয়, একেবারে প্রাণের বন্ধু, যেমন বন্ধুত্ব শুধু কৈশোরেরই সম্ভব। অসম্ভব দুঃসাহসী এবং মানুষের জীবনের সব রহস্য ওই বয়সেই জানা ত্রিপুরা প্রমথর গুরুও ছিল।

পরে প্রমথ তার জাতবৃত্তিতে ক্রমশ গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করলে ত্রিপুরার সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ হতে থাকে। অন্যদিকে ভাগ্য বিপর্যয়ে নানা ঘাটের জল খেতে খেতে কায়স্থ বংশজাত ত্রিপুরা ঘোষ ঠিক কোন সময়ে ত্রিপুরা ঘটক হয়ে উঠল, সে খবরটা তার নিজের কাছেই অজানা।

দু-তিন বছর পরপর ত্রিপুরার সঙ্গে আকস্মিকভাবে দেখা হত প্রমথর। সম্পর্ক ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসতে আসতে শেষে একেবারেই আগ্রহহীন হয়ে পড়েছিল সে। বস্তুত, বিগত দশ-বারো বছরের মধ্যে ত্রিপুরার সঙ্গে আদৌ সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা, প্রমথ তা স্মরণ করতে পারল না।

সকালে স্নান সেরে প্রমথ নৌকার চওড়া পাটাতনের উপরে বসেছিল। অঘ্রান মাস। হঠাৎ হিমেল বাতাসে সকালের রোদ বড় মনোরম লাগছিল। অঘ্রান, তবুও মেঘনার বুকে ছোট বড় ঢেউয়ের বিস্তৃতি দিগন্ত জুড়ে। কদাচিৎ জেলেদের নৌকা দু-একখানা দেখা যাচ্ছে। একখানা যাত্রিবাহী ভড় অতি ধীরে ভোলা অভিমুখে পাড়ি দিচ্ছে। শরীর ও মনে অপরিসীম আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছিল প্রমথর।

এমন সময়ে ত্রিপুরা এল। একখানা দ্রুতগামী ছোট নৌকায় ছ-জন দাঁড়িকে এই শীতেও ঘর্মাক্ত করে ত্রিপুরা এসে উপস্থিত হল।

'ত্রিপুরা!'

'যাক, চিনতে পেরেছ তাহলে।'

ত্রিপুরা নিজের নৌকা ছেড়ে প্রমথর ভড়ে উঠে এল।

'চিনব না! বল কী? কোত্থেকে এলে?'

'শ্রীরামপুর থেকে।'

'শ্রীরামপুর নাকি নদীগর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গেছে পুরোপুরি?'

'হ্যাঁ ঠিকই শুনেছ। তবে মানুষ তো বসতি করবেই। যে ক-ঘর এখনো আছে, তারা পশ্চিমে সরে গিয়ে ফের ঘরবাড়ি বানাচ্ছে। যেখানে ঘর বসাচ্ছে, সে জায়গার নাম দিচ্ছে শ্রীরামপুর।'

'আমি শুনেছিলাম পালঙ না কোথায় তুমি বাড়ি বানিয়েছ?'

'ঠিকই শুনেছ, পালঙেও আমার একটি বাড়ি আছে।'

'কী করছ আজকাল, ত্রিপুরা?'

'বিয়ে দিচ্ছি। বিয়ে দেওয়ার ব্যবসা করছি।'

'অর্থাৎ!'

'যাদের কনের অভাবে বিয়ে হয় না, তাদের কনে সরবরাহ করছি। বংশজ এবং ভঙ্গ কুলীন পুরুষদের দুর্দশার কথা তো জানই। তাদের জন্য মনমতো পাত্রী সংগ্রহ করে দিচ্ছি।'

প্রমথর স্মরণে এল আগেই যেন কার কাছে ত্রিপুরা বিষয়ে এরকম একটা খবর শুনেছিল। শুনেছিল, আবার ভুলেও গিয়েছিল। এখন মৃদু হাসল সে।

'বিপজ্জনক ব্যবসা। তার উপরে তুমি তো আবার ব্রাহ্মণও নও।'

'বামুন নই বটে, তবে নতুন একটি পদবি আমার প্রাপ্তি হয়েছে, ঘটক।'

'তুমি নিজেই ওই পদবি নামের সঙ্গে যোগ করেছ, না—'

'নিজে যোগ করিনি, মানুষই জুড়ে দিয়েছে কখন যেন। আমি চাই আর না চাই, এখন তাতে আর কিছু যায় আসে না।'

'তার মানে তুমি এখন বামুনও!'

'হাঃ হাঃ!'

সমাজে কৌলীন্য প্রথার কঠোরতায় দেশে উচ্চবর্ণীয়দের অনেকেরই বিয়ে করা দায় হয়ে উঠেছে। কুলীন পাত্রদের বিবাহ-ব্যবসা সমাজে একটা নৈরাজ্য তৈরি করেছে। একজন কুলীন ব্রাহ্মণের শতাধিক স্ত্রী গ্রহণও কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয় এখন। এমনও দেখা যায় যে বারো বছরের কুলীন পুত্র পনেরোটি কুলীন কন্যার কুল রক্ষা করেছে যাদের কয়েকজন তার মায়ের বয়সি। কৌতুকের গল্প এমনও শোনা যায় যে কোনো কুলীন বালকের স্ত্রীরা তাদের বরের মুতো কাঁথাও ধোয়, নাওয়ায়, খাওয়ায় এবং ঘুম পাড়ায়। প্রমথর অজানা নয় যে ভরাতে যুবতী স্ত্রীলোকদের আমদানি হচ্ছে বর্ধিষ্ণু

গ্রামগুলোর ঘাটে ঘাটে। ভরার মেয়ের নামটাও বেশ চালু হয়ে গেছে। উপযুক্ত কন্যার পিতাদের মাত্রাতিরিক্ত কন্যাপণের দাবি দরিদ্র এবং অল্প সম্বল গৃহস্থ পুরুষের কাছে আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু মানুষ পরিণত যৌবনেও অবিবাহিত থাকছে এবং অনেকেই বংশ বিপন্ন এমন মনে করছে।

সে বলল, 'তোমার পাপ ভয় নেই, ত্রিপুরা?'

ত্রিপুরা আগের থেকেও জোরে হাসল। বলল, 'কীসে পাপ ভয়? জাতে ভেজাল দিচ্ছি বলে?'

'হ্যাঁ, বামুনের ঘরে অজাত বেজাত ঢোকাচ্ছ?' প্রমথর কণ্ঠস্বরে ত্রিপুরা একটু যেন আতঙ্কের আভাস সত্যিই পেল।

ত্রিপুরা এবং তার অনুরূপ অন্য ঘটকেরা গঙ্গা-পদ্মা-ধলেশ্বরী-ভাগীরথী-জলঙ্গী-যমুনার ঘাটে ঘাটে নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলোর ঘাটে বিবাহযোগ্য মেয়ের কদর এবং দর আছে। বিশেষ করে যে সব অঞ্চলে বংশজ এবং শ্রোত্রীয়দের প্রাধান্য, সেখানে ভরার মেয়ে ঘটকের কথায় নিমেষে উচ্চ ব্রাহ্মণ ঘরের বালিকা হয়ে যায়। কে কুলীন, কে বংশজ, কে শ্রোত্রীয় আর কে-ই বা পিরালি— এসব বৃত্তান্তই প্রমথদের নখদর্পণে। সব লেখা আছে তাদের ঠিকুজিতে। বাংলার যাবতীয় রাঢ়ী, বারেন্দ্রর হিসাব, জাতপাতের জটিল জড়াজড়ি, মিলন-বিচ্ছেদ, কুলীন, বংশজ আর শ্রোত্রীয়দের স্মৃতিতাড়িত বিন্যাস, এমনকী, ব্রাহ্মণেতর উচ্চবর্ণীয়ের কৌলীন্যে নানা বিধিনিষেধ সম্ভব-অসম্ভব। সবই আছে প্রমথদের পুথিতে। সেন রাজাদের আমল থেকে সমাজ যেভাবে জাতের নিগড়ে বাঁধা হয়েছিল, যেভাবে জ্যোতিষ এবং হাজার তিথি, নক্ষত্র, অশ্লেষা, মঘা, বছর মাস দিন সকাল সন্ধ্যার বিধি-নিষেধ সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল, তাতে কুলীন ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সবারই দমবন্ধ অবস্থা হয়েছিল।

ফলে ভাঙন একসময় ভিতর থেকেই ফাটল খুঁজে নিল। সামাজিক নির্দেশ যারা ভাঙবার মতো সাহস দেখাল, তারা তাদের পৃথক পথী তৈরি করল। এই পথীরা আবার নিজেদের মধ্যে মেল তৈরি করল এবং পৃথক বিবাহ সম্পর্ক তৈরি করল। ঘটকরা এদের সম্পূর্ণ সহায়তা করল।

প্রমথ এবং তাদের সংগঠন এই কাজে সাহসীদের সমর্থন জোগাল। ঘটকদের ঠিকুজিতে বংশাবলীর যাবতীয় হদিস পাওয়া যাবে। যদি না পাওয়া যায় নির্ঘাত বানিয়ে নিতে কতক্ষণ! ঘটক সংঘের সংহতি শক্তিশালী,

বিরোধে গিয়ে নিজবংশের অধোগতি করতে কেউ সাহস করে না। একমাস আগে যশোহরের কাঠালবাড়িয়ায় প্রমথ দশজন বংশজের সঙ্গে যে দশটি মেয়েকে উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণকন্যা বলে বিবাহ দিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যের ছ-জনকেই মহিষাদলের মগের বাজার থেকে কিনে এনেছিল সে।

সে বেশ গম্ভীর গলায় বলল, 'পাপ ভয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ, প্রমথ? আমার ছ-জন মায়ের কথা তোমার মনে আছে? আমার পিসিদের কথা? আমার ছয় মায়ের গর্ভে আমার বাবা যে একচল্লিশ জন সন্তানের জন্ম দিয়েছে, তাদের মধ্যে সাতাশ জন কুলীন কন্যা। আমার এই সাতাশ জন বোন এবং এগারো জন পিসির প্রত্যেকের পরিণতি আমি দেখেছি। প্রমথ, এসব বৃত্তান্ত তুমিও নিশ্চয়ই কিছু কিছু জান। কাজেই পাপ-পুণ্যের কথা নতুন করে তুমি আমাকে আর কী শোনাবে?'

প্রমথনাথের অন্তরাত্মা এই কথায় তৎক্ষণাৎ শিউরে উঠল। সেই কিশোর বয়সে ত্রিপুরার দুই দিদি এবং দুই পিসির, যারা আবার বৈবাহিক সূত্রে পরস্পরের সপত্নী ছিল, একত্রে সতী হয়ে পুড়ে মরার দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। উঃ, কী বীভৎস দৃশ্য। চারদিকে অসংখ্য মানুষ। সারিবদ্ধ জনাত্রিশেক ঢাকি নাগাড়ে ঢাক বাজিয়ে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রোচ্চারণ করে তাদের ক্রিয়াকলাপে ব্যস্ত। এয়োস্ত্রীরা সিঁদুর আর আলতায়, ধানদূর্বা আর শঙ্খঘণ্টা, হুলুধ্বনি এবং এসবের মধ্যে সশব্দে জ্বলে ওঠা চিতা, যার আয়তক্ষেত্রে পঁচিশ হাত দৈর্ঘ্যে এবং বিশ হাত প্রস্থে, যেন নরকের আগুন জ্বলে উঠেছে। সেই নরকের আগুনে এক জরাজীর্ণ মৃতদেহের সঙ্গে জীবন্ত দগ্ধ হবে আরো ছ-জন স্ত্রীলোক। এই ছ-জনের মধ্যে তিনজনই যুবতী! তারপর সেই আগুনে ওষুধ প্রয়োগে নেশাগ্রস্ত স্ত্রীলোকদের ঠেসে ধরে পোড়ানো, পলায়নপর দেহকে বাঁশ দিয়ে বাড়ি মেরে ফের আগুনে ফেলা এবং ঠেসে ধরে রাখা যতক্ষণ না পর্যন্ত তার শরীরের আক্ষেপ স্তিমিত হয়।

আতঙ্কিত প্রমথনাথ নদীতীরের সেই বীভৎস দৃশ্য থেকে পালিয়ে এসেছিল। পালিয়ে এসেছিল আরো কয়েকজন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই দাঁড়িয়ে ঐ ভয়ংকর দৃশ্য উপভোগ করছিল। যে কোনো কদাচার, জিঘাংসা, বিকৃত-কামচর্চা, প্রাণবধ ইত্যাদিকে যদি শুধু মন্যতা নয়, সর্বসাধারণের আরাধ্য করতে হয়, তার সঙ্গে ধর্মকে জুড়ে দিতে হবে। তাহলেই এইসব পাপ ক্রমে মানুষের আবেগকে উদ্দীপিত করবে, অবশেষে মহত্ত্বে উপনীত হবে।

প্রমথকে অন্যমনস্ক দেখে ত্রিপুরা বলল, 'যাক গে এসব কথা, আসলে তোমার কাছে আমি একটা প্রয়োজনে এসেছি।'

স্মৃতি-তন্ময়তা থেকে ফিরে এসে প্রমথ বলল, 'বল।'

'তোমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে, এ খবর আমি পেয়েছি', ত্রিপুরা বলল। বলল, 'আমার শ্রীরামপুরের বাড়িতে কিছু যুবতী স্ত্রীলোক এবং কিছু বালক-বালিকা আছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন অসুস্থ। আমি স্থানীয় চিকিৎসকদের দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে কয়েকটি ক্ষেত্রে খুবই হতাশ হয়েছি। তুমি ভাই অনুগ্রহ করে যদি দু-চার দিন আমার আতিথ্য গ্রহণ কর, তাহলে বহুদিন পরে দুই বন্ধুতে একত্রিত হয়ে যেমন অনাবিল আনন্দ পাব, তেমনি আমার কিছু উপকারও হয়। যাবে ভাই?'

ত্রিপুরার আগ্রহে প্রমথনাথকে যেতে হয়েছিল শ্রীরামপুরের নয়া বসতে। মোতাহার হোসেনের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলে খান ঈষৎ বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনার বাল্যবন্ধু?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো? আমার মাতুলালয় ছিল শ্রীরামপুরে।'

'ও তাই বলুন।' খান গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে যা প্রমথনাথ খেয়াল না করে পারেনি।

'আমার সঙ্গে বহু বছরই যোগাযোগ নেই', প্রমথ নিজেই বিষয়টাকে ছেড়ে যেতে চায়নি।

খান বলল, 'দিন দশেক বাদে আমাকে একবার ঢাকায় যেতে হবে, সুবেদার কাশিম খান ডেকে পাঠিয়েছেন।'

'আপনি ওখানে ক-দিন থাকবেন?'

'দু-চার দিন। কেন, কোনো অসুবিধা আছে নাকি?'

'না অসুবিধা নেই, তবে দেশকালের অবস্থা তো ভালো নয়। দু-চার দিনের বেশি না থাকাই ভালো', খান একটু যেন সর্তকই করল। ফের বলল, 'আমি ঢাকা যাওয়ার আগেই আপনার ধাত্রীনগরে ফিরে যাওয়া ভাল, অনেক দিন বাড়ির বাইরে আছেন তো।'

যে কথা বলি বলি করেও মোতাহার হোসেন বলতে পারেনি, প্রথম দিনেই ত্রিপুরা সে কথা বলে ফেলল।

'দেখ, জীবনযাত্রা খুব হিসেবের মধ্যে নয় আমার। নানা ভাগ্যবিপর্যয়ে শেষপর্যন্ত যে বৃত্তিতে এসে আমি থিতু হয়েছি, সমাজ তাকে ভালো চোখে দেখে না।'

'সমাজ বৈদ্যদের বৃত্তিটাকেও তেমন উচ্চস্থান কোনোদিন দেয়নি,' প্রমথ বলল, 'কিন্তু আমরা তো খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই এই পেশাকে লালনপালন এবং বর্ধন করছি।

ত্রিপুরার বাসস্থানটি সুরক্ষিত। চারধারে গাছপালা ঘেরা বাড়িটি প্রশস্ত জায়গায়। পৃথক পৃথক তিন-চারটি বাড়ির সমাহার সুপারি গাছের কাণ্ড এবং অন্য শক্ত গাছের গুড়ির উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

পান এবং তামাক দিয়ে ত্রিপুরা আপ্যায়ন করল বাল্যকালের বন্ধুকে। পান তো পুরাণের আমল থেকে বাঙালির সঙ্গী, কিন্তু তামাক নতুন। তামাকে তেমন অভ্যস্ত নয় প্রমথনাথ। তবে একেবারেই যে অপরিচিত, তেমনও নয়। তামাকের ধোঁয়া ফুসফুসে সামান্য সময় ধরে রাখলে, কেমন মৃদু মসৃণ এক অনুভূতির জন্ম হয়, তাতে যেন চিন্তার গভীরতা বাড়ে, বাক্যে নিবিষ্টতা এবং কর্মে অভিনিবেশ বৃদ্ধি পায়। ভিষক হিসেবে সে তামাকু-ধূমের এই গুণ লক্ষ করেছে। এদেশে বিদেশিরা এই বস্তু আমদানি করে মানুষকে অভ্যস্ত করায় ইতিমধ্যে চাষবাসও শুরু হয়ে গেছে। প্রমথ তামাক অভ্যাস করেনি এই কারণে যে তাৎক্ষণিক গুণ হিসেবে যতটুকু সে উপলব্ধি করেছে তার আড়ালে অগুণ কিছু আছে এমন সংশয় তার। গুণাগুণ উভয়ই পরিষ্কার না হলে, কোনো বস্তুকে নিত্য ব্যবহারে অভ্যাস করার পক্ষপাতী সে নয়।

দুপুরের স্নান-খাওয়ার আগে ত্রিপুরা রোগীদের দেখার প্রস্তাব করল। রোদ এবং আলো যথেষ্ট জোরালো থাকতেই রোগী দেখা ভালো এমন বিবেচনায় প্রমথ সম্মতি দিলে ত্রিপুরা অসুস্থদের নিয়ে আসার আদেশ দিল।

চারজন স্ত্রীলোক, যাদের সবার বয়সই বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে এবং দু-জন বালককে প্রমথর সামনে হাজির করা হল।

এই চারজন স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন মাধবী। সে চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সি এক যুবতী, অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী এবং একই সঙ্গে বিষাদপ্রতিমা।

প্রমথনাথ মাধবীর সঙ্গে কথা বলল সবার শেষে, একেবারে নিরালায়।

'তোমার কী অসুবিধা?'

মাধবী তার দীর্ঘ পল্লবযুক্ত চোখ দুটি ঈষৎ তুলে বলল, 'কোনো

অসুবিধা তো নেই!'

তার বাম বাজুতে একখানা কালো সুতোয় বাঁধা একটি তাবিজ। প্রমথ সে দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'হাতে কী বেঁধেছ?'

'তাবিজ।' সে মুখ নিচু রেখেই বলল।

'কে দিয়েছে?'

'ছোলেমান ফকির।'

'কেন বেঁধেছ তাবিজ!'

সে একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমাকে ভূতে ধরেছিল।'

প্রমথনাথ একটু সময় চুপ করে রইল।

পরে বলল, 'ভূত এখন ছেড়ে গেছে তোমাকে?'

মাধবী বলল, 'হ্যাঁ।'

'ভূত কি তোমাকে এই একবারই ধরেছিল, না আগেও এরকম হয়েছে?'

'আগেও ধরেছে।'

'তাবিজ নেওয়ার পরেও ধরেছে?'

মাধবীলতা একটা ইতস্তত করে বলল, 'হ্যাঁ।'

চিকিৎসক হিসেবে প্রমথনাথ নিঃসন্দেহ হতে চাচ্ছিল যে সত্যি সত্যিই কোনো প্রেতযোনি প্রাপ্ত দুষ্ট আত্মা, না মানসিক ভারসাম্যে বিঘ্ন, কোনটা এই যুবতীর রোগের কারণ। একটু আগে ত্রিপুরা যখন এইসব রোগীদের রোগলক্ষণের বিবরণ দিচ্ছিল তখন সে অবশ্য প্রেতাত্মা বিষয়ক কোনো কথা বলেনি। সে বলেছিল, মেয়েটি অত্যন্ত হতভাগ্য। মাঝে মাঝে তার ভিতরে বিচিত্র ভাবপরিবর্তন হয়। প্রথমে গম্ভীর, তারপরে বিষণ্নতা, যা ক্রমশ এমন তীব্র হয় যে সে কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়। সবশেষে তার আত্মহত্যার প্রবণতা হয়। তখন গভীর পুকুরের নীচের গাঢ় অন্ধকার কিংবা উঁচু গাছের ডালে বসে কেউ তাকে 'আয় আয়' বলে ডাক দেয়।

'আচ্ছা তুমি যেতে পার,' প্রমথনাথ মাধবীকে বিদায় দিয়েছিল। সন্ধ্যায় ত্রিপুরার নিভৃত এবং আরামদায়ক বৈঠকখানা ঘরে পাশার গুটিতে দান দিতে দিতে প্রমথনাথ বলল, 'অন্য ক-জনের রোগ সাধারণ রোগ, ওষুধ সেবনে সেরেও যাবে। কিন্তু ওই যুবতী— আচ্ছা ত্রিপুরাশঙ্কর— এই মেয়েটির প্রতি তোমার যেন একটু বেশি দুর্বলতা। ও কি তোমার উপপত্নী?'

ত্রিপুরা দুহাতে পাশাগুলো সশব্দে দ্রুত ঘষতে ঘষতে দান ফেলার মুহূর্তে

বলল, 'ক-চ্ছয় বারো! সুন্দরীদের প্রতি দুর্বলতা তো আমার বাল্যকাল থেকেই। তুমি তো তা জানও। তবে ও আমার উপপত্নী নয়। এরা সবাই আমার ব্যবসার সামগ্রী।'

'ভারী সুন্দরী মেয়েটি', প্রমথ বলল।

'ভারী দুঃখীও', বলল ত্রিপুরা, 'কিন্তু রোগটা কি সারবে?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে প্রমথ বলল, 'দুঃখী তো এ পোড়া দেশের বা সারা পৃথিবীর সব মেয়েই। এর বিশিষ্ট দুঃখটা কী?'

ত্রিপুরাশঙ্করের পাশা উলটে আছে, তাতে তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দান ওঠেনি। মনে হচ্ছে প্রমথর আগ্রহ তাকে প্রভাবিত করছে।

সে বলল, 'ঠিকই বলেছ। এদের দুঃখের কোনো পৃথক বৈশিষ্ট্য নেই। আমার এখানে বাইশজন স্ত্রীপুরুষ আছে। তাদের সবাইকে আমি কিনে এনেছি। কজনকে কিনেছি হুগলির দাস বাজার থেকে, পিপলি আর তমলুকের মগের দালালদের কাছ থেকে কিনেছি কয়েকজনকে। বাপ-মা বেচে দিয়েছে কাউকে, আবার একজন আছে যে পিতৃঋণ শোধের জন্য নিজেকেই বেচে দিয়েছে। তুমি যার সম্পর্কে উৎসাহী, সেই মাধবীলতাকে যশোরের গ্রাম থেকে ফিরিঙ্গি দস্যুরা লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল অল্প বয়সে। তারপরে দশ-বারো বছর সে কোথায় ছিল, কেমন ছিল সে পর্যায়টা আমিও ঠিক জানি না। আমার কাছে আছে বিগত তিন বছর। আমি ওকে ব্যান্ডেলের পর্তুগিজ ব্যবসায়ী পিদ্রুর কাছ থেকে কিনেছি।'

প্রমথনাথ ত্রিপুরার কথার মাঝখানে বাধা না দিলেও প্রসঙ্গ বিস্মৃত হয়নি। বলল, 'না-না, আমি কারো সম্পর্কে উৎসাহী নই। আমার উৎসাহ ওর রোগটি সম্পর্কে।'

ত্রিপুরাশঙ্কর শব্দ করে হেসে উঠে তার দানের অনুরূপ চাল দিতে লাগল। বলল, 'এমন পুরুষমানুষ দেখিনি যে সুন্দরী যুবতী সম্পর্কে আগ্রহী নয়। তুমি অবশ্য খুবই সংযত মানুষ তা জানি।'

প্রমথনাথ জীবনে কিছু নিষ্ঠা অভ্যাস করেছিল। গুরুর নির্দেশেও বটে, তা ছাড়া যে বৃত্তিতে সে নিযুক্ত, তা কিছু চারিত্রিক শৃঙ্খলা দাবি করে। তবুও মাধবীকে দেখার পর থেকে তার হৃৎপিণ্ড যে বেশ খানিকটা অতিরিক্ত রক্ত ধমনীতে ঠেলে দিচ্ছে তা তো সে নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারে না। বলল, 'তোমার কথাটা ওষুধের নিক্তির মাপে ঠিক নয়। এমন অনেক পুরুষ

মানুষ আছে যাদের স্ত্রীলোকে নয়, পুরুষেই আসক্তি। অনেক স্ত্রীলোকের বিষয়েও এ কথা বলা যায়। আবার স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যে এমন মানুষও আছে, যৌন বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। এমন মানুষও দেখেছি একেবারে শেষ মুহূর্তে আচমকা টের পেয়ে গেল কী ভয়ঙ্কর আগুন তার ভিতরে চাপা পড়ে আছে।'

ত্রিপুরা বলল, 'তুমি কবিরাজ মানুষ, অনেক দেখা আছে তোমার। আমি কথাটা সাধারণভাবেই বলেছি। কাল আরো কয়েকজন রোগী তোমাকে দেখতে হবে, সে কথা কিন্তু আগেই বলে রাখছি।'

'তোমার এখানে সব রোগী দিয়ে ভরে রেখেছ নাকি?' প্রমথ বলল, 'এখানে তোমার পরিবারের লোকদের তো দেখতে পাচ্ছি না কাউকে?'

'পরিবারের লোকজন এ বাড়িতে থাকে না, তারা থাকে পালঙে। এ বাড়িটি আমার ব্যবসার প্রয়োজনেই রাখা। পিপলিতে, হুগলিতে, চাঁদপুরে এবং তমলুকে আমার আরো চারটি কুঠি আছে,' ত্রিপুরা তার ব্যবসার প্রায় পুরো খবর দিয়ে ফেলল।

প্রমথ বলল, 'মাধবীকে এতদিন ধরে পুষেছ কেন?' পাশার দান তার মনমতো হচ্ছে না দেখে সশব্দে এবং ভঙ্গি করে পাশা ছাড়ল সে। ত্রিপুরাশঙ্কর মনে মনে হাসল। বলল, 'পিদ্রুর কাছ থেকে পঁয়ষট্টি টাকা দিয়ে কিনেছি এই যুবতীকে। পনেরো-ষোলো টাকায় এই বয়সি স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীলোক অনেক পাওয়া যায়। তিনবার ওর জন্য ভালো দাম পেয়ে অসুস্থতার কারণে পিছিয়ে এসেছি। আসলে হস্তান্তরের ব্যবস্থা হলেই ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, এটা ওর ভান। কিন্তু পরে বুঝেছি তা নয়। এখন তোমার ভরসা। তুমি যদি সুস্থ করে তুলতে পার, তাহলে দ্বিগুণ না হোক দেড়া দামে ওকে গস্ত করতে পারব।'

'ওকে বিক্রি করবে? তবে যে বললে বিয়ের ব্যবস্থা কর তুমি?' প্রমথনাথ বিস্মিত হল।

বিস্মিত ত্রিপুরাশঙ্করও কম হয়নি। বলল, 'নৌকায় ভরে ঘাটে ঘাটে ঘুরে বিয়ের ব্যবস্থা করি, সে তো বিক্রির নামান্তর। যে বিয়ে করবে সে তো দাম দিয়েই কনে সংগ্রহ করবে। তা ছাড়া দাস ব্যবসাও করি আমি, সে তো গোপন কোনো ব্যাপার নয়, বে-আইনিও নয়।'

প্রমথ মনে মনে লজ্জিত হল। এসব কথা তার অজানা নয়। তবুও মানুষ

কেনাবেচার ব্যাপারটা কোনো অজ্ঞাত সংস্কারবোধের তাড়নায় মনের ভিতরে অপ্রীতি সৃষ্টি করে। চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ সমাজে দাসদাসী নিয়ে যে ব্যবস্থা চালু, তা তো যথেষ্ট উদার। দাসীরা পরিবারস্থ পুরুষের শয্যায় প্রায়শই ঠাঁই পায়। তাতে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তারা পরিবারের সন্তানের মতোই প্রতিপালিত হয় এবং পরিবারের পদবি ও গোত্র ব্যবহারের অধিকারী হয়। জীমূতবাহন দায়ভাগে দাসদাসী সম্পর্কে কিছু নীতিনির্দেশও দিয়ে গেছেন। চন্দ্রদ্বীপরাজবংশ কায়স্থবংশ। এতকাল তারাই সমাজ শাসন করেছেন।

ত্রিপুরাশঙ্কর আবার বলল, 'আমাদের কায়স্থসমাজে তো বিবাহে দান হিসেবে দাসী, যাকে বলে দানগর, পাওয়া যায়। দাসী যৌতুক দেওয়ার প্রথা তোমাদের কিংবা বামুনদের সমাজেও তেমন অপ্রচলিত নয়!'

প্রমথ বলল, 'হ্যাঁ, সে তো ঠিকই। সমাজ যে কোথায় বাঁধে আর কোথায় ভাঙে, সব সময় বোঝা যায় না। এই দেখ, কৌলীন্য-প্রথার এমন কড়াকড়ি ব্যবস্থায় সমাজ কেমন তটস্থ, আবার এই তোমার ব্যবসা ভরার মেয়ে— আচ্ছা দানগর শব্দটা কী সমাস বল তো? অর্থ কী শব্দটার?'

ত্রিপুরা হেসে ফেলল। বলল, 'ভালো লোককেই জিজ্ঞেস করেছ, অত শাস্ত্রই যদি জানতাম, তা হলে আর এই ব্যবসা করি?'

প্রমথ বলল, 'দান শব্দের অর্থ শুধু সম্প্রদান নয়, পালনও, দে অন দান, তাতে প্রতিপালনের জন্য গ্রাহ্য এমন অর্থ— অবশ্য শব্দটার আরো অর্থ আছে।'

ত্রিপুরাশঙ্কর বলল, 'কিন্তু গর? গর যুক্ত হলে কী অর্থ? সম্প্রদান কিংবা পালন যাই বল না কেন গর যুক্ত হলে তা আর তেমন মোলায়েম থাকে না। গর তো গ্রাস অর্থেই গ্রাহ্য, যেমন অজগর! সমাসটি যদি কর্মধারয় হয়—'

প্রমথ সোৎসাহে বলল, 'দারুণ বলেছ! তোমাকে যে মূর্খ বলে সে নিজেই মূর্খ। একটু ঘুরিয়ে হলেও একটা যুক্তিগ্রাহ্য অর্থ পাওয়া যাচ্ছে বটে। শব্দের অর্থ যে সব সময় সরল পথে চলে, আদৌ তেমন নয়। বক্র, বিকৃত এমনকী বিপরীত অর্থও শেষ পর্যন্ত শব্দের প্রধান অর্থ দাঁড়িয়ে যায়।'

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। একজন দাসী দু-খানা গাত্রাবরণ দুজনকে দিয়ে গেল এবং কুলুঙ্গিতে প্রজ্বলিত প্রদীপ রাখল। খেলা অনেক আগেই মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

৫

গ্রামগুলো সবই নদীতীরবর্তী অথবা খাল-সংলগ্ন। খালগুলো আবার নদীগুলোকে যুক্ত করে আছে। এক নদীর চার-পাঁচটা নাম থাকতেও বাধা নেই। মোহনার কাছে নদীর বিস্তৃতি পাঁচক্রোশ বা ছ-ক্রোশ। মোহনা থেকে পাঁচক্রোশ দূরে পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে নদী কখনো আধা কিংবা এক ক্রোশ প্রশস্ত। নদী এবং বারদরিয়া প্রায় যেন একই রকম অশান্ত, বিশেষ করে যখন আকাশে মেঘ জমে।

আঁধারমানিক গ্রামটাকে নদী অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরেছে। নদীও তো ওই নামে, যেন নদী ও গ্রাম—দুইয়ে মিলেই নামটা ছিল।

কিন্তু বিগত তিন পুরুষ ধরে গ্রামের নাম একটু পরিবর্তিত হয়েছে। বিশ ক্রোশ দক্ষিণে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে নিবিড় বনাঞ্চল। বন পুব থেকে পশ্চিমে বেড়েছে এবং ক্রমে স্থানীয় নামকে অতিক্রম করে সাধারণ নাম সুন্দরবনের বিস্তৃতিতে আশ্রয় পেয়েছে। মগ, ফিরিঙ্গি, হার্মাদদের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারে দক্ষিণের এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের সমৃদ্ধ গ্রামগুলি পরিত্যক্ত হয়ে ক্রমশ পুবে এবং উত্তরে সরে এসেছে। পুরানো বসতি ছেড়ে দিয়ে এসেছে বনকে। বন ক্রমশ বেড়ে সুন্দরবন হয়েছে, গ্রাস করেছে আবাদ, মানুষের ঘরবাড়ি জনপদ। আঁধারমানিক নামক অখ্যাত গ্রামটিকে আড়াল করে ধাত্রীনগর বা ধাইনগর নামে বর্ধিষ্ণু গ্রাম গড়ে উঠেছে এই নিয়ে যার তৃতীয় প্রজন্ম।

নদী গ্রামের পশ্চিম দিক থেকে উত্তরে যেতে বাঁক নিয়ে দক্ষিণে নেমে গেছে। এই অর্ধচন্দ্রের শুরুতে পুরানো গ্রাম আঁধারমানিক, শেষে নতুন পত্তন ধাত্রীনগরের অন্তিম। আঁধারমানিকে মুসলমান পাড়া, ধাইনগরে উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের আধিক্য, মাঝখানে নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের স্বাভাবিক অবস্থান।

নদীর পাড় দিয়ে সুপারি এবং নারকেলের পৃথক পৃথক ঘন জঙ্গল দেখে আশ্চর্য হতে হয়। একটি গাছ থেকে আর একটি গাছের দূরত্ব যে কোনো দিকে পাঁচ-ছ হাত। এরকম একটি শ-তিনেক গাছের ঝোপঝাড়হীন জঙ্গল থাকা খুবই সম্ভব। এ রকম একটি সুপারি বনের ভিতর দিয়ে যদি কেউ হেঁটে যায়, বিশ-পঁচিশ হাত দূর থেকেও কেউ টের পাবে না বা টের পেলেও বুঝতে পারবে না লোকটা কে। বরং আলম্ব সমান্তরাল গাছের সারি বিশ হাত দূর দিয়ে হেঁটে যাওয়া লোকটাকে নিয়ে দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে নানা রকম বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারে।

বোবার এ রকম বিভ্রম হল। বোবা আঁধারমানিকের আবু মুসার ছেলে। জন্মাবধি কালা, সম্ভবত সেই কারণেই বোবাও। জন্মের পর একটা নাম হয়তো তার বাপ-মা রেখেছিল কিন্তু যে বয়সে বোঝা গেল সে বোবা সেই থেকে তার নাম বোবা। তার আসল নাম তার বাপ-মাও হয়তো ভুলেই গেছে। যে কানে শোনে না, তার নামের কী দরকার?

ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সি বোবা সুপারি এবং নারকেল পাড়াকে জীবিকা করে নিয়েছে। বাঁদরের ক্ষিপ্রতায় গাছ বাইতে পারে সে। আর সে গাছ যদি সুপারি হয়, তাহলে নিমেষে বোবার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাত সোজা উঠে যাওয়া দেখবার মতো। উঠে গিয়ে এক গাছের কাজ শেষ করে দোল খেয়ে দশ-বারো হাত দূরের অন্য একটা গাছে উড়ে যাওয়া দেখলে সাহসী লোকেরও হৃৎকম্প হবে। বোবা এভাবে বিশ-পঁচিশটা গাছ একবারে 'কামিয়ে' নীচে নেমে এসে সুপারির ছড়ি এক জায়গায় জড়ো করবে। কখনো কখনো তার সঙ্গে একজন অল্পবয়সি সাহায্যকারী থাকে।

আজ সে একাই। কার্তিকের চমৎকার নীল আকাশের রোদ সকালে মিঠেই লাগছিল। কিন্তু দিনের দ্বিতীয় প্রহরে এই সুপারি বনের মধ্যে বেশ গরম লাগছিল তার। ফলে পাঁচ-ছটি গাছ থেকে সুপারি নামিয়ে সে নেমে এল। গামছা দিয়ে গা-হাত-পা ঝেড়ে মুছে সে বসার জন্য একটা প্রশস্ত জায়গা খুঁজছিল। সেই সময় সে বেশ খানিকটা দূর দিয়ে সাদা, সবুজ এবং পোড়া মাটির মিশ্র রঙের একটা ডুরেকে যেন সরে অদৃশ্য হতে দেখল।

বোবা নিঃসন্দেহ হল যে কোনো স্ত্রীলোকের শাড়িকেই সরে যেতে দেখেছে এবং যেহেতু কালা এবং বোবা হওয়া সত্ত্বেও সে নির্বোধ নয়, সে বুঝল অমন রঙিন ডুরে শাড়ি কোনো সচ্ছল গৃহস্থ ঘরের কন্যা কিংবা বধূরই হবে।

সে ব্যস্ত হল না। ঘরে তার রুগ্‌ণ একজন স্ত্রী আছে যে স্ত্রীলোকটি বোবার সুগঠিত দেহ এবং তপ্ত কাঞ্চন সৌন্দর্যের সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

ফলে বোবার কাছে স্ত্রীলোকেরা গোপনে আসে। তারা বেশির ভাগই তার স্বজাতের বিবাহিত স্ত্রীলোক। সামান্য কয়েকজন নিকিড়ি স্ত্রীলোকও আছে। বস্তুত, নিকিড়িদের সঙ্গে বোবা এবং তার শ্রেণির মুসলমানদের আদান-প্রদান ছিলই কিন্তু তা কখনো গ্রাহ্য বৈবাহিক সম্পর্কে নয়।

দুজন উচ্চবর্ণের হিন্দু স্ত্রীলোকও বোবার কাছে কয়েকবার এসেছে। এই দু-জনই বাল্যবিধবা। এদের মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। অপরজন বেশ কয়েকবার বোবার কপাটের মতো বুকের মধ্যে দুমদাম অনেকগুলো করে কিল মেরে তাকে নিয়ে দূরে কোথায় পালিয়ে যাওয়ার কথা ইঙ্গিতে বুঝিয়েছিল। বোবা শুধু নিঃশব্দে দুই পাশে মাথা নেড়ে 'না' জানিয়েছে। অবশেষে সেই স্ত্রীলোকটিকে চন্দ্রাবলী নামের বোষ্টমি নৌকায় করে সোহাগপাশার ভরার নাওয়ে ভরার মেয়ে বানিয়ে তুলে দিয়ে এসেছিল। রাতের অন্ধকারে সে নৌকা চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অবশ্য বোবাই। বোবার সমস্ত শরীরে গাছের পিঁপড়ের কামড়ে লাল লাল দাগ। কোথাও বিষাক্ত পোকার কামড়ে আমবাতের মতো ফুলে ওঠা রক্তাক্ত অঞ্চল। গামছা দিয়ে শরীর পরিষ্কার করে আবার গাছে ওঠার উপক্রম করতে ফের তার মনে হল পূর্বের অপেক্ষাকৃত পাতলা হয়ে আসা সুপারি গাছের সারির ভিতরে সেই ডুরে শাড়িপরা কোনো বরতনু মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাছে ওঠা বন্ধ রেখে সে সেদিকে দ্রুত এগিয়ে গেল। কিন্তু সুপারি গাছের জঙ্গলের মধ্যে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি খাড়া উঠে যাওয়া গাছ যেন একটা বিশেষ, ধরনের দুর্গের পাঁচিলের অংশ। দ্রুত হাঁটতে গেলে মনোযোগ একাগ্র রাখতে হয়, না হলে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জখম হওয়ার সম্ভাবনা। আবার একাগ্র হয়ে গাছের দিকে নজর রেখে এগোলে দিকভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পুব দিকে ঘনত্ব অগভীর হতে হতে সামান্য দূরে বিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্যের ভিটা শুরু হয়েছে। বস্তুত, বোবা বিষ্ণুপ্রিয়র সুপারি পারার কাজেই ব্যাপৃত ছিল। দ্রুত বন পার হয়ে ফাঁকা জায়গার কাছাকাছি আসতেই সে বিষ্ণুপ্রিয়র কন্যা খুকিকে দেখতে পেল। খুকি বা

শর্মিষ্ঠা ততক্ষণে খোলা মাঠটুকু পার হয়ে তাদের ভিটার ভিতরে ঢুকে গেছে।

বোবা কোনো শব্দ করল না। তা সত্ত্বেও গাছের আড়ালে অদৃশ্য হওয়ার আগে খুকি একবার পিছন ফিরে বোবাকে না দেখার ভান করে জিভ ভেঙাল এবং আরো একবার ঘুরে কথা বন্ধ রাখার আড়ি দেওয়ার ভঙ্গি করল। তারপর গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

বোবা একটু সময় বিব্রত এবং বিষণ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে মৃদু হেসে পিছন ফিরল। সত্যি ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। আজ তিন-চার দিন হল খুকি বাপের বাড়িতে এসেছে, এর মধ্যে একবারও সে তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারল না। খুকির অভিমান ন্যায্য। বোবা, যদিও কেউ দেখার নেই, তবুও দু-কান মলল। যেন খুকির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে যা তাকে করতে হবে, তার মহড়া করে নিল সে। ভারী আশ্চর্য হল সে। যত বার খুকি ঘুরে আসছে, তত বারই যেন অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে সে। আর কী সুন্দরই যে সে হয়েছে! পিছন থেকে দেখলে তাকে আর তার মায়ের সঙ্গে তফাত করা যাবে না। জিভ দেখানো এবং আড়ি করার ভঙ্গি না থাকলে, সত্যি বলতে কী, বোবা তার দিকে তাকাতেও হয়তো সাহস করবে না। খুকি পুরোপুরি মেয়ে মানুষ হয়ে গেছে।

ছোট সড়কা পায়ে আটকে বোবা ক্ষিপ্র হাত-পায়ে গাছে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে মনে পড়ল এখানেই এই সুপারি গাছের জঙ্গলে খুকি একদিন আবদার ধরেছিল সেও গাছে উঠবে। খুকির বয়স তখন সাত। সে তখন দিনের বেশিরভাগ সময় বোবার সঙ্গেই থাকত। দুরন্ত মেয়েটির মনোবাসনা বুঝতে দেরি হল না বোবার। দুজনের চোখে-চোখে কী যেন সব কথাও হয়ে গেল আকারে ইঙ্গিতে। ছোট শাড়িখানা খুলে নিয়ে বোবা খুকিকে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিল। তারপর ইঙ্গিতে বোঝাল ভয় লাগলে চোখ বন্ধ করে থাকবে। ওই বয়সেই খুকির অবশ্য ভয় বিশেষ ছিল না।

কোনো কোনো গাছের মাথায় হাত দুয়েকের আড়কাটি বাঁধা থাকে। সে রকম একটা গাছ দেখে খুকিকে পিঠে নিয়ে নিঃশব্দে উঠতে লাগল বোবা। হাত দশেক উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে সে নিঃসন্দেহ হল, চোখে ত্রাস সামান্য থাকলেও তার থেকে বেশি বিস্ময় খুকির।

বিশ হাত ওঠার পর আরেকবার থামল বোবা। খুকির চোখ চারিদিকের গাছপালা, নীচের মাটি ঝোপ অবাক হয়ে দেখছে। প্রায় ত্রিশ হাত উঁচু

গাছটার শেষপ্রান্তে উঠে বোবা আড়কাঠির উপর দাঁড়াল।

নীচের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল খুকি। আর কোনো মেয়েমানুষ পৃথিবীর এই উচ্চতায় কোনোদিন ওঠেনি। গাছগুলোর ঘাড়ছাঁটা পাতার ঝোপের ভিতর দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে তাদের বাড়ি। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। বাঁ-দিকে নদী, যার নাম আঁধারমানিক। অত বড় নদীটাকেও এই উচ্চতা থেকে ছোট এবং পট চিত্রের মতো দেখাচ্ছে। খুকি প্রাণভরে দেখল নীচের পৃথিবীকে এবং উপভোগ করল এ পর্যন্ত অজ্ঞাত এব অনুভূতি, সন্ত্রস্ত উত্তেজনা থেকে যা জন্ম নেয়।

নীচে নামার পর খুকিকে বন্ধন মুক্ত করে, গা-হাত পায়ের পিঁপড়ে, পোকা ঝেড়ে ফের নিপুণ করে শাড়ি পরিয়ে দিল বোবা। নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে সতর্ক করল খুকিকে, তারপর খুকির ঠোঁটের উপরে তর্জনী চেপে রাখল।

অনুরূপ মুদ্রা করল খুকিও।

গাছের শেষ, উচ্চতায় উঠতে উঠতে বোবা সে দিনের কথা ভেবে বিস্মিত হল। ওরকম আর কোনো দিন হবার নয়। খুকি বড় হয়ে গেছে। তার বিয়েও হয়ে গেছে। বোবা ভেবেছিল তাদের দুজনের সেই সব হাসি খেলা উত্তেজনা আর মনে পড়বে না খুকির। কিন্তু আজ তার নিঃশব্দ বন পরিক্রমা এবং আড়াল থেকে তাকে দেখে যাওয়ার মধ্যে, অভিমানের মধ্যে, বোবা টের পেল খুকি সে সব কথা ভোলেনি। সে নিজেও তো ভোলেনি। খুকি কি তাকে অন্য কিছু কথাও বলতে চায়? দু-দুটি প্রবল ইন্দ্রিয়হীন বোবা চোখ-নাক এবং শরীর দিয়ে কোনো গভীর রহস্য বোঝার চেষ্টা করতে করতে মাথা নাড়ে।

সেই ত্রিশ-বত্রিশ হাত উচ্চতায় উঠে আড়কাঠির উপর দাঁড়িয়ে সে বিষ্ণুপ্রিয়র বাড়ির দিকে তাকিয়ে কেন যেন বিষণ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বছর চারেক হল সে খুকিদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়েছে। সেই সময় সবে খুকির বিয়ে হয়েছে। খুকিহীন বিষ্ণুপ্রিয়র বাড়ি মাসখানেকের মধ্যে বোবার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। বছর খানেকের মধ্যে সে বিয়েও করল। সংসারের প্রয়োজনে আরো বেশি রোজগারের পন্থা তাকে খুঁজতে হয়েছিল। এখন সে স্বাধীনভাবে গাছ বাওয়ার কাজ করে। ঋতুর প্রয়োজন মতো নারকেল, সুপারি, খেজুর প্রভৃতি গাছ বাওয়ার কায়িক কাজ এবং এসবের সঙ্গে যুক্ত

ব্যবসায়িক কাজও করে। সে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পুনরায় মনে করল খুকি তাকে নারকেল গণনা এবং ভীষণ কঠিন সুপারি গণনা ও হিসাব রাখার কাজ শুধু হাত, আঙুল এবং কর ব্যবহার করে নির্ভুল ভাবে রাখতে শিখিয়েছিল। এক হাতে দশ আঙুল, অর্থাৎ দশটা সুপারিতে এক 'গা'। এমন বাইশ 'গা' নিয়ে হল 'এক কুড়ি' এবং একশো 'গা' নিয়ে হল একশো সুপারি। দ্রুত সুপারি গুনতে না শিখলে সুপারির ব্যবসা করা যায় না। বোবা এখন সারা বছর ধরে অনেকগুলো টিলার আকৃতির সুপারির স্তূপ অতিদ্রুত গুনে ফেলে। এই গুনতে শেখা না হলে তার ব্যবসা করা হত না। সে খুকির কাছে সারা জীবনের মতো এ কারণেও কৃতজ্ঞ।

৬

বিষ্ণুপ্রিয়র বাড়ি ধাত্রীনগরের মাঝামাঝি আর ক্ষেমংকরের নদীর নিকটে। অতিপ্রশস্ত নদীটি মেঘনার নিম্নগতির একটি পরিত্যক্ত অংশ বললেও চলে, তেঁতুলিয়া বা ইলশার অংশ বললেও চলে। আসলে নদী এখানে কোনো স্থির বা নিশ্চিত স্থিতি নয়। নদী এখানে গাঙ। ইলশা বা তেঁতুলিয়া বা আয়লা বা আঁধারমানিক নয়, গাঙ। অথবা ওই সব নামেও নদীকে পরিচয় করায় কেউ কেউ। এরা সব মেঘনার নিম্নতম গতিপথের অস্থির পরিচিতি। অস্থির এই কারণে যে বিশ-পঁচিশ ক্রোশ সরে গিয়ে বা পাড় ভেঙে নদী সম্পূর্ণ নতুন ভূ-সংস্থান তৈরি করতে পারে। আর যে পথে সে এতকাল, ধরা যাক, শতাধিক বছর বয়ে গেছে, বালি আর পলির বিস্তীর্ণ প্রান্তর হয়ে একদিন জেগে উঠল সে। আকাশে মেঘ দেখলে আবার সেই মেঘনা নেচে ওঠে। প্রবল, প্রায় সমুদ্রের মতো ঢেউ ওঠে নদীতে।

আঁধারমানিক তার প্রশস্ত দেহে কালো মেঘের ছায়া অনেকটাই ধরতে পারে। কিন্তু এখন এই হেমন্তের প্রাতঃকালে আঁধারমানিকের বুকে সাদা

উচ্ছল মেঘ ও নীল রঙের আকাশ মাখামাখি। নদীর ভিতরে আকাশ দেখে বিষ্ণুপ্রিয়র নিজের বড় মেয়েটির কথা কেন যেন মনে পড়ল। হয়তো এমনিই, স্নিগ্ধতার সাদৃশ্যে। কন্যা, নদী, আকাশ এই সব কিছুতেই বিষ্ণুপ্রিয়র আজ আনন্দ। নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে দক্ষিণের দিকে যাচ্ছে। সে ক্ষেমংকরের সঙ্গে দেখা করবে। ধাত্রীনগরের দিকটি নদীর পশ্চিম তীর। এই পাড় নদীর জলধারা থেকে অনেকটাই উঁচু। এত উঁচু যে জলে নামার জায়গাগুলো তির্যক খাঁজ কেটে বা কখনো সিঁড়ির অনুরূপ ধাপ কেটে নীচে নামাতে হয়। ধাত্রীনগরের কেন্দ্রস্থলের উচ্চতা নদীপাড়ের উচ্চতার কম। গ্রামের সব রাস্তাই নদীতে গিয়ে শেষ। বিষ্ণুপ্রিয় হেমন্তকালীন প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে এগোতে লাগল। সমস্ত গাছপালা, অনতিদূরের বনভূমি মলিনতাবিহীন উচ্ছল সবুজ। বাতাস নির্মল এবং হেমন্তকালীন রোদের তাপে শরীরে ঘাম জমছে কিন্তু সেই ঘাম বিগত ঋতুর লবণাক্ত ঘামের মতো ক্লেদাক্ত নয়।

ঘাটগুলোতে স্নানার্থী স্ত্রী পুরুষের কোলাহল। বালক-বালিকাদের চঞ্চলতা এবং দূরে গিয়ে সাঁতার কাটার দুঃসাহসে বয়স্করা সতর্কতা নির্দেশ করছে। নদীতে কুমির এবং কামট আছে।

চক্রবর্তীদের ঘাটে জিতু এবং দয়াল চক্রবর্তী দুই ভাই স্নানান্তে শিখা এবং পৈতার পরিচর্যা করছে। একজন ভৃত্য তাদের কাপড়, তেল এবং অন্যান্য স্নানের উপকরণের পাহারাদার হয়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। চক্রবর্তী ভাইদের সঙ্গে তাদের প্রায় সবসময়ের সঙ্গী গোবর্ধন গুহও আছে। স্নান করছে সেও তবে চক্রবর্তীদের থেকে হাত দশেক দূরে।

বিষ্ণুপ্রিয় মনে মনে এই দূরত্বের কারণ অনুমান করার চেষ্টা করতে লাগল। ধাত্রীনগরের সমাজ চক্রবর্তী ভ্রাতৃদ্বয় এবং অনুরূপ আরো দু-চারজনের নির্দেশে চলে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্যপ্রধান এই গ্রামটিতে এইসব উচ্চবর্ণের প্রাধান্য সংখ্যায় নয়, অন্যসব বর্ধিষ্ণু গ্রাম নগরের মতোই বর্ণশ্রেষ্ঠতায়, শাস্ত্রের অধিকার ও কর্তৃত্বে।

দয়াল বিষ্ণুপ্রিয়কে আগে দেখতে পেয়েছিল। ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ এত সকালে বিষ্ণুপ্রিয়?'

ডাক দেওয়া এবং প্রশ্ন করার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। আর তা হল অভ্যস্ত কর্তৃত্ব। চক্রবর্তী সামাজিক কর্তৃত্বে অভ্যস্ত।

বিষ্ণুপ্রিয় দাঁড়িয়ে পড়ল। আরো একটু নদীর কাছাকাছি এগিয়ে এসে

বলল, 'আজ্ঞে, ক্ষেমংকরের বাড়িতে যাচ্ছি।'

'ক্ষেমংকর কবিরাজ এসেছে নাকি?'

জিতু চক্রবর্তী পৈতা মার্জনা করতে করতে জলের ভিতরেই দু-এক পা এগিয়ে এল।

'আজ্ঞে, গতকাল আসার তো কথা ছিল। এসেছে নিশ্চয়ই।'

বিষ্ণুপ্রিয় সতর্ক সমীহ রক্ষা করে কথা বলতে লাগল। ধাত্রীনগরের এই দুই চক্রবর্তী একেবারে কাঁচাখেগো।

'এলে একবার আমাকে দেখতে যেতে বল তো। বাতের ব্যথাটা আবার চাগাড় দিয়েছে', জিতু বলল।

'আজ্ঞে বলব।'

বিষ্ণুপ্রিয় প্রায় সম্মতি নেবার সবিনয় ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে এক পা এগোতে মনে হল গোবর্ধন দয়ালহরিকে কিছু বলল। দুজনের ভঙ্গিতেই এমন মনে হল তার, কেননা স্বর ভারী নিচু।

'আরে বিষ্ণু ভট্টা, তোমার দ্বিতীয় কন্যাটির বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক হল?'

বিষ্ণুপ্রিয়র মুখ ম্লান হল। দয়ালহরি কিংবা জিতু চক্রবর্তী ঠিক এ ধরনের কোনো একটা প্রশ্ন যে কোনো মুহূর্তে উত্থাপন করতে পারে এরকম আশঙ্কা তার প্রথম থেকেই ছিল। এ শুধু তার নয়, এদের সংস্পর্শে যে কোনো মানুষ আসুক না কেন, তাদেরই এরকম শঙ্কা হয়।

সে মুখ ম্লান করে বলল, 'আজ্ঞে না, এখনো কিছু ঠিক হয়নি।'

'কেন? কেন? ইদিলপুরের শিবরাম পণ্ডিতের মেজ পুত্রের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ এসেছিল, না?'

বিষ্ণুপ্রিয় সাধারণত অন্যের সঙ্গে বিরোধ এড়িয়ে চলে। সে ধীর স্থির শান্ত স্বভাবের মানুষ। কাব্য এবং নাটক তার পছন্দের বিষয়। স্বয়ং কিছু কাব্য লেখার প্রচেষ্টাও সে করে।

তার প্রথম কন্যা শর্মিষ্ঠার বিয়ে হয় সে যখন দশ পেরিয়ে এগারো বছরে পড়েছে। ধাত্রীনগর গ্রামে এই ঘটনা একটা বিপর্যয়ের মতো। যারা জিতু কিংবা দয়ালহরির গোষ্ঠীভুক্ত নয়, তারাও আহত হয়েছিল এবং ক্রমে ক্রমে সমাজের কী ভয়ংকর পরিণতি হতে চলেছে তাতে শঙ্কিত হয়েছিল। বিষ্ণুপ্রিয়কে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল যে তার কন্যাকে চেহারায় পরিণত দেখালেও সে আসলে দশ বছরই সবে অতিক্রম করেছে।

ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেছেন। ঠিক সেই সময়ই উজিরপুরের এই সম্বন্ধটি স্থির হয় এবং শর্মিষ্ঠার বিয়ে হয়ে যায়।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয় সে সময়কার লাঞ্ছনা, নিপীড়িত হওয়ার আশঙ্কাজনিত ত্রাস এবং সেই সূত্রে সত্যভামার অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা ভোলেনি। এই চক্রবর্তী ভ্রাতৃদ্বয় এবং তাদের দলবলই এসব সামাজিক বিধানের হোতা।

সে ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, সে সম্বন্ধ ভেঙে গেছে।'

'কেন? কেন? এমন সম্বন্ধ ভেঙে গেল কেন?'

বিষ্ণুপ্রিয় বলল, 'আমিই ভেঙে দিয়েছি। শুনেছি সে ছেলেটি আর একটি বিবাহও ইতিমধ্যে করেছে।'

দয়ালহরি ততক্ষণে পাড়ে উঠে এসেছে।

'আরেকটি বি-বা-হ!'

দয়ালহরি উপর দিকে ওঠার বেগ সামলে আচমকা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গতির স্মৃতিস্বরূপ তার কানের বড় আকারের কুণ্ডল দুটি দুলতে থাকল।

বিষ্ণুপ্রিয় কেমন এক ধরনের গোপন তৃপ্তি বোধ করতে থাকে। এই লোকটাই ইদিলপুরের সম্বন্ধটাও ভাঙিয়েছে। লোক দিয়ে তার এবং তার বংশ সম্পর্কে অপপ্রচার করেছে। বংশ হিসাবে সে যে ভঙ্গ কুলীনের ঘর সে কথা কারো অজানা নয়। কিন্তু ভঙ্গ হলেও প্রচলিত সমাজে কৌলীন্য অকুলীনদের থেকে বেশি। বিষ্ণুপ্রিয় অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন না হলে এসব প্রসঙ্গ তোলে না। কন্যার বিবাহ এরকম একটি প্রসঙ্গ বটে। সেখানে গোপনীয়তা ভবিষ্যতের নানা ধরনের বিষবৃক্ষের বীজ বপন করবে। না হলে সাধারণভাবে নিজেকে সে অকুলীনই ভাবে এবং সেভাবেই অন্যকে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। তার এবং তার সন্তানদের কৌলীন্য রূপে এবং গুণে থাকুক। থাকুক বিদ্যায়, কাব্য, নাটক এবং দর্শনে। ভঙ্গ কুলীন কন্যার কুলীনের ঘরে বিবাহে বাধা নেই।

ইদিলপুরের পণ্ডিতদের খ্যাতি আছে। বস্তুত, ইদিলপুর বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে নবদ্বীপের প্রতিস্পর্ধী। বিষ্ণুপ্রিয়র এই ছেলেটির প্রতি লোভ ছিল এসব কারণেই। শাস্ত্রচর্চাকে সে সমস্ত পেশার উপরে স্থান দেয়। সে কষ্ট করে

ফারসি শিখেছিল মূলত পারস্য কাব্য, পারস্য শাস্ত্র পড়বার উদ্দেশ্যেই। কী সমৃদ্ধ ভাষা! কী চমৎকার কাব্য! ইদিলপুরের ছেলেটি মঞ্জরীর সব দিক দিয়ে উপযুক্ত ছিল। এই কারণে পাত্রের প্রাক্‌বিবাহে সে আপত্তি করেনি। যদিও অকারণ একাধিক বিবাহে তার ঘোরতর আপত্তি।

ইদিলপুরের পণ্ডিত বংশও মঞ্জরীকে খুবই পছন্দ করেছিল। বিষ্ণুপ্রিয়রা যে ভঙ্গ এসব বৃত্তান্ত জেনেও তারা পিছিয়ে যায়নি।

কিন্তু দয়াল চক্রবর্তী পুরানো অপমান ভোলেনি। বিষ্ণুপ্রিয়র প্রথম কন্যার বিবাহের সময় ভাঙচি দেওয়ার প্রধান কারণ ছিল তার নিজের অরক্ষণীয়া কন্যাটি। সে নানা দুর্নাম দিয়েছিল বিষ্ণুপ্রিয়র বংশের নামে কিন্তু উজিরপুরের পাত্র রামকুমারের বাবা নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়র সহপাঠী ছিল। দুই বন্ধু অল্প বয়স থেকেই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল। দয়ালের শত চেষ্টা সত্ত্বেও উজিরপুরের পাত্র রামকুমারের সঙ্গে শর্মিষ্ঠার বিয়ে আটকানো যায়নি। নিজের যে কন্যাটির জন্য দয়াল উজিরপুরের পাত্রটিকে বে-হাত করতে চেয়েছিল, তার বয়স চোদ্দ পার হয়ে গিয়েছিল। দয়াল অবশ্য প্রকাশ্যে তার বয়স দশ বছর বলেই চালাত। এই মিথ্যাচারে তাকে কোনো সামাজিক অসুবিধায় পড়তে হয়নি। প্রথমত, তারাই সমাজের সব থেকে বড় মাথা, কাজেই কেউ কথা উঠাবার আগে দশবার ভাববে। উপরন্তু মেয়েটি কুরূপা এবং রোগাটে গড়নের বলে বয়স চাপা দেওয়া যেত।

আগের বারের অপদস্থতার কারণে প্রতিহিংসাপরায়ণ দয়াল ইদিলপুরের পাত্রটির ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে। পণ্ডিত হিসাবে না থাকুক, রক্ষণশীল গোষ্ঠী নেতা হিসাবে তার খ্যাতি ছিল। সে প্রথমত বিষ্ণুপ্রিয়র বংশে চার পুরুষ আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাকে পুনরুজ্জীবিত করল এবং অনেকখানি এগিয়ে আসা ইদিলপুরি পণ্ডিতকে ভয় খাইয়ে দিল।

চারপুরুষ আগে তাদের ভদ্রাসন ছিল আরো দক্ষিণে সমুদ্রের কাছাকাছি দশমিনা নামক গ্রামে। আকবর বাদশার রাজত্বকালের শেষ দিকে নিম্নবঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে সমুদ্র দস্যুদের অত্যাচারে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। হোসেনসাহি আমল পর্যন্ত স্থানীয় ভূস্বামীরা এই ধরনের অরাজকতা ও দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধের ব্যবস্থা রাখত। আবার একে অপরের

বিরুদ্ধতা করার সময় অকাতরে দস্যুদের সহায়তাও গ্রহণ করত। কিন্তু ভুঁইয়ারা দিল্লির বাদশার কাছে পরাজিত এবং নিহত হলে নিম্নবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মগ, ফিরিঙ্গি ও অন্য নানাবিধ উৎপাত মাত্রা ছাড়িয়ে গেল।

মগ, পর্তুগিজ এবং মুসলমান লুণ্ঠিত, ধর্ষিত, এমনকী, স্পৃষ্ট হিন্দু, ব্রাহ্মণ কর্তৃত্বে জাত খোয়াতে শুরু করে। পরিবার এবং বংশ ব্রাহ্মণ্যবিচারে জাতভ্রষ্ট, ধর্মান্তরিত, একঘরে, নিদেন দুষ্ট পরিবাদে প্রজন্মান্তরে অভিশাপ বয়ে নিয়ে বেড়াত।

বিষ্ণুপ্রিয়র এক প্রপিতামহীকে তেঁতুলিয়া নদী থেকে উঠে আসা এক কুমির জলের ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এ গল্প চারপুরুষ পরে বিষ্ণুপ্রিয়ও শুনেছিল। তার যৌবনারম্ভে আঁধারমানিক নদীতে এক সময় হঠাৎ খুব কুমিরের উপদ্রব শুরু হয়। অনেক লোকের গোরু, ছাগল, কুমির টেনে নিতে শুরু করল। প্রথম যে কুমিরটিকে মুসলমান কৃষকেরা মেরে ফেলে, তাকে প্রত্যেকেই বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্তরা একটা করে কোপ মেরে গায়ের জ্বালা মিটিয়ে নিল। বিষ্ণুপ্রিয়র মনের মধ্যে শতাধিক বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা হঠাৎ প্রাণ পেয়ে জেগে উঠল। নদীর মধ্যে শেষ বারের মতো দুই হাত তুলে অদৃশ্য হওয়া তার যুবতী প্রপিতামহীর আর্তনাদ করে ওঠা মুখ হঠাৎ যেন আঁধারমানিকের বুকেই দেখল সে। আচমকা দাঁড়িয়ে থাকা একজনের হাত থেকে বল্লম ছিনিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে মৃত কমিরের পিঠের উপর আঘাত করল বিষ্ণুপ্রিয়। তার নাকমুখ দিয়ে উষ্ণ নিশ্বাস শব্দ করে বার হচ্ছিল।

সে অবশ্যই অস্ত্রচালনা জানত না। ওই বিশালদেহী কুমিরের পিঠের চামড়া যে ধাতব বর্মের মতো শক্ত এবং নিরেট, এ জ্ঞানও তার ছিল না। ফলে বল্লমখানার ফলা দু-ভাগ হয়ে ভেঙে গেল। কিন্তু তবুও সে এক ধরনের তৃপ্তি পেল।

অবশ্য পরে নিজের আচরণে ভারী অবাক হয়েছিল সে।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয় জানত না বাঘ কিংবা কুমিরে টেনে নিয়ে গেলে তার যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা দরকার। কুমির যখন টেনে নিয়ে যায় তার প্রপিতামহী তখন দুই সন্তানের জননী এবং বাইশ বছরের যুবতী, কাজেই সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা দরকার। যদি না থাকে, সমাজ বংশকে 'বাঘাদোষ' কিংবা 'কুমিরদোষ' এমন একটি পরিবাদে দাগিয়ে রাখবে। এই পরিবাদ কালক্রমে বংশপরম্পরায় তেজস্ক্রিয় ঘৃণা বহন করবে।

না, এমন কোনো পরিবাদ বিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্যর বংশে আছে, এমন কথা কেউ শোনেনি। বিষ্ণুপ্রিয়ও শোনেনি।

কিন্তু শোনেনি বলেই যে নেই, দেখেনি বলেই যে অস্তিত্বহীন নব্যন্যায় পড়া বিষ্ণুপ্রিয় কি তা বলতে পারে?

ফলে ইদিলপুরের পণ্ডিতের বাড়িতে এই কুমির পরিবাদের গল্প যথাসময়ে পৌঁছাল। আগের বারে অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়র বড়মেয়ে শর্মিষ্ঠার বেলায় এই কুমিরদোষের গল্পই বলেছিল দয়ালহরি। সঙ্গে আরো বলেছিল, দেশে উপযুক্ত মেয়ের কিংবা সুন্দরী মেয়ের কি অভাব আছে? পণ্ডিত চাইলে ধাত্রীনগরের দয়ালহরি চক্রবর্তীর কন্যাটিকেই তো দেখতে পারেন। দেখলে অপছন্দ হওয়ার কিছু নেই। সুন্দরী। তা ছাড়া কুলীন সমাজপতি পণ্ডিত বংশের মেয়ে।

সে সম্বন্ধ অবশ্য অধিক দূর এগোয়নি। না এগোক, দয়ালহরি নিজের তৎপর কর্মকুশলতায় তৃপ্ত। মহারাজ কীর্তিনারায়ণের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তার। বিশ-পঁচিশ বছর আগে তাদের কৈশোরকালে রাজা কীর্তির বীরত্ব, মহত্ত্ব নিয়ে তাদের আকাশপ্রমাণ গর্ব ছিল। তাদের চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে পর্তুগিজ, হার্মাদ, মগ এবং পাঠান দস্যুদের সমস্ত অত্যাচার, লুণ্ঠন, রাজা কীর্তি প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিল। কীর্তিনারায়ণো বীরো মহামানি তদঙ্গজঃ। জগদেক শূরো সোহপি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ। মেঘ্নাদোপকূলে স ফেরঙ্গ-সৈন্যকৈঃসহ। অদ্ভুতং সমরংকৃত্যা তীরাৎ সর্বান তাড়য়ৎ। জাহাঙ্গিরপুরাধীশ নবাব যবনস্ততঃ। স্থাপয়মাস মিত্রত্বং সার্দ্ধং তেন প্রযত্নতঃ। বাল্যের মহাবীর সম্পর্কে প্রচলিত শ্লোকটি মনে মনে আবৃত্তি করল বিষ্ণুপ্রিয়। অবশ্য জাহাঙ্গিরনগরের নবারের সঙ্গৈর্ষ মিত্রতাই তার কাল হল। ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং এই অর্থহীন হিন্দু প্রবচনে নবাবের অর্থাৎ যবনের আহার্যের গন্ধ নাকে আসার অপরাধে রাজার জাতিনষ্ট হয়। বিষ্ণুপ্রিয় খুব বিষণ্ণ হয়ে ভাবল ধর্মান্তরিত সেই মহাবীর এখন কোথায়? চন্দ্রদ্বীপে কেউ আর তার কোনো খোঁজ রাখে না। বিষ্ণুপ্রিয় কি তার শত্রু?

না তো!

কিন্তু সমাজকে পবিত্র রাখতে হবে। ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজ রাজশক্তির থেকে অধিক শক্তিশালী। দিল্লির বাদশার ক্ষমতা নেই হিন্দুর, বিশেষ করে ব্রাহ্মণের সামাজিক কর্তৃত্বকে শাসন কিংবা অস্বীকার করে।

এহেন দয়ালহরিও বিষ্ণুপ্রিয়র আরেকটি বিবাহে আপত্তির কথা শুনে বিস্মিত হল। আরেকটি বিবাহে যে হিন্দু পুরুষের অন্যবিধ চিন্তা থাকতে

পারে এ যেন আজই প্রথম শুনল দয়ালহরি। সে কি ঠিক শুনেছে?

'তুমি বললে ছেলেটি আগে আর একটি বিবাহ করেছে, তাতে কি তোমার আপত্তি?'

'হ্যাঁ,' বিষ্ণুপ্রিয় বেশ জোর দিয়ে বলল।

দয়ালহরি স্বয়ং কুলীন হিসাবে আঠারোটি বিয়ে করেছে। যে কন্যাটির জন্য সে শর্মিষ্ঠার বিয়েতে ভাঙচি দেওয়ার চেষ্টা করে বিফল হয়েছিল তাকে সে শেষ পর্যন্ত অনুরূপ এক কুলীন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল গোপনে প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দিয়ে। মেয়েটি এক বছর পরে বাপের বাড়িতে থেকেই বিধবা হয়েছে। সে পাত্রের বয়স দয়ালহরির নিজের থেকে কম ছিল না কোনোমতেই। কিন্তু তাতেই বা কী? এবারে সফল হওয়ায় সাফল্যের স্বাদ সে আরেকবার উগরে জাবরকাটার অনুরূপ তৃপ্তি পেতে চাইল।

'কেন? অধিক বিবাহে আপত্তি কেন?'

বিষ্ণুপ্রিয় নিক্ষিপ্ত অদৃশ্য তীরের জ্বালা দয়ালহরি এতক্ষণে টের পেতে শুরু করেছে।

'আমি চাইনি আমার কন্যা সপত্নী-কণ্টকিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। আমি হারেম তৈরিরও পক্ষপাতী নই।'

'স-প-ত্নী-ক-ণ্ট-কি-ত! হারেম তৈরি!'

হা-হা-হা-হা করে অট্টহাস্য করে উঠল দয়ালহরি। নদী সংলগ্ন গাছগুলিতে বসে থাকা এক ঝাঁক টিয়ে আর্তনাদ করে একসঙ্গে শূন্যে উড়াল দিল সেই হাসির শব্দে। তার হাসির মাঝখানে নাটকের ভাঁড়ের মতো গোবর্ধন আচমকা অংশগ্রহণ করল। বহু বছরের পুরানো পচা পাঁকে নাড়া দিলে যেমন বলকে বলকে বুদবুদ উঠতেই থাকে, দয়ালহরি এবং গোবর্ধনের হাসি তেমনি, নিঃশেষ হতেই চাচ্ছিল না যেন।

বিষ্ণুপ্রিয় অবশেষে যেন বাধ্য হয়েই বলল, 'আমাকে তাহলে যাওয়ার অনুমতি করুন চক্কোত্তি মশাই, আজ একটু তাড়া আছে।'

দয়ালহরি বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ—যাও যাও। খুব আনন্দ দিয়ে গেলে সকালবেলা। হা-হা-হা-হা ভারী সুন্দর শব্দ চয়ন কর তুমি। অ্যাঁ—স-প-ত্নী-কণ্টকিত-বাঃ! কী সমাস হবে শব্দটি? অ্যাঁ!'

বিষ্ণুপ্রিয় ততক্ষণে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল, পিছন ফিরে বলল, 'আজ্ঞে তৃতীয়া তৎপুরুষ।'

আঘাত করতে শুরু করলে বা বিরোধ করতে শুরু করলে প্রত্যাঘাত

এবং প্রতি-প্রত্যাঘাত, ব্যাপারটা এভাবেই চলতে থাকে। প্রাথমিকভাবে তৃপ্তি পেলেও একটু দূরে যাওয়ার পর বিষ্ণুপ্রিয়র নিজের উপরে বিলক্ষণ রাগ হতে লাগল। কী তুচ্ছ কারণে এমন সুন্দর সকালবেলাটা সে কলহ করে নিজেকে অবনমিত করল। ছিঃ! সে একটু দ্রুত পায়েই ক্ষেমংকরের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয় চলে যেতে দয়াল ভীষণ মুখ করে গোবর্ধনের দিকে তাকিয়ে রইল। কী মনে করেছে নিজেকে বিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্য! হারেম তৈরি কথাটাই বা কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হল! বড় বাড় বেড়েছে বিষ্ণুপ্রিয়র। ইদানীং নানা ব্যাপারে ছোটখাটো বিধানও দিতে শুরু করেছে সে গ্রামের মধ্যে। এসব খবরও দয়ালের কাছে আসতে শুরু করেছে। তার বিলক্ষণ ভয়ংকর হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে গোবর্ধন ঘনঘন মাথা নাড়তে লাগল। বিষ্ণুপ্রিয় আর পিছন ফিরে তাকাল না।

৭

সকালে অতিথিশালায় বসে ক্ষেমংকর আজ প্রাতরাশ করেছে। সোহাগপাশা থেকে একজন অতিথি এসেছে তার সঙ্গে। লোকটি সাদা চামড়ার বিদেশি। তার নাম ইয়েকব বা ওই রকম কিছু। ক্ষেমংকর তাকে ওই নামেই সম্বোধন করছিল। লোকটি ক্ষেমংকরের সমবয়সিই হবে।

প্রাতরাশের ব্যবস্থা ওলন্দাজ ইয়েকবের কাছে অভিনব মনে হয়েছিল। একমুঠো খই হাতে তুলে নিয়ে ক্ষেমংকরকে জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কী?'

'খ-ই, খই।'

ক্ষেমংকর বাংলা শব্দের উচ্চারণ ইয়েকবের কাছে স্পষ্ট করার চেষ্টা করল।

খই, দুধ, চিনি— এইসব দিয়ে একেবারে সাত্ত্বিক প্রাতরাশ।

'না-না, ওভাবে নয়। এইভাবে।'

দুধে চিনি মিশিয়ে মুঠো করে খই তাতে ফেলেই চামচে উঠিয়ে নিল ক্ষেমংকর এবং খেল।

'খই পুরো কাদা হয়ে যাবার আগেই চামচে তুলে খেতে হবে।'

ইয়েকব নিমেষে ব্যাপারটা শিখে নিল।

'এইভাবে তো?'

'হ্যাঁ।'

তারা ফারসিতে কথা বলছিল।

'দুধ আর মিষ্টি কীভাবে খেতে হবে কোনো ওলন্দাজকে কোনোদিন শিখাতে যাবেন না হুজুর।'

'বটে! আর একটু শীত পড়া অবধি যদি থাকেন, চিনির বদলে নলেন গুড় খাওয়াব। সে জিনিসের স্বাদ কখনো পাননি। পুরানো ওলন্দাজ বণিকেরা বলত— বাংলায় ঢোকার রাস্তা একশোটা কিন্তু বেরোবার রাস্তা একটাও নেই! ঠিক বলত।'

ইয়েকব হা-হা করে হাসল।

বাড়ির ভিতর থেকে দাসী দুটো ছোট বাটিতে করে চিনি মিশিয়ে ছানা ভাজা নিয়ে এল।

ঝুরো ছানার বাটি হাতে তুলে ক্ষেমংকর বলল, 'এটা কী বস্তু বলুন তো?' তার চোখেমুখে কৌতুক।

নতুন দ্রব্যটি এক চামচ মুখে দিয়ে ইয়েকব আবার হা-হা করে হাসল। বলল, 'এবার আপনি খুব হেরে গেছেন। এই ছানা তৈরি করতে আপনাদের আমরা ওলন্দাজরাই শিখিয়েছি। হিন্দুস্থানে কোথাও ছানা তৈরি হয়, দেখেছেন? সর্বত্র দেখবেন দুধ জ্বাল দিয়ে প্যারা তৈরি করতে।'

ক্ষেমংকরের কথাটা বিশ্বাস হল না যেন। বলে কী লোকটা! ভদ্রতার খাতিরে বলল, 'তাই? আমি জানতাম না। আপনি তো এদেশের অনেক কিছুই জানেন দেখছি!'

ইয়েকব বলল, 'এদেশে এসেছিলাম জানতেই। প্রয়োজনে ব্যবসাবাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েছি। এদেশ সম্পর্কে সব থেকে বড় যে কথাটা জানতে পেরেছি তা হল— আপনারা এদেশের মানুষরা, আপনাদের বাপ-ঠাকুরদা যেটুকু

জানিয়ে গেছে তার বাইরে আর কিছু জানতে চান না।'

ইয়েকবের কথার মধ্যে কোথাও যেন একটু অবজ্ঞাজ্ঞাপক অপমানের ছোঁয়া আছে। এ দেশটার পরিচয় ক্ষেমংকরের কাছে খুব সংক্ষিপ্ত নয়। সে হিন্দুস্থানের অনেক শহর, নগর, গ্রাম-গঞ্জ ঘুরেছে। অনেক দেশি-বিদেশি মানুষের সঙ্গেও মিশেছে। তবুও অস্বীকার করতে পারল না ইয়েকবের যুক্তি।

কিন্তু অপমানটা এড়াতে না পেরে আগের প্রসঙ্গ তুলে বলল, 'সে আর বোধ হয় বেশি দিন থাকবে না। সমুদ্রের পর্তুগিজ, হার্মাদ আর আরাকানের মগেরা মিলে নিম্নবঙ্গের বহু জায়গা ইতিমধ্যেই ছারখার করে দিয়েছে।'

ইয়েকবের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। সে বলল, 'মানে আপনি জলদস্যুদের কথা বলছেন? বাংলায় এর আগে আর একবারই এসেছিলাম। মাসখানেক সেবার ছিলাম হুগলি আর চুঁচুড়াতে। হার্মাদের কথা তখনি শুনেছি। হুগলিতে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখেওছি। পর্তুগিজরা গর্ব করেই বলে যে বিগত দশ বছরে সারা হিন্দুস্থানে যত হিন্দুকে ধর্মযাজকরা খ্রিস্টান করেছে, বোম্বেটে আর হার্মাদরা এক বছরেই তার দশগুণ বেশি করেছে।'

ক্ষেমংকর বলল, 'হয়তো তার বেশিই। বিগত বছরগুলোতে নিম্নবঙ্গের হাজার হাজার মানুষকে তারা ধরে নিয়ে গেছে। তারা তো খ্রিস্টানই হয়েছে!'

খুব নিরানন্দভাবে কয়েক চামচ মিষ্টি ছানাভাজা খুব দ্রুত মুখে তুলে দিল ক্ষেমংকর। চেষ্টা করেও মুখ স্বাভাবিক রাখতে পারল না সে।

ইয়েকব ক্ষেমংকরের কণ্ঠের বিষণ্ণতায় সাড়া দিয়ে বলল, 'খ্রিস্টান হলে তো ভালোই ছিল। শুনেছি পর্তুগিজ আর আরাকানিরা বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের একটা অংশকে খুনে বোম্বেটে তৈরি করেছে। পর্তুগিজরা যে কীভাবে এখনো নিজেদের খ্রিস্টান বলে, ভাবলে অবাক লাগে। সত্যিই ভারী ঘৃণ্য তাদের জীবনযাপন।'

ক্ষেমংকরের মুখের ভিতরের মিষ্টি সন্দেশ নিমেষে তিক্ততায় পর্যবসিত হল। অনেক চেষ্টা করেও কথাটা নিজের ভিতরে চাপা দিয়ে রাখতে পারল না সে। বলল, 'মহাশয়ের অভিজ্ঞতায় কি ইউরোপীয় অন্যান্য জাতির মধ্যে এই ধরনের ঘৃণ্য কাজকর্মের নাজির নেই?'

ফারসি ভাষার শিষ্টাচার ভুবনবিখ্যাত। তবু ক্ষেমংকরের সাধারণ প্রশ্নের ভিতরে লুকোনো বিশিষ্ট ইঙ্গিত ইয়েকবের শিক্ষিত কানে ধরা পড়ল।

অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি বলতে এই মুহূর্তে হিন্দুস্থানে উপস্থিত ওলন্দাজ এবং ইংরেজরাই প্রধান। আর যারা আছে তারা ব্যক্তি হিসাবেই পরিচিত, খুব বেশি হলে গোষ্ঠী। জাতি হিসাবে কখনোই নয়। ইয়েকবের অস্বস্তি হতে লাগল। সে তো অনেক কিছুই জানে।

কিন্তু সে ভণ্ড নয়। মেঘনার চড়ায় আটকে পড়া জাহাজ থেকে অসুস্থ অবস্থায় সোহাগপাশায় নিয়ে আসা হয় তাকে। জাহাজের চিকিৎসক তার রোগের নিরাময় করতে পারছিল না। সুন্দরবন অথবা ভাটির কোনো দুষ্ট জীবাণু তার শরীরে এমন এক জ্বরজ্বালার সৃষ্টি করেছিল যা বিদেশি চিকিৎসকের পরিচিতির মধ্যে ছিল না সম্ভবত। ইয়েকবের অবশ্য ধারণা হয় লোকটা হাতুড়ে। প্রতিদিন যেমন এ অঞ্চলে দুবার করে জোয়ারভাটা হয়, তারও তেমনি দুবার করে জ্বর ছেড়ে গিয়ে আবার নতুন করে জ্বর হচ্ছিল।

ক্ষেমংকরের চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে সে। ক্ষেমংকরের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয় ইয়েকব।

সে বলল, 'আপনার কাছে মার্জনা চাইছি মাননীয় চিকিৎসক। একথা ঠিক যে ইউরোপীয় সব প্রধান জাতিই হিন্দুস্থানের উপকূলবর্তী অঞ্চলে নানাধরনের দৌরাত্ম্য করে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রদস্যুতা তার মধ্যে অন্যতম এবং আপনার ইঙ্গিত শিরোধার্য করে বলছি যে এ বিষয়ে ওলন্দাজ নাবিকদের অবস্থান পর্তুগিজদের পরেই।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে জানাতে চাই যে এই আগে ও পরের মধ্যে সমুদ্রপ্রমাণ না হলেও উপসাগর প্রমাণ ব্যবধান। আশা করি, আপনি আমাকে অনুমোদন করবেন। ইউরোপের জাতিগুলো কিন্তু এদেশে বাণিজ্য করতেই এসেছিল।'

ক্ষেমংকর ইয়েকবের বিবেচনায় অভিভূত হল, যেন লজ্জাও পেল একটু। বলল, 'যদি বন্ধু সম্বোধন করার অনুমতি দেন তো বলি, বন্ধু, পর্তুগিজদের নৃশংসতার কোনো তুলনা হয় না। হিন্দু, মুসলমান কিংবা খ্রিস্টান বলে নয়, মুসলমানদের বুলি ধার করে বলতে ইচ্ছা হয় এরা শয়তানের পয়দা। এরা যে শুধু হিন্দুস্থানের মানুষের উপরই অত্যাচার করছে তা নয়, উপকূলবর্তী অঞ্চলে থাকি বলে জানি যে এরা নিজেরাও পরস্পরের সঙ্গে অনুরূপ আচরণই করে। সামান্য প্ররোচনায় একে অন্যকে খুন করে, বিষ খাইয়ে মারে, ধর্ষণ করে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দেয়। আর যৌনতার ব্যাপারে এরা আদিম মানুষের নির্লজ্জ নির্বোধ যুগে ফিরে গেছে।'

ইয়েকব উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আপনার আনুষ্ঠানিক বন্ধুত্বের প্রস্তাবের আগেই আপনার উষ্ণ হৃদয়ের আমন্ত্রণ আমি অনুভব করেছি। আপনার প্রস্তাবে ভীষণ সম্মানীয় বোধ করছি। একই সঙ্গে আরো একবার আপনাকে অনুরোধ করব, আপনি অনুগ্রহ করে পর্তুগিজদের সঙ্গে ওলন্দাজদের তুলনা করবেন না বা পর্তুগিজদের দেখে খ্রিস্টানধর্ম সম্বন্ধেও কোনো ঘৃণ্য ধারণা পোষণ করবেন না। খ্রিস্টানধর্ম অতি মহান ধর্ম। প্রেম এবং মানবতার আদর্শে খ্রিস্টানধর্ম পৃথিবীর— না না, আমি কোনো তুলনা করতে চাই না। কিন্তু সত্যিই—'

ইয়েকব অত্যন্ত প্রগলভ হয়ে পড়লে ক্ষেমংকর তার বাড়ানো হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, 'আমি যে এসব একেবারে জানি না তা নয় মহাশয় ইয়েকব। আপনাকে আগে বলিনি আমি বারাণসীতে আমার আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিষয়ক পাঠ এবং ব্যবহারিক শিক্ষা শেষ করে দুবছর মহাশয় বরণীয়ের সঙ্গে থেকে ইউরোপীয় চিকিৎসাও কিছুটা শিখেছি। এই মহান ব্যক্তিটির কাছ থেকে শুধু যে চিকিৎসাবিদ্যাই আমি শিখেছি, এমন মনে করবেন না। ইউরোপীয় আচার-আচরণ, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়েও আমি সেই মহান মানুষটির কাছ থেকে সামান্য কিছু শিক্ষা পেয়েছি।'

ইয়েকব অভিভূত হয়ে বলল, 'আপনি সেই মহান পর্যটক বিশিষ্ট পণ্ডিত মসিয়েঁ বের্নিয়ের সহকারী হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন? কী বিস্ময়! আপনি ধন্য! আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে আমাদের দু-জনের মধ্যে একটি অদ্ভুত মিল যেন দেখতে পাচ্ছি। আমি মসিয়েঁ বের্নিয়ে এদেশে থেকে চলে যাওয়ার মাত্র মাস কয়েক আগে এদেশে আসি। তার আগে আমি পারীতে ছিলাম। পারীতে থাকাকালীন মহাশয় বের্নিয়ের কথা প্রথম আমি শুনি। প্রাচ্য বিষয়ে লিখিত তাঁর চিঠি পারীর বিদ্বৎসমাজে সে সময়েই আলোড়ন তুলেছিল। এমন নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ তাঁর মতো স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব।'

ক্ষেমংকর প্রীত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বলল, 'গুরুনিন্দা শোনা যেমন পাপ, গুরুপ্রশংসা শোনা তেমনি পুণ্য। তিনি সত্যিই যথার্থ দ্রষ্টা ছিলেন।'

'কিন্তু হায় আপনার মতো আমার সৌভাগ্য হয়নি, তাঁর সঙ্গলাভের', ইয়েকব সখেদে বলল। তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ফরাসি বা অন্য কোনো ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করেছেন?'

ক্ষেমংকর বলল, 'না। ফরাসি ভাষা আমি মোটামুটি বুঝতে পারি কিন্তু

বলতে পারি না। কোনো ভাষা শিখতে হলে ওই ভাষাভাষী লোকের সঙ্গে কথোপকথন প্রয়োজন। তিনি স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পরে ফরাসি ভাষায় চর্চা করার সুযোগ আর আমার হয়ে ওঠেনি।'

ফ্রাঁসোয়া বের্নিয়ে এদেশে আসার সময়কালে দিল্লির সিংহাসন নিয়ে চার রাজপুত্র যথাক্রমে দারা, সুজা, মুরাদ এবং আওরঙ্গজেবের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ শেষ পর্যায়ে। শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারার উপর বের্নিয়ের দুর্বলতা জন্মেছিল। যদিও আওরঙ্গজেবের উচ্চতর প্রতিভা সম্পর্কে তার কোনো সংশয় ছিল না, কিন্তু অন্তিম সময়ে দিল্লির রাজপথে উপস্থিত থেকে দারার লাঞ্ছনা, অপমান এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা তাকে পীড়িত করেছিল। অতি অল্প সময়ের ক্রমাগত যুদ্ধে দারার নৃশংস হত্যা, প্রাণভয়ে আরাকানে পলাতক সুজার সপরিবারে হত্যা ও তার স্ত্রী কন্যাদের করুণ পরিণতি, বন্দি থাকাকালে মুরাদের শোচনীয় মৃত্যু সাম্রাজ্যের ভিত দুর্বল করে দিয়েছিল।

দিল্লিতে বসে এসব দেখে এবং বুঝে বের্নিয়ে কেমন যেন একটু অস্থিরই হয়ে গেলেন। হিন্দুস্থানকে আরো গভীরভাবে দেখবার এবং বুঝবার আগ্রহে বোধহয় তার খানিকটা ভাটা পড়েছিল। দিল্লি থেকে বের্নিয়ে তারপরে হিন্দু তীর্থ বারাণসীতে গেলেন। নিজে চিকিৎসক ছিলেন বলে প্রাচ্য চিকিৎসা পদ্ধতি জানার এবং শিক্ষা করার আগ্রহ তাঁর ছিল।

ক্ষেমংকরের গুরু ভিষগাচার্য ত্রিভুবন গুপ্ত সে সময় বারাণসীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। বের্নিয়ে সেখানে মাসখানেক অবস্থান করেন। ক্ষেমংকরের শিক্ষা পর্যায় তখন শেষ। সে অপেক্ষা করছিল উপযুক্ত সঙ্গীসাথীর, যাতে সে নির্বিঘ্নে স্বদেশে ফিরতে পারে। প্রমথনাথ সামান্য বেশি সত্তর বছর বয়সে মারা গিয়েছিল। সারাজীবন সে যে খুব একটা ধর্মাধর্ম কিংবা পাপপুণ্য নিয়ে ভাবিত ছিল এমন নয়, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তার নানা ধরনের মানসিক বিকার এসে উপস্থিত হল। শরীরের অভ্যন্তরের কোনো কোনো যন্ত্র তার কাজ করছিল না। আয়ুর্বেদে সে সবের যে চিকিৎসাবিধি আছে, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করেই ক্ষেমংকর সে সব চিকিৎসা করেছিল। কিন্তু চিকিৎসা যখন আশানুরূপ ফল দিল না, প্রমথনাথ তার চিত্তের স্থিরতা হারাল। নানা আক্ষেপ তাকে পর্যুদস্ত করে ফেলল এবং প্রবল হতাশা, মৃত্যুভয় এবং অজানা পরপারের অপেক্ষমাণ ভবিষ্যৎকে বিভীষিকার মতো চোখের সামনে হাজির করল। একদিন অসম্ভব কাতর প্রমথ বলল, 'আমার মৃত্যুর পরে অবশ্যই

গয়া যাবি। তোর মায়ের নামে এবং আমার নামে পিণ্ড দিবি। কথা দে আমাকে,' চোখের সামনে অলীক বিভীষিকা দেখছিল সে।

তারপর থেকে যে কদিন বেঁচে ছিল প্রমথ প্রায় প্রতিদিনই ক্ষেমংকরের কাছ থেকে অঙ্গীকার আদায় করে নিত।

ফলে প্রমথর মৃত্যুর দু-মাস পরে ক্ষেমংকর ফৌজদারের অনুমতি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। গয়ায় পিণ্ড দেওয়ার পরে কাশীতে এসে আয়ুর্বেদাচার্যের কাছে মাস দুয়েক নতুন করে পাঠ ও শিক্ষা নিল সে। সেই সময়ে বের্নিয়ে উপস্থিত ছিল সেখানে।

বের্নিয়েকে তার মনে হয়েছিল ঈশ্বরপ্রেরিত। আচার্যর কাছে তার মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করতে ত্রিভুবন গুপ্ত তাকে বের্নিয়ের সঙ্গী হতে উৎসাহ দিলেন। প্রথমত, বের্নিয়ে বাংলাদেশ অভিমুখে যাবেন; দ্বিতীয়ত, তিনি একজন বিদেশি চিকিৎসক। আচার্য তাকে এই সুযোগ পুরো সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দিলেন।

ফৌজদার বিরক্ত হবে জেনেও ক্ষেমংকর ছ-সাত মাস বের্নিয়ের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পর্যটন করল। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তার খ্যাতি ছিল। তার দ্বিতীয় গুরুর প্রীতি উৎপাদন করে ক্ষেমংকর ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতি শিখল। অবশেষে অপর একজন সমসাময়িক পরিব্রাজক তাভার্নিয়ে এবং বের্নিয়ের সঙ্গে ক্ষেমংকর স্বদেশের দিকে যাত্রা করল। তাভার্নিয়ে ও বের্নিয়ে রাজমহল পর্যন্ত একত্রেই এলেন। রাজমহল থেকে তাভার্নিয়ে জাহাঙ্গিরনগর অভিমুখে চলে গেল। জাহাঙ্গিরনগরে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি শায়েস্তা খানের সদর দপ্তর। চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, বাকলা, ভুলুয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে পর্তুগিজ ও মগ হার্মাদদের বিতাড়িত করে এই স্বর্ণপ্রসূ প্রদেশটিকে পুনরায় সমৃদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত শায়েস্তা খানের হিরে-জহরত কেনা ও উপভোগ করার সময়ও ছিল। জহরত ব্যবসায়ী তাভার্নিয়ে এসব কারণেই তার পেটিকা নিয়ে প্রদেশের রাজধানীর দিকে চলে গেল।

পদ্মার ভাটিতে তাভার্নিয়েকে বিদায় জানিয়ে বের্নিয়ের নাওয়ের বহর দক্ষিণে ভাগীরথীতে ঢুকে কাশিমবাজারে এল। কিছুদিন বাংলায় থেকে অবশেষে জলপথে বের্নিয়ে গোলকুণ্ডার বন্দর মসুলিপত্তনের উদ্দেশে যাত্রা করল। ক্ষেমংকর দ্বিতীয় গুরু মহাশয় বরণীয়কে প্রণাম করে স্বগৃহের দিকে যাত্রা করল। মহাশয় বরণীয় নামটি তার প্রথম গুরু ত্রিভুবন গুপ্তের

উচ্চারণ। মসিয়েঁ বের্নিয়ে নামটির প্রকৃত ফরাসি উচ্চারণ তার জিহ্বায় স্বাভাবিক হলেও প্রথম গুরু প্রদত্ত নামটিতে ক্ষেমংকর অধিক কৃতজ্ঞতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে শুরু করেছিল।

বের্নিয়ে এবং তাভার্নিয়ে বৃত্তান্ত শুনে ইয়াকব খুবই উত্তেজিত হল। বলল, 'পর্যটকরা পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যান। এইভাবে সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন তাঁরা। আপনার সৌভাগ্য হয়েছে দুজন প্রতিভাশালী পর্যটকের সংসর্গ করার, আপনি ধন্য।'

ক্ষেমংকর সবিনয়ে বলল, 'দুজন নয়, তিনজন।'

'এই তৃতীয়জন কে?' ইয়েকব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'কেন, আপনি!' ক্ষেমংকর কোনো রকম ভণিতা না করেই বলল।

ইয়েকব এবার ইউরোপীয় ভঙ্গিতে উচ্চহাস্য করে উঠল। বলল, 'আমাকে এই আলোচনার মাঝখানে স্থাপন করে আপনি নিশ্চয়ই সেই মহান ভূপর্যটকদ্বয়কে অবমাননা করছেন না? তাঁদের কাছে আমি নিতান্তই শিশু।'

ক্ষেমংকর বলল, 'তবুও আপনার কাছেও আমার অনেক শিক্ষণীয় বস্তু আছে। যদি আমাদের এই জলজঙ্গল নদীসমুদ্রমেখলা দেশে আরো কিছুদিন আমার সঙ্গী থাকার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, তবে কৃতার্থ হই।'

ইয়েকব হেসে বলল, 'জলজঙ্গলসমুদ্র! আমাদের ছোট দেশটি যদি আপনাকে দেখাতে পারতাম। তিনদিক দিয়ে সমুদ্রঘেরা আমাদের দেশটির অনেক শহর এবং গ্রামকেও প্রাচীর দিয়ে বেষ্টন করে সমুদ্রের জলকে আটকে রাখতে হয়!'

৮

ইগনেশিয়াস ডি সিলভা কোনো কালেই লিসবন শহর চোখে দেখেনি। সেই শহরের কাছাকাছি সেন্ট অ্যান্টনি ডেল টোরজাল নামক গ্রামখানা যে তার পিতৃপুরুষের আদি বাসস্থান এ রকম একটা কথা সে অতি শৈশবে তার মায়ের কাছে শুনেছিল। তার বাবা অ্যাবরেনানশিয়াস ডি সিলভা একজন গ্রাম্য যাজকের ছেলে। প্রথম জীবনে তার উচ্চাশা তার বাবার পদমর্যাদা এবং আর্থিক সঙ্গতির থেকে সামান্য বেশিতে তৃপ্ত হবে, এমন ভেবেছিল সে। কিন্তু পর্তুগালে তাও তেমন সহজলভ্য ছিল না।

কিন্তু ষোলো-সতেরো শতকের পর্তুগালে এমন সাধারণ আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে নিশ্চিন্তে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। রাজা স্বপ্ন দেখেছিল জেরুজালেমের সম্রাট হবে। ভাস্কো-ডা-গামা সেই সম্রাজ্যের সম্ভাব্যতা খুঁজতে বেরিয়েছিল, না, মশলার খোঁজে, কে জানে? শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর তাবৎ সমুদ্রপথে পর্তুগাল কোনো একসময় সেরা সমুদ্রশক্তি। বারো-চোদ্দ লক্ষ মানুষের দেশ পর্তুগাল সারা পৃথিবীর সমুদ্রপথ শাসন করার স্পর্ধা করছে। দুঃসাহসী অভিযাত্রী এবং বীরদের দেশ পর্তুগাল।

অ্যাবরেনানশিয়াস গরিব গ্রাম্য পুরোহিতের ছেলে হলে কী হবে, সময়টা তো সতেরো শতকের উষাকাল, দেশটা পর্তুগাল! ভাগ্যান্বেষণে গ্রাম সেন্ট অ্যান্টনি ডেল টোরজাল ছেড়ে একদিন সে, বেশি দূর নয়, রাজধানী লিসবনে এল। কেউ তাকে বলেছিল, কাজ খুঁজতে হলে জাহাজঘাটায় যাও।

পর্তুগাল প্রায় সারা পৃথিবীর সমুদ্র শাসন করে। তাদের হাজার হাজার জাহাজ দাপিয়ে বেড়ায় সাতসমুদ্র, তেরো নদী। মশলা, খাদ্য, বস্ত্র থেকে মণিমাণিক্য এবং দাস-দাসী অঢেল আসে লিসবনে। রাজা ধনী হয়, ধনী হয়

গির্জার যাজক সম্প্রদায়। দেশজুড়ে বিশাল বিশাল প্রাসাদ তৈরি হয় ধনাঢ্যদের জন্য। তৈরি হয় আকাশছোঁয়া গির্জা একের পর এক। কিন্তু অ্যাবরেনানশিয়াস ডি সিলভা বা তার বন্ধু ফারনান্দেজ এবং তাদের মতো আরো অসংখ্য পর্তুগালবাসী প্লেগের মহামারির ভয়ে, না খেতে পেয়ে মরার ভয়ে, রাজা কিংবা গির্জার যাজকদের অট্টালিকায় কিংবা খামারে বেগার খাটার ভয়ে কাজ খুঁজতে লিসবন শহরে কিংবা পোর্টো বা সেতুবালের জাহাজঘাটায় ঘুরতে শুরু করল। সেখানেই ছোটবেলার বন্ধু ফারনান্দেজের সঙ্গে দেখা হল। সেও কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফারনান্দেজ তাকে অনেক খবর দিল। তার মধ্যে একটা হল, ভারতবর্ষে সন্দ্বীপ নামে একটা দ্বীপ আছে। সেন্ট অ্যান্টনি গ্রামের সিবাস্টিয়ান গনজালেস সেখানকার রাজা হয়ে বসেছে। প্রাচুর্যের সেই দেশে গেলে ধনী তুমি হবেই, কপাল ভালো থাকলে রাজা-মহারাজাও হওয়া সম্ভব।

'সিবাস্টিয়ান গনজালেস? চিনি তো সে লোকটাকে। মানে এক সময় তো চিনতাম। আমাদের থেকে দশ-বারো বছরের বড় হবে না?' অ্যাবরেনানশিয়াস বলল।

কিন্তু সমস্যা হল যাজকের ছেলে যুদ্ধটুদ্ধ তো শেখেনি। অস্ত্রশস্ত্র চালাতেও জানে না। ভারতবর্ষে গিয়ে কী করবে সে?

ফারনান্দেজ, বলল, 'আরে সে দেশে কোটি কোটি মানুষ, বিশাল তার বিস্তৃতি, গোটা দুই-তিন সমুদ্র, শয়ে শয়ে বন্দর। পর্তুগিজরাই সে দেশটা আবিষ্কার করেছে। সেখানে কি কাজের অভাব? অভাব কাজের মানুষের। যাজকের ছেলে তুই যাজক হবি। পুরোহিতের খুব দরকার সে দেশে। হাজারে হাজারে খ্রিস্টান স্ত্রী-পুরুষ একত্রে থাকে, ছেলেমেয়ের জন্ম দেয় কিন্তু খ্রিস্টীয় মতে তাদের বিয়েশাদি হয় না। কে দেবে বিয়ে? পুরোহিত নেই তো। মরলে পরে শেষ সংস্কার করার মতো উপযুক্ত মানুষ পাওয়া দুষ্কর। বস্তুত, ভারতবর্ষের ওইসব অঞ্চলের খ্রিস্টানদের সভ্যজগতের অনেক মানুষই খ্রিস্টান বলতে রাজি নয়। জন্মমৃত্যু বিবাহাদির সংস্কারবিহীন মানুষ খ্রিস্টীয় জগতে শয়তানের সহজ আশ্রয়।'

খোঁজ পাওয়া গেল তিন-চার মাস পরে ন-খানা গ্যালিয়নের এক বহর যাবে ভারত সমুদ্রের দিকে। ফারনান্দেজ যাবে তাদের সঙ্গে জাহাজের খালাসি হয়ে। আপাতত খালাসি হয়েই যাওয়া যাক। পরে যদি ক্ষমতা

দেখাবার সুযোগ পায়, তখন বড় হওয়া আটকায় কে?

অ্যাবরেনানশিয়াস বাবার কাছে গ্রামে ফিরে গেল। বাবার বিনীত প্রার্থনা নিয়ে ফের ফিরে এল লিসবনে। রাজধানীর গির্জায় সংক্ষিপ্ত একপ্রস্থ ধর্মীয় আচার-আচরণ, সংস্কার, প্রবচন, বিধি-বিধান শিখে নিল। শিখল শয়তান তাড়াবার, অপদেবতা দূর করবার পদ্ধতি ও মন্ত্র। তারপরে একদিন দুপুরের পরে বাপ-মাকে কাঁদিয়ে হিন্দুস্থানের গোয়ার পথে ভেসে পড়ল।

জাহাজের তিন-চার মাসে অ্যাবরেনানশিয়াস আরো অনেক কিছু শিখল। কিছু আশ্চর্য খ্রিস্টানবিরোধী ধারণারও পরিবর্তন হল তার। দাস ব্যবসা, তা যতই নৃশংস হোক না, দাসেদের কাছে তা ঈশ্বরের আশীর্বাদই। মানুষ যতদিন খ্রিস্টান না হবে, ততদিনই তার জন্য মৃত্যুর পরে অপেক্ষা করে থাকবে নরকের অনন্তকালের আগুন। কাজেই অন্ধকার মহাদেশ হোক, নতুন পৃথিবীই হোক, পর্তুগিজ বণিকরা যাদের চুরি করে, জোরজুলুম করে, যুদ্ধ করে, হত্যা কিংবা অগ্নিসংযোগ সহযোগে, ক্রয় করে কিংবা প্রলোভন দেখিয়ে দাসে পরিণত করছে এবং ভারত সাগরের উপকূল ধরে মসুলিপত্তন, নাগাপত্তন, পুলিকট, কলম্বো, কোচি, গোয়া, তারপরে আফ্রিকার মোগাডিসু, মালিন্দী, মোজাম্বিক, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা ইউরোপের দাসবাজারে যাদের বিক্রি করেছে, তাদের আখেরে উপকারই করা হচ্ছে। কেননা বিক্রির আগে তো তাদের পবিত্র খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হচ্ছে। এইভাবে অনন্ত নরকের আগুন থেকে রেহাই এবং অনন্ত স্বর্গবাসের দিকে যাত্রার সুযোগ তো এই দাস ব্যবসায়ীরাই করে দিচ্ছে।

জাহাজের একজন সহযাত্রী, সাসো মিরান্দা, যার যাজক হওয়ার অভিলাষের পাশাপাশি জলদস্যু এবং একাধারে বণিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও প্রবল ছিল, এসব কথা তাকে বলেছিল।

অ্যাবরেনানশিয়াসের বিস্ময় লেগেছিল এইসব কথা শুনে। একজন মানুষ একই সঙ্গে জলদস্যু এবং যাজক হওয়ার ইচ্ছা কী করে পোষণ করে! তার অবশ্য ডন কিহোতে দা লা মানচা পড়া ছিল, সে বইখানা তার কৈশোরেই পর্তুগিজ ভাষাতে অনুবাদ হয়েছিল। অ্যাবরেনানশিয়াসের পড়া ছিল আজুরারার বইখানাও। আজুরারার সেই লেখাতে লাগোস বন্দরে দাস জাহাজ এসে লাগার এক দিনের বর্ণনা আছে। কী শোচনীয় এবং মর্মান্তিক

সেই বর্ণনা। দাসদের জাহাজঘাটায় নামিয়ে প্রবল আর্তনাদ এবং কোলাহলের মধ্যে স্বামীদের কাছে থেকে স্ত্রীদের, মায়েদের কাছ থেকে সন্তানদের, বাপের কাছ থেকে তাদের শিশুপুত্রদের পৃথক করা হচ্ছিল। শৃঙ্খলা যাতে বিপর্যস্ত না হয় তার জন্য নির্মমভাবে মারা হচ্ছিল চাবুক। বাপকে যদি পাঠানো হয় লিসবনে, তা হলে মা যাবে লাগোসে, আর তাদের সন্তানেরা যে কে কোথায় যাবে তার আর কোনো ঠিকানা থাকবে না।

সদ্য বাপ-মা ভাই-বোনকে ছেড়ে আসা অ্যাবরেনানশিয়াস এসব কথা ভাবতে ভাবতে, এসব দেখতে দেখতে তার জ্ঞান বৃদ্ধি করছিল। মিরান্দার কথায় তার সংশয় যখন ক্রমশ বাড়ছিল সে সময় জাহাজ নোঙর করল মোজাম্বিকে। আজুরারা যেমন বর্ণনা দিয়েছেন ঠিক সেই দৃশ্য দেখল সে। দাস ব্যবসায়ী এবং তাদের যমদূত সদৃশ কর্মচারীদের কিছুতেই তার ঈশ্বরের রাজ্যের মানুষ বলে মনে হল না। এক সময়ে বিষণ্ণ হয়ে সে ভাবল এ যদি নরকের আগুন না হয়, তা হলে নরকের আগুন আর কী হতে পারে! অবশেষে সে বুঝতে পারল সসো মিরান্দার প্রবল যৌন অভিলাষ তার অন্য সমস্ত চিন্তাকে দাবিয়ে রাখে। তার ধারণা হয়েছিল গির্জার জীবন এবং জলদস্যুতা, এই আপাত বিসদৃশ পেশায় কোথাও একটা মিল খুঁজে পেয়েছিল মিরান্দা এবং খুব সম্ভবত সেটা তার পছন্দমতো অবাধ যৌন ভোগ বন্দোবস্ত এবং অপরিসীম স্বৈরাচার। অ্যাবরেনানশিয়াস একজন নিরীহ পুরোহিতের সন্তান হিসাবে জানত যে গির্জার ভিতরে কর্তৃপক্ষ চাইলে সমস্ত কিছুই সম্ভব এবং পৃথিবী কিংবা স্বর্গের কোনো আইনই তাকে আটকাতে পারবে না।

৯

আউলাকেশি ডি সিলভা এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও অপরিসীম প্রাণশক্তিতে ভরপুর। সে তার মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হই-হট্টগোলে মাতে, পোশাকের এবং সাজগোজের প্রতিযোগিতা করে। বস্তুত, এখন পর্যন্ত তার মেয়েরা তাকে কোনো ব্যাপারেই পরাজিত করতে পারেনি। জীবন যেহেতু তাঁকে কোনো গোঁড়ামির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ দেয়নি, সেও জীবনকে সব রকমে মেনে নিয়ে তার ভিতর থেকেই প্রাণরস বের করে নিয়েছে।

সোহাগপাশার খলিফা নাসির মহম্মদের বিবি আখতারজান সকাল সকালই আউলাকেশির বাড়িতে এসেছে। জায়গিরদার ইউসুফ জাহাঙ্গিরের বাহিনীর মধ্যে অনেক জাতের লোক আছে। তাদের মধ্যের তিনজন কাশ্মীরি সৈনিকের বিবিরা যেমন পিরহান পরে, সেই ঢঙ আউলাকেশির নজরে পড়ে গেছে। আখতারজান আগে দু-একবার এসে মাপ নিয়ে আউলাকেশির কামিজ সালোয়ার ইত্যাদি তৈরি করিয়ে দিয়ে গেছে।

আউলাকেশি মোগল অন্তঃপুরে যখন যায় তখন মুসলমানি পোশাক পরেই যায়। আবার খ্রিস্টানদের কোনো উৎসব, বিশেষ করে বড়দিনের উৎসবে আউলাকেশি খ্রিস্টান মেয়েদের মতোই লম্বা ঝুলের প্রচুর ঝালর, কুঁচি এবং চুনটের কাজ করা জামা পরে। ঘরে সে পরে বাঙালি শাড়ি এবং ঊর্ধ্বাঙ্গে হিন্দুস্তানি জামা।

আখতারজান গুছিয়ে বসে বলল, 'খালিফা বলল চার-পাঁচ বেটাবেটির মায়ের কোমর বুক পাছার মাপ এমন হতেই পারে না। তুই নিশ্চয়ই উলটাপালটা মাপ নিয়েছিস, নয়তো কারো সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিস। তাই

ফের আজ মাপতে এলাম।'

আউলাকেশি হেসে বলল, 'খলিফা দুনিয়ার মেয়েমানুষকে আজকাল তোর মাপেই দেখছে নাকি, আখতার? নাকি মিঁয়া নিজেই বাড়িবাড়ি গিয়ে মাপতে চাচ্ছে?'

আখতারজান রসিকা। বলল, 'আরে সেই করেই তো আমার কপালটা পুড়ল। বয়সকালে মিঁয়ার চেহারার যা জৌলুস ছিল তাতে অনেক মেয়েমানুষই মূর্ছা যেত। আমার কপালও তো পুড়ল সেই ভাবেই।'

'ওমা, তাই নাকি? মাইরি! তোকে বিয়ের আগে থেকেই মাপত বুঝি?' আউলাকেশি এগিয়ে বসে আখতারজানের প্রেমকাহিনি, যা কিনা শুরু হয়েছিল জানের বুক আর পাছার মাপ নেয়া থেকে, শুনতে শুরু করল। অসীম উৎসাহ তার মানুষের ভাব ভালোবাসার কথা শোনার। কথায় কথায় মেরির নামে শপথ কাটে, মাইরি!

বাইরে বের হবার পোশাকে ঘর থেকে ইগনেশিয়াস বেরিয়ে এসে বলল, 'কথায় কথায় কুমারী মেরির নামে শপথ বলা তুমি কিছুতেই বন্ধ করতে পারলে না।' সে বুকে ক্রুশ আঁকল। তারপর বলল, 'তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। গতকাল ঝাউতলা ঘাটে বেবাইজ্যাদের নাওয়ের বহর এসে লেগেছে। ইসমাইল সর্দার এখনো আছে। আসতে বলব তাকে?'

মুহূর্তে আউলাকেশির চেহারা অন্য রকমের হয়ে গেল। দৃষ্টি অন্যমনা এবং সুদূর হল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মাইরি?'

ইগনেশিয়াস হেসে বুকে হাত দিয়ে ফের ক্রুশ আঁকল।

আউলাকেশি বলল, 'না, আমিই যাব। ওঃ কতদিন পরে!'

ইগনেশিয়াস বেরিয়ে গেলে আউলাকেশি আখতারজানকেও বিদায় দিল। বেবাইজ্যা বেদেদের সঙ্গে ছ-সাত বছর ছিল তারা। সেই বিচিত্র জীবনের কথা ভুলবার নয়।

পৃথিবীর দুস্থতম বেদেদের বেবাইজ্যা বলে। তারা তাদের বিচিত্র আকৃতির নৌকার বহর নিয়ে বাংলার গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা এবং ব্রহ্ম, আরাকানের ইরাবতী, কর্ণফুলি নদীর ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। কখনো আরো দূরে সুরমা উপত্যকায়, এমনকী মেকঙ-এর বদ্বীপেও এদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। সর্বত্রই এদের নৌকার গঠন এক ধরনের, নাতিদীর্ঘ ডিম্বাকৃতি

এবং খোলার সব দিকেই খানিকটা উঁচু করে বাঁকানো। নৌকার গলুই তেমন সংকীর্ণ নয় এবং দুই মাথাই ভোঁতা। একত্রে চল্লিশ-পঞ্চাশ, কখনো বা একশো-দেড়শোখানা নৌকার বহর নদীপথে ভেসে চলে। শহর, গঞ্জ বা বর্ধিষ্ণু গ্রামের প্রান্তে তারা আড্ডা জমায়। তারপর জীবিকার বিচিত্র উপকরণ নিয়ে তারা হাটেবাজারে, সম্পন্ন গৃহস্থদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে সাপ খেলা দেখায়, ভেলকি, ভানুমতির খেলা দেখায়, নররাক্ষসের রূপ ধরে জ্যান্ত হাঁস-মুরগি দাঁতে নখে ছিঁড়ে খায়, কবজ তাবিজ মাদুলি শিকড়, বাতের ওষুধ, ধাতের ওষুধ, পেটে ছেলে আসার টোটকা, মারণ, বশীকরণ তেলপড়া, জলপড়া দেয়। ঠগ, তস্কর, প্রবঞ্চক, হাড়-হাভাতে, স্থিতিবিমুখ জলবেবাইজ্যা বা জলবেদের দল চট্টগ্রামের ঘাটে শতাধিক নাওয়ের বহর নিয়ে আড্ডা গেড়েছিল। পনেরো-ষোলো বছরের আউলাকেশি এবং তার থেকে দু-তিন বছরের বড় তার প্রেমিক ইগনেশিয়াস কোনোরকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই এসে এই বেদের নৌকায় আশ্রয় নিয়েছিল।

বাকলার নেহালিয়া গ্রাম থেকে অন্যদের সঙ্গে মগেরা যখন আউলাকেশিকে লুণ্ঠন করে নিয়ে আসে আউলাকেশির বয়স তখন মাত্র নয় বছর। মগেরা তাকে চট্টগ্রামে এনে মাসকারহেনা নামে এক পর্তুগিজ লবণ ব্যবসায়ীর কাছে বেচে দেয়।

মাসকারহেনা লোকটির ভিতরে ধর্মভীতি কখনো কখনো প্রবল হত। তার ব্যবসা খুব ছোট ছিল না। হাতিয়া দ্বীপে তার কয়েকটা ছোটবড় লবণের তাফাল ছিল। লবণের তাফাল সন্দ্বীপেও ছিল। তাফাল থাকলে লবণ রাখার জন্য গুদাম রাখারও দরকার হয়। এইসব তাফালে এবং গুদামে কাজ করার জন্য মাসকারহেনাকে দাস-দাসী কিনতে হত। তাছাড়াও থাকত মলঙ্গিরা, যারা এই কাজে অভিজ্ঞ। বস্তুত, লোকালয় থেকে দূরে সমুদ্র তীরবর্তী তাফালে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করলে মানুষ বেশিদিন বাঁচত না। তাছাড়া সেই কষ্টকর পরিবেশে স্ত্রীলোক খুব একটা কাজে লাগে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাসকারহেনা কিছু স্ত্রীলোক সেখানে রাখত। কেননা স্ত্রীলোক না থাকলে পুরুষের পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ত এবং কাজেও বিশৃঙ্খলা বেশি হত। কাজেই মাসকারহেনাকে কিছু স্ত্রীলোকের বন্দোবস্ত সেখানে রাখতেই হত। নিয়মিত দাসদাসী কিনে তাফালে না পাঠালে এ ব্যবসা অচিরেই লাটে ওঠে, এ কথা সবাই জানে।

মাসকারহেনা দাসদাসীর হাট থেকে আউলাকেশিকে নামমাত্র দামে, মাত্র পঁচিশ টাকায় অন্য আরো পাঁচ-ছ'জনের সঙ্গে কিনে নিয়েছিল। একসঙ্গে অনেক ক-জন কেনার কারণে আউলাকেশিকে যে ন্যায্য দামের থেকে অনেক কমেই কিনল। তাছাড়া, সুন্দর মুখের মায়ায় শয়তানও স্নেহময় হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই কেমন অন্য মানুষ হয়ে গেল আউলাকেশির বেলায়। চট্টগ্রাম দাসবাজারের দাসবিক্রেতা খান বলল, 'তুমি নিলে, তাই, না হলে যেনতেন লোকের হাতে দিতাম না এই মেয়েকে। চোখমুখের চেহারা, গায়ের রং দেখেছ এ মেয়ের? বড় ঘরের মেয়ে তাতে সন্দেহ নেই।'

দাস-দাসীদের বিলিবন্দোবস্ত করার সময় মাসকারহেনা আউলাকেশিকে ভালো করে দেখল। খান বাজে কথা বলেনি। ন-দশ বছর বয়সি বালিকার গলা শুনে কী কারণে কেমন ভাবান্তর হয়ে গেল তার। বহুদূরে পর্তুগালের গ্রামে পড়ে থাকা মা-বাপ-ভাইবোনের কথা মনে পড়ে গেল। রুজি-রোজগারের ধান্দায় সব ছেড়েছুড়ে এই অঢেল সামগ্রীর দেশে চলে এসেছে সে অন্য অনেকের মতো। পর্তুগিজদের অঢেল যা আছে, তা হল দুর্দম, সাহস, বীরত্ব আর নৃশংসতা। আর এই অফুরন্ত শস্য, পশু, জল, স্থল, শিল্প, বাণিজ্যের দেশের মানুষ— যেমন এই মেয়েটা এবং এর মতো আরো অসংখ্য শেষ পর্যন্ত দাসবাজারের পণ্য। পাপ লাগে না? কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'মাইয়া, তোমার নাম কী?'

একটু তির্যক কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আউলাকেশি বলল, 'আউলাকেশি!'

আউলাকেশির একমাথা অবিন্যস্ত চুল বিভিন্ন উচ্চতায় কান, গলা, বুক ও পিঠের উপরে ঝুলে আছে। সারা মাথা জুড়ে যেন তরুণ সাপেদের আস্ফালন। গোহাটায় কসাইয়ের কাছে বেচতে নিয়ে যাওয়া গোরুকেও গা ধুইয়ে, শিঙে তেল মেখে নিয়ে যায় বিক্রেতা। দাসদাসীর হাটে নিয়ে আসার আগে লুণ্ঠিত স্ত্রী-পুরুষ এবং বালক-বালিকাদের একটা শ্রীবৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হয় সেই সুবাদে আউলাকেশির অঙ্গে একখাবলা তেল পড়েছে আজ। টানা হেঁচড়ার ফলে কালসিটে কিংবা ঘষটে যাওয়া ক্ষত, বিশেষ করে বাঁ হাতের তালুর ক্ষত, যার ভিতর দিয়ে বেত গলিয়ে তাকে অন্যদের সঙ্গে গুচ্ছ করা হয়েছিল, পরিষ্কার করে মলম লাগানো হয়েছে।

নাম শুনে একটু প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে হেসে মাসকারহেনা বলল, 'সার্থক

নাম। তোকে নিয়ে কী করব আমি?'

আউলাকেশি সোজা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার চোখে। সরাসরি। হয়তো, দিন পনেরো হয়েছে অন্য অনেকের সঙ্গে নোহালিয়া থেকে মগেরা তাকে তুলে এনেছে। কিন্তু শিশু আউলাকেশি এই মুহূর্তেই সম্ভবত সেই প্রজাতির প্রাণী যারা অতি দ্রুত পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের রূপান্তর করে নিতে সক্ষম। এই পনেরো দিনেই তার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, বহু মানুষের সারা জীবনের সঞ্চয়েও তত থাকে না।

চট্টগ্রাম বন্দর সংলগ্ন দাসবাজারে চারধারে উঁচু বাঁশের অস্থায়ী খাঁচার মধ্যে পঁচিশ-ত্রিশ জন স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকার পণ্য নিয়ে লম্বা দাড়িআলা মাথায় পাগরি দীর্ঘ আলখাল্লা পরা পাঠান পাইকার লোকটি আসলে দালাল। খোয়াড়ের ব্যবস্থা তার, প্রহরার ব্যবস্থা তার, জুলুমবাজ ঠেকাবার ব্যবস্থা তার, আরাকানি প্রশাসকের খাজনা মেটাবার দায়িত্ব তার। কখনো সরাসরি, কখনো দু-তিন হাত ঘুরে দাসদাসী আসে তার কাছে। প্রকৃত বিক্রেতা একটা দাম ঠিক করে নেয় তার সঙ্গে, তার উপরে দালালি ঠিক নয়, বিক্রয়মূল্যের ব্যবধানের পুরোটাই তার প্রাপ্য।

লোকটির নাম শিস মহম্মদ। আশ্চর্য রূপবান প্রৌঢ় লোকটির চোখ দুটি পিঙ্গল, দৃষ্টি শ্যেন। তার পেশার সঙ্গে খুবই মানানসই। খোয়াড়ের বাইরে উৎসুক অলস আমোদপ্রেমী দর্শকদের সরাতে প্রহরীরা মাঝেমধ্যে বাঁশের বেড়ার উপরে চাবুকের আঘাত করে সতর্ক আওয়াজ তুলছে।

আউলাকেশির পাশে ছিল একজন প্রকাণ্ড শরীরের কৃষ্ণকায় পুরুষ। কোমরে একফালি নেকড়া ছাড়া তার তৈলাক্ত পেশিবহুল শরীরে অন্য কোনো আবরণ ছিল না। উলটোদিকের সারিতে তিনজন যুবতীর শরীর তিনখানা সংক্ষিপ্ত শাড়িতে এমন কৌশলে জড়ানো যে ক্রেতারা পরীক্ষা করার জন্য একটানে খুলে সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে দেখে নিতে পারে এবং দেখছেও।

তিন যুবতীর মধ্যে একজন দীর্ঘাঙ্গী এবং গড়ন শক্তিশালী। তার বুক অনাবরণ হলে প্রতিমা তৈরির মধ্য পর্বের সঙ্গে সাদৃশ্য আসে। থমধরা বিশাল পাথুরে বুক। তার তলপেট ঈষৎ উঁচু, তাতে আউলাকেশিরও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সে অন্যূন চার-পাচ মাসের পোয়াতি। আউলাকেশি ওই বয়সেই এসব বুঝতে শিখেছিল।

প্রকাণ্ড শরীরের পুরুষটির পায়ে বেড়ি-বাঁধা। অন্য স্ত্রীপুরুষ বালক

বালিকারা খোয়াড়ের ভিতরে মুক্তই ছিল। ক্রেতা যুবতীদের অনাবৃত করলে আউলাকেশির পাশের যণ্ড পুরুষটি জান্তব আওয়াজ করছিল। পায়ে বেড়ি থাকা সত্ত্বেও সে ক্রমশ এমন উত্তপ্ত হচ্ছিল যে আউলাকেশিরও ভয় হচ্ছিল সে যে কোনো মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

শিস মহম্মদ চিৎকার করে একজন রক্ষীকে আদেশ করতে সে যণ্ডকে দমাদ্দম দু-চারটা রদ্দা লাগাল এবং আউলাকেশিকে ওখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র দাঁড় করাল।

বাটাভিয়ার ওলন্দাজেরা চট্টগ্রামের দাসবাজার থেকে প্রচুর দাসদাসী সংগ্রহ করে। তাদের কুঠিগুলোতে এবং কারখানায় দাসদাসীদের অফুরন্ত চাহিদা। মগরা তাদের নির্ভরযোগ্য দাস জোগানদার।

একজন ওলন্দাজ যুবতীদের ভালো করে দেখবার জন্য এগিয়ে এলে যণ্ড আগের মতোই চঞ্চল হয়ে উঠল। যুবতীর ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত দেখে সে আর অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করল না। রক্ষীর হুংকার অগ্রাহ্য করে কোমরের আবরু সরিয়ে সে তার বৃহদাকার লিঙ্গ উন্মুক্ত করল। খোয়াড়ের বাইরের দর্শকদের মধ্যে দু-একজন রসিক সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী ক্রিয়া অনুমান করে তাকে উৎসাহ দিতে শুরু করল। একটা ব্যাপক রঙ্গ প্রদর্শনের ব্যবস্থা যেন। যারা উৎসাহ দিচ্ছিল, তাদের সঙ্গে অন্যরা যোগ দিল। পরীক্ষারত ওলন্দাজ লোকটির হাতে যুবতীর শাড়ি। এই অবস্থায় সে পিছন ফিরে মাত্র দশ হাত দূরত্বে যণ্ডের উচ্ছ্রিত লিঙ্গ দেখে সভয়ে খানিকটা দূরে সরে যেতে প্রায় উলঙ্গ যুবতী তার দৃষ্টিপথে একেবারে সরাসরি। উল্লাস, চিৎকার, উৎসাহদান, প্রহরীর ডান্ডা এবং ভয়ার্ত শিহরনের মধ্যে যণ্ড তেজমুক্ত হল। এতক্ষণ প্রহরীর প্রহার সে গ্রাহ্যই করেনি। এবার ধাক্কা দিয়ে তাকে খানিকটা দূরে সে সরিয়ে দিল।

শিস মহম্মদ ওলন্দাজ বণিককে বলল, 'আলাদা বিছানা এবং নির্ভরযোগ্য আড়াল না থাকলে মানুষের যৌনতা আর পশুর যৌনতায় কোনো তফাত নেই, দুটোই যন্ত্রণার।'

বলতে বলতে কাঠের সিন্দুকের ভিতর থেকে হাতচারেক লম্বা এব টুকরো শক্ত দড়ি বের করল। কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা রক্ষীকে বলল, হারামজাদার হাতদুটো এবার পিছমোড়া করে বেঁধে দে।'

ওলন্দাজ বলল, 'পশুর কোনো যৌনতা নেই, খাঁ সাহেব, সে শুধু

প্রকৃতির দাস, আজ্ঞাবহ। তোমার এ লোকটাও তাই।'

অগ্রসর রক্ষীকে লক্ষ করে শিস মহম্মদ হেঁকে বলল, 'হাত বাঁধা হয়ে গেলে হারামির অণ্ডকোষে একটা জোর ঠুসা দিস খোদাবক্স, যাতে অন্তত দশদিন হারামি মালুম রাখে!'

ওলন্দাজের দুই গালে চার আঙুল করে গালপাট্টা, ঘাড়ের উপরে লম্বা সরল চুল ঝুঁটি বাঁধা। মাথায় দেশি ডিঙ্গি ধরনের বাহারি টুপি। বলল, 'এ লোকটাব দেশ কোথায়? ইতিহাস কী?'

ওপাশ থেকে ষাঁড় সদৃশ লোকটি বাস্তবিকই জানোয়ারের মতো আর্তনাদ করে উঠল, বোঝা গেল শিস মহম্মদের আদেশ যথাযথ কার্যকর হয়েছে। সে বলল, 'সন্দ্বীপের রাজা গনজালেস দক্ষিণের বাত্তিকোলার রাজার কাছ থেকে দুশো ঘোড়সওয়ার সৈনিক এবং দুশো ঘোড়া এনেছিল। আশা ছিল আরাকান রাজ্য জিতে সে সন্দ্বীপ, শাহাবাজপুব, ভুলুয়া, চট্টগ্রামসহ পুরো আরাকানের রাজত্ব দখল করবে। কিন্তু সে তো শেষ পর্যন্ত হল না।'

ওলন্দাজ বলল, 'সে তো সবাই জানে, তার সঙ্গে এ লোকটার সম্পর্ক?'

'এ লোকটা সেই ঘোড়সওয়ার সেনাপতি গোলাম ঘউসের ঘোড়ার খিদমতগারদের একজন,' শিস মহম্মদ বলল, 'গনজালেসের সন্দ্বীপ মগরাজা দখল করে সবাইকে কচুকাটা করতে শুরু করতে যে যেখানে পাবল পালাতে শুরু করল। গনজালেস খুন হয়েছে, না, পালাতে পেরেছে, এ কথা কেউ জানে না। ঘউস গনজালেসের চল্লিশখানা জাহাজের একখানা দখল করে নিয়ে পালাতে পেরেছিল ঠিকই কিন্তু আরাকানিদের গোলায় সে জাহাজের একটা দিক ভালোমতোই জখম হয়েছিল। কামানের গোলার আওতার বাইরে যাওয়ার পর ঘউসের খেয়াল হল কয়েকটা ঘোড়া এবং আত্মীয়স্বজন দাসদাসী নিয়ে জনা চল্লিশেক মানুষ জাহাজে থাকলেও খাবার কিংবা খাবার জল বিশেষ নেই। ফলে সেই ভাঙা জাহাজ নিয়ে কোনোক্রমে জুগদিয়া পৌঁছে মোগল থানাদারের কাছে আত্মসমর্পণ। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ঘোড়া, দাসদাসী, মায় জাহজখানা, সর্বস্ব বেচে মোগলদেরই একখানা সওদাগরি জাহাজে করে নিজের দেশের পথে রওনা দেয় ঘউস।'

ওলন্দাজ সুযোগ পেয়ে বিষয়টাকে সংক্ষেপে করতে চাইল। বলল, 'তো সেই গোলাম ঘউসের দাস এই ষাঁড়টা আরো দু-এক হাত ঘুরে তোমার হাতে?'

শিস মহম্মদের পিঙ্গল চোখদুটি একটু আশাহত হয়ে গেল। বিমর্ষ

ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কততে দেবে?' ওলন্দাজ জানতে চাইল।

শিস মহম্মদ বলল, 'দুশো টাকা।'

'আর ওই মেয়েটা?' ওলন্দাজ জানে দুশোকে একশোতে নামানো সম্ভব হবে যদি এর মধ্যে অন্য কোনো ক্রেতা ইতিমধ্যে এসে হাজির না হয়।

হলও তাই। লবণ ব্যবসায়ী মাসকারহেনা এসে হাজির হল তার গোমস্তাকে নিয়ে। তার গোমস্তার নাম অ্যাবরেনানশিয়াস।

শিস মহম্মদের সুবিধা হল। বলল, 'ওই একই দাম।'

'মেয়েটার দামও দুশো টাকা!' তারপরে মাসকারহেনার দিকে তাকিয়ে নিদান দেওয়ার ভঙ্গিতে ওলন্দাজ বলল, 'খানের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

মাসকারহেনা একটু হেসে খোয়াড়ের ভিতরে ঢুকল। একজন দরদাম করতে থাকলে অন্য ক্রেতার সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানে বিক্রেতাকে প্রভাবিত করা। তাতে অনেক সময় নোংরা বিবাদ হয়। সে সরে গেল এবং সরে যাওয়ার ভিতরে এই ইঙ্গিতও দিয়ে গেল যে উৎসাহী সেও একজন।

ওলন্দাজ উচ্চস্বরে বলল, 'আরে দুশো টাকায় তো একটা জাহাজ কিনতে পারা যাবে!'

খান বলল, 'জাহাজই তো! চেহারাখানা দেখেছ? একবার বুকের কাপড় উদলা করতে এই জানোয়ারটা পাগল হয়ে গেল আর পা দুখানা ফাঁকা করলে তো গোটা বাজারে ধুম লেগে যাবে!'

'তাই বলে দুশো!' ওলন্দাজকে কয়েকজন দাসদাসী কিনতেই হবে। মোগলরা নানা সামরিক ব্যবস্থা চালু করার ফলে আগের মতো আর সহজেই দাসদাসী পাওয়া যাচ্ছে না। বিগত শতকে আরাকানিদের সিংহাসন নিয়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে বহু ক্রীতদাস ক্রীতদাসী আরাকান এবং চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে তাদের স্বদেশ অর্থাৎ বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ, যশোর, ভুলুয়া ইত্যাদি জায়গায় ফিরে চলে গেছে।

এ ছাড়া জাহাঙ্গিরনগর, সোনারগাঁও, শ্রীপুর, চন্দ্রদ্বীপ, লক্ষ্মীপুর, ভুলুয়া এবং যশোরের নদী তীরবর্তী যত গ্রাম এবং জনপদ প্রায় সবই এখন মগের অত্যাচারে জনশূন্য বা প্রায় জনশূন্য। সমুদ্র থেকে বিশ ক্রোশ, ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী গ্রামগুলোর মানুষও নিরাপদ দূরত্বে সরে বাসস্থান তৈরি করেছে।

কাজেই সস্তা ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর দিন আর নেই, এসব কথা ওলন্দাজ

কিংবা মাসকারহেনা জানে।

খান বলল, 'দুশো টাকা তো কম বলেছি, পেটেরটা খসলে তো ফাউ পেয়ে যাবে আর একটা। সেটার দাম তো ধরিনি।'

ওলন্দাজ দালালের এদেশে অনেকদিন হয়ে গেছে। ফলে ভাটির বাঙালদের কথাবার্তাও তার রপ্ত। বলল, 'কাঁচা কাঁডাল আর গাভিন গাই, যে কেনে হে ফুঙ্গিরভাই। ও সব ফাউয়ের কথা রাখ মিঁয়া। ঠিক দাম বল।'

চট্টগ্রাম মগের মুল্লুক। এই বাজারের ভিতরে এদিকে ওদিকে তাকালেই দু-একজন ফুঙ্গির দেখা পাওয়া যাবে। বাংলার অন্যত্র বৌদ্ধরা বিভিন্ন কারণে নিন্দিত এমনকী ঘৃণিত হলেও এখানে ব্যাপারটা তেমন হয়নি এখনও। আরাকানের রাজা প্রবল শক্তিশালী। শোনা যায় তার বাহিনীতে দশ লক্ষ সৈন্য, দেড় হাজার হাতি এবং রণতরীর নাকি সীমা সংখ্যা নেই। চট্টগ্রামের মগ প্রশাসকও খুবই উপযুক্ত, চতুর্দিকে তার চরেরা ছড়িয়ে থাকে। কাজেই ব্যবসা করতে হলে ব্যবসাই কর, অন্যদিকে তাকিও না। শিস মহম্মদ জানে এই মগদের মতো বিশ্বাসঘাতক এবং নৃশংস জাত আর নেই। ফুঙ্গিরভাই যে বাঙালিদের একটা নোংরা গালাগাল, তাও সে জানে। বলল, 'তোমার দামটা বলে চলে যাও। অন্য ক্রেতা তো বাজারে আছে, তারা বেশি দিলে তাদেরই দেব। তবুও তোমারটা শুনে রাখি।'

অন্য পাঁচ-ছ জন দাসদাসীর সঙ্গে মাসকারহেনা আউলাকেশিকেও কিনল। কেনার আগে একবার আঙুলে ঘষে দেখল তার গায়ের রংটা আসল, না নকল। দ্বিতীয়বারে আঙুলে খানিকটা থুথু লাগিয়ে ফের ঘষল। এদেশের মানুষ এমন ফরসাও হয়! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে হাটে আনা হয়েছে আউলাকেশিকে। মাসকারহেনার মনে হল, মেয়েটার হাড়ের রং শুধু সাদাই নয়, উজ্জ্বল আলোও নিশ্চয়ই বিচ্ছুরণ হয় সেখান থেকে। তাই সারা শরীর থেকে এমন আভা বের হচ্ছে।

নোহালিয়া তাদের বাড়ির নাম ছিল ধলাবাড়ি। এমন শুভ্র গাত্রবর্ণযুক্ত একটা গোটা পরিবার আর কেউ কোথাও দেখেনি।

মাসকারহেনার কেমন মায়া পড়ে গেল তার উপর। গোমস্তাকে ডেকে বলল, 'শোনো অ্যাবরেনানশিয়াস, ওকে চম্পার কাছে পৌঁছে দিও।'

তারপর একটু থেমে ফের বলল, 'আর মারিয়া ল্যাবোর্ডেকে বোলো

একটু নজর রাখতে।'

চম্পা মাসকারহেনার দেশি খ্রিস্টান বউ। বস্তুত, খাজা আবরাহাম নামক একজন আর্মেনির পুঁজিতেই মাসকারহেনার বর্তমান ব্যবসার পত্তন। ব্যবসা বড় হয়ে উঠতে আবরাহাম ভাগ্যান্বেষী মাসকারহেনাকে আশ্রয় দিয়ে ব্যবসার কার্যকরী অংশীদার করে নেয়। মাসকারহেনার ভিতরে যেহেতু রোমিয় ক্যাথলিক ধর্মভীতির অবস্থান বেশ দৃঢ় ছিল, আবরাহামকে সে মালিক হিসেবেই মান্য করত। বৃদ্ধ বিপত্নীক আবরাহাম শেষ বয়সে ব্যবসার স্থায়ী সম্পদ মাসকারহেনাকে ছেড়ে দিয়ে স্বদেশে চলে গেল। তার এদেশি স্ত্রীর গর্ভের একটিমাত্র কন্যা জীবিত ছিল। সেই চম্পাকেও সে খ্রিস্টীয় মতে মাসকারহেনার হাতে সম্প্রদান করে গেল। ব্যবসায়ী লোকটি স্থানীয় অন্যান্য ব্যবসায়ী এবং কয়েকজন রাজপুরুষকে সাক্ষী রেখে যায় এই কারণে নয় যে মাসকারহেনাকে সে বিশ্বাস করে না, বরং উলটো মেয়ে চম্পা মাগদালেনের মতিগতির উপর তার আদৌ আস্থা ছিল না।

আউলাকেশি মাসকারহেনা এবং চম্পা মাগদালেনের সংসারে পাঁচ-ছ বছর ছিল। জীবনের এই সময়টায় একমাত্র নিজের বাপমাভাইবোনকে না পাওয়ার কষ্ট ছাড়া তার আর কোনো কষ্ট ছিল না। বরং কিছুদিনের মধ্যে সে অভাবও তার কেটে যেতে লাগল। চম্পা মাগদালেনের সংসারে এক পাল হাঁসমুরগি, শুয়োরকে, দেখাশুনার কাজ তাকে করতে হত। অ্যাবরেনানশিয়াস এবং মারিয়া ল্যাবোর্ডের অবিমিশ্র স্নেহ এবং ভালোবাসা পেয়ে ধীরে ধীরে বাপ-মার কথাও ভুলতে শুরু করেছিল সে। সব থেকে বেশি লাভ হয়েছিল ইগনেশিয়াসের সাহচর্যে। অ্যাবরেনানশিয়াস এবং মারিয়ার সন্তান ইগনেশিয়াস তখন পনেরো-ষোলো বছরের বালক।

১০

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোবা ভট্টাচার্য বাড়ির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বাঁ দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ফেরাল। দুপুরের নীল আকশের ঝলমলে রোদের নীচে নদী আয়নার মতো আলো প্রতিফলন করছে। আঁধারমানিক প্রশস্ত নদী। পশ্চিমে আধা ক্রোশ গিয়ে নদীর দক্ষিণ-পশ্চিমে বক্রগতি উজানে। কিন্তু সেই বিন্দুর আগে উত্তর দিক থেকে একটি দোন এসে মিশেছে আঁধারমানিকে। এই দোনের নাম বগ্গি, বগি আঁধারমানিকের সঙ্গে আয়লা নদীকে যুক্ত করেছে। বগির পুবপাড়ে দীর্ঘ এবং বর্ষা অতিক্রান্ত ঘনসবুজ পল্লবে আচ্ছাদিত শিরিষ গাছের সারি। সেই শিরিষের ছায়া পড়েছে বগির অনেকটা ভিতর পর্যন্ত। সেই ছায়া ঘেরা বগি ধরে অন্তত বিশ-পঁচিশ খানা মাঝারি নৌকা। তার মধ্যে সাত-আটখানা যুদ্ধযান, যার নাম কোশা, বাকিগুলো জালিয়া। শক্তপোক্ত নৌকাগুলো এগিয়ে এল। বোবা ভালো করে কিছু বুঝবার আগেই পাঁচ-সাতখানা নৌকা আঁধারমানিকে পড়ে ধাইনগর ঘাটের দিকে এগোতে লাগল। বোবা আরো সামান্য সময় অপেক্ষা করে। নৌকাগুলোকে আরো কিছুটা এগোতে দিয়ে বুঝল নৌকাগুলো মগদের এবং তাদের হাবেভাবে পরিষ্কার যে তারা আক্রমণ করতেই এসেছে। মগরা আসছে! সুন্দরবনের বাঘের থেকে হিংস্র নদীনালার কুমির কামটের থেকেও ভয়ংকর মগ আসছে!

সে পায়ের নীচের কাঠিতে দাঁড়িয়ে গাছটিকে দোল দিতে শুরু করল। চারবার-পাঁচবার এদিক-ওদিক করে দোল দিয়ে সে ডানপাশের প্রতিবেশী গাছটাকে ধরে ফেলল। এইভাবে তার পরেরটা এবং তার পরেরটাও। বাগান শেষ হয়ে আসতে গাছগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব বাড়তে সে প্রায়

উড়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী গাছকে আঁকড়ে ধরছিল। এইভাবে শেষ গাছটি অতিক্রম করে সে ছড়ছড় করে নীচে নেমে পড়ল। সে খুকির নিষেধ ভুলে গেল। বোবা চিৎকারে সমস্ত গ্রামকে সজাগ করতে সে বিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্যের বাড়ির দিকে দৌড়াতে লাগল। তার চিৎকারে যারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল তাদের সে নদীর দিকে ইঙ্গিত করে পালাতে বলল। একজন দ্রুত গাছে উঠে নিঃসংশয় হয়ে চিৎকার করে সবাইকে পালাতে বলল। সমস্ত গ্রামটার ছাড়াছাড়া বাড়িগুলোর লোকজনের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে গেল। সন্ত্রাস এত বড় গ্রামটার হাওয়া বাতাসেও যেন মাখামাখি হয়ে গেল। প্রথমে একটা- দুটো, পরে অনেকগুলো একসঙ্গে শঙ্খ বেজে উঠল। গাছগুলোর কোনো কোনোটার মাথায় ফাটা বাঁশের টুকরো দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে বিপদের সময় দড়ি টেনে শব্দ করে সংকেত জানানোর জন্য। সেই শব্দও উঠল। উঠল হুলুধ্বনি। এই বিচিত্র ঐকতান কাছের থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ে ভয়াবহ আতঙ্ককে জীবন্ত করে তুলল।

কিন্তু এইসব বিপদসংকেত সামান্য সময়ের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে গেল। কেননা সব মানুষের নিরাপদ জায়গায় পলায়নই একমাত্র কাজ বিবেচ্য হল। একজন মূক-বধির ব্যক্তি যখন চিৎকার করে সে চিৎকার জানোয়ারের চিৎকারের থেকে ভয়াবহ। জানোয়ার নিজের চিৎকার শুনতে পায়, তাতে তার ক্রোধ, কাম, আনন্দের অভিব্যক্তি তার অনুভূতি এবং আবেগের প্রকাশ। সে কানে শুনে সেই ধ্বনির মাত্রায় তারতম্য এবং উচ্চাবচ তরঙ্গ তুলতে পারে। বোবা তা পারে না। তার চিৎকার ত্রাস এবং বিপদের সংকেত এই মুহূর্তে এবং তা শুধু গলার শক্তি, বুকের দমের অভিব্যক্তি। কিন্তু নির্ভুলভাবে সমস্ত গ্রামের মানুষের কাছে এই চিৎকারের বার্তা একটাই। অপরিসীম বিপদ এসেছে এবং সে বিপদ হল গাঙে মগের কোশা!

মানুষ দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে। বাড়ির আড়াল দিয়ে, গাছের ফাঁকা দিয়ে, পুকুরের উচু বাঁধের আড়ালে শিশু, যুবক, বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষের প্রাণান্তকর দৌড়। মানুষ পালাচ্ছে। যাদের এই বিপদেও কাণ্ডজ্ঞান আছে তারা পশ্চিমের জঙ্গলাকীর্ণ জলা জায়গাটার দিকে ধাবমান। ওখানে লুকিয়ে থাকার আড়াল আছে, শুধু নাকটুকু কচুরিপানার আড়ালে উঁচু করে রেখে সর্বাঙ্গে, মায় মাথার বাকি অংশটা পচা পাঁকের তলায় ডুবিয়ে এক প্রহর অতিক্রম করতে পারবে প্রাণভয়ে কাতর মানুষ। যারা এমন করবে তারা ভুলে যাবে যে পচা

পাঁকের অভ্যন্তরে ভয়ংকর কুমিরেরা আছে, এই কার্তিক মাসের উজ্জ্বল এবং ক্রমশ মিঠে হয়ে আসা রোদে তারা এখন পাড়ে উঠে এসে ঝোপ জঙ্গলের অন্তরালে ডিম পাড়বে। আছে ভয়ানক বিষধর কেউটে, গোক্ষুর এবং শিয়র চাঁদার মতো জাত সাপেরা; যারা জঙ্গলের বড় বড় গাছের ডালে দোল খেয়ে এক গাছ থেকে পনেরো হাত দূরের অন্য গাছে অবলীলায় যেতে পারে।

সুপারির জঙ্গল এবং বিষ্ণুপ্রিয়র বাড়ির মধ্যকার মাঠটা প্রস্থে খুব কম নয়। বোবা চিৎকার করতে করতে সেই মাঠ পার হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়র ভিটার আমকাঁঠালের বাগানের মধ্যে ঢুকল। বাগান পার হয়ে পুকুর, সেখানে কেউ নেই। পুকুর পার হয়ে বাড়ির পিছন দিকে বিষ্ণুপ্রিয়র স্ত্রী সত্যভামার পাকের ঘর। বোবা চিৎকার করে ছোঁয়া-ছানির লক্ষ্মণগণ্ডির বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে, ঢিল মেরে এবং বারংবার চিৎকার করে নিঃসন্দেহ হল সেখানে কেউ নেই। মাটির বাড়ির উঁচু দাওয়ায় উঠে দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি মেরে সে নিশ্চিন্ত হল যে, না, সে বাড়িতে এই মুহূর্তে কেউ নেই। কেউ নেই অথচ সদর অন্দর সব হাট করে খোলা। এতে বোবার ধারণা হল যে এরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জানতে পেরে পালিয়েছে। সে স্বস্তি পেল এবং লাফ দিয়ে দাওয়া থেকে নীচে নামল।

লাফ দিয়ে নামতে কোমরের পিছনে ঝুলানো লম্বা হাঁসুয়াখানার মাথায় অসাবধানে হাঁটুর পিছন দিকে খোঁচা লাগল। অস্ত্রখানা খুলে হাতে নিল সে। আঘাত লাগা জায়গাটা জ্বালা করে উঠতে হাত দিয়ে টের পেল সামান্য রক্ত গড়িয়ে নামছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল মগের কাছে সেও নিরাপদ নয়। এই মুহূর্তে তারও পলায়নের প্রয়োজন আছে। পালাতে হলে তাকেও যেতে হবে পশ্চিমের জঙ্গলের দিকেই। সে সেই জলা-জঙ্গলের উদ্দেশে দক্ষিণ দিকে খানিকটা এগোবার পর দূর থেকে দেখল জনা-পনেরো মগ আট-দশজন বালক ও যুবতী স্ত্রীলোককে একটা মাত্র দড়ির সাহায্যে বেঁধে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নদীর ঘাটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক বন্দির কোমরে দড়ির একটা করে প্যাঁচ এবং গিট। দড়ির দুই প্রান্ত দুই দস্যুর হাতে। গোরু বিক্রির হাটে গোরুমোষকে যেভাবে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সশস্ত্র মগেরা বন্দিদের সেভাবেই নিয়ে যাচ্ছিল। ঝোপের আড়াল থেকে সেই ক্রন্দন মুখর, আহত

এবং তাড়না করা বালক-বালিকাদের দেখে বোবার নতুন করে শর্মিষ্ঠা সম্পর্কে দুশ্চিন্তা হল। এ দলে খুকি নেই, অন্য কোনো দলে তো থাকতেই পারে! বোবার পালানো হল না। জীবনের অসংখ্য বারের মতো নিজের শারীরিক অক্ষমতা, যথা কানে শুনতে না পাওয়া এবং কথা বলতে না পারার জন্য ঈশ্বরকে অভিসম্পাত করল সে মনে মনে। যদি তার কান থাকত তাহলে সমস্ত গ্রাম জুড়ে যে আর্তনাদ এবং হুংকার সেই সময় উঠছিল তা শুনতে পেয়ে বোবা হয় তো আর ঈশ্বরকে অভিসম্পাত করত না। যতক্ষণ না পর্যন্ত মগের দল বন্দিদের নিয়ে পথের আড়ালে অদৃশ্য হয়, বোবা ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রইল।

মগেরা চোখের আড়াল হতেই চতুর্দিক সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়ে বোবা নিকটবর্তী একটা প্রাচীন গাছের উপর উঠে বসল। ঘনসন্নিবিষ্ট কাণ্ড ও পাতার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে সে অনেকটা উঁচুতে উঠে গেল। এখান থেকে নদীর দিকের রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায়। দেখা যায় পাড় ধরে পর পর নোঙর করা মগদের জালিয়া এবং কোশাগুলোকে।

মগেরা লুণ্ঠিত মাল এবং বন্দি পুরুষ, বালক-বলিকাসহ বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে অর্থাৎ গ্রামের বিভিন্ন অংশ দিয়ে ঘাটের পথে এগোচ্ছে। অথবা কোনো অবস্থাপন্নের ঘরে ঢুকে টেনে টেনে মাল, গবাদিপশু বার করছে। কোথাও অট্টহাস্য করে কোনো মগ কোনো স্ত্রীলোককে প্রকাশ্যেই বিবস্ত্র করছে। এমনকী যেসব মানুষকে বয়স কিংবা রোগ বা অনুরূপ কারণে মগ বন্দি পর্যন্ত করতে চাচ্ছে না, তাকেও নিতান্ত কৌতুকের ছলে অঙ্গস্পর্শ করছে, হাঁ করিয়ে মুখে থুথু দিচ্ছে কিংবা গায়ে থুতু ছিটিয়ে দিচ্ছে। বিশৃঙ্খল হুল্লোড় করে মগের দল ঘাটের দিকে ফিরছে। উৎসবের গ্রাম থেকে আশানুরূপ লুঠ তাদের কপালে জুটেছে। কোনো কোনো মানুষের আগুনের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। মগদের মধ্যে কয়েকজন আগুনের গোলা ছুড়ে আশপাশের দাহযোগ্য বাড়ি পেলেই জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মগ জানে এই হিন্দুরা বিচিত্র মানসিকতার মানুষ। শুধুমাত্র মগ স্পর্শেই এদের জাত যাবে। এসব কথা বোবাও জানে। সমস্ত লুণ্ঠন লাঞ্ছনা কিংবা বলাৎকারের মধ্যে বোবা কোথাও কোনো প্রতিরোধের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেল না। এমনকী প্রতিরোধ যারা করতে পারে গ্রামের এমন সক্ষম পুরুষ মানুষও সে কোথাও দেখতে

পেল না। নিশ্চিত মগের নাম শোনা মাত্র তারা সর্বাগ্রে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েছে। মগহার্মাদ যথার্থই বিভীষিকা।

হঠাৎ একদল সশস্ত্র হল্লাকারী দস্যু গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। রঙিন লুঙ্গিপরা, মাথায় রঙিন সিল্কের ফেট্টি বাঁধা এই দলের মগেরা অসম্ভব উল্লাসিত। বোবা দেখল এই দলে জনা দুয়েক মাথায় টুপি, হাঁটু অবধি আঁটোসাঁটো পাতলুন এবং ঝোলা পিরান পরা ফিরিঙ্গি আছে।

দলটা আর একটু এগোতে হৃৎপিণ্ড লাফ দিয়ে উঠল বোবার। ওই তো খুকি! সঙ্গে তার মা এবং বোন ছোট খুকিও আছে! কোমরে দড়িবাঁধা খুকির সঙ্গে সমানতালে চলতে থাকা এক ফিরিঙ্গি দস্যুর যেন আর তর সইছিল না। খুকির বুকের কাপড় সরিয়ে সে তার কোমরে জড়িয়ে দিল। যেন একটা চমৎকার প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করেছে এমন ভঙ্গিতে হা হা করে হেসে সেই দস্যু সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। মাঝে মধ্যে হাত দিয়ে যুবতীর বিস্ময়কর স্তন পরখ পর্যন্ত করতে লাগল। শেষে বোবার বেদনার্ত, ক্রুদ্ধ চোখের সামনে নিজেকে সামলাতে না পারা সেই ফিরিঙ্গি রাস্তার মধ্যেই জড়িয়ে ধরল খুকিকে।

বোবা দ্রুত গাছ থেকে নামতে শুরু করল। মাটিতে নেমে নিঃশব্দে দলটার দিকে দৌড়াতে শুরু করল সে। দলটার হাত পনেরো-বিশ দূরের একটা ঝোপের আড়াল থেকে আচমকা বের হল বোবা। প্রবল চিৎকার করে দৌড়ে এসে ফিরিঙ্গির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। তার হাতে তার প্রায় সব সময়ের সঙ্গী সেই দেড় হাত লম্বা হাঁসুয়া, যা দিয়ে সে খেজুর গাছ, নারকেল গাছ, সুপারি গাছ ঝাড়ে।

মগ গ্রামে ঢুকে কখনো বাঁধা পায় না। মগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কোনো ঘটনার কথা শোনা যায় না, প্রতিআক্রমণ তো তাদের দুঃস্বপ্নেরও অতীত। বোবা সেই কাজটা করল।

ফিরিঙ্গি মুহূর্তে কোমরের কোষ থেকে তরোয়াল উলঙ্গ করল। মগেরা চিৎকার করে উঠছিল, 'ফারা-ফারা, ফারা-ফারা', কিন্তু প্রতিস্পর্ধায় 'জয়মা কালী' কিংবা 'আলী আলী' এরকম কোনো ধ্বনি উচ্চারিত হল না। তবে অনেক দূর থেকে বোবা ক্ষিপ্র চিতার মতো লাফ দিয়ে অনেক উঁচু থেকে তার শরীরের উপরে ঝাঁপিয়ে পডল। ফিরিঙ্গি অমন প্রবল অভিঘাতে নিমেষে

মাটিতে ছিটকে পড়ে ওঠার চেষ্টা করতেই বোবা তার শরীর লক্ষ করে হাঁসুয়া চালাল। ফিরিঙ্গি প্রথম আঘাত তার হাতের তরোয়াল দিয়ে আটকাতে পারলেও, পরের আঘাত হাতের অস্ত্র ধরে রাখতে পারল না। তৃতীয় আঘাতে বোবা তার মুণ্ড ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল।

এবং পরমুহূর্তে ঘুরে তাকিয়ে দেখল পাঁচ-ছজন সশস্ত্র দস্যু তাকে ঘিরে ফেলেছে। তার বোবা আর্তনাদে এবং আঘাত করার প্রবল প্রচেষ্টায় অন্তত সামান্য সময়ের জন্য হলেও মনে হল একটা লড়াই হচ্ছে। কিন্তু সে খুবই সামান্য সময়।

১১

ইগনেশিয়াস ডি সিলভা সারাজীবনে বুঝতে পারেনি তার পেশা কী হওয়া উচিত ছিল। তবে এটা বুঝতে পেরেছিল যে তার বাবা অ্যাবরেনানশিয়াস ডি সিলভার যাজক হওয়া উচিত হয়নি। যে যাজক হবে সে সার্ভেন্তিসের ডন কি-হোতে পড়বে কেন? কেন আজুরারার বিবরণ শুধু পড়বেই না, দীর্ঘদিন মনেও রাখবে, ভবিষ্যৎ জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাবে! ভাস্কো-ডা-গামার কালিকট আসার একশো বছর পরে অ্যাবরেনানশিয়াস কালিকট এল। এর ঠিক নব্বই বছর আগে আলবুকার্ক গোয়া অধিকার করে। তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি কিন্তু সে শুনেছে, কেননা শোনার কান এবং দেখার চোখ ঈশ্বর তাকে ভালোমতোই দিয়েছিল, যে ভাস্কোকে কালিকটের মানুষ জিজ্ঞেস করেছিল যে তারা কীসের জন্য এদেশে এসেছে। ভাস্কোদের উত্তর নাকি ছিল এ রকম যে তারা মশলা আর খ্রিস্টানদের খোঁজে এদেশে এসেছে। খ্রিস্টানদের খোঁজে কথাটার মানে কী? সিরীয় খ্রিস্টানরা নাকি খ্রিস্টীয় ধর্মবিস্তারের প্রথম শতক থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে এসে

হাজির হয়েছিল, এমন শুনেছে অ্যাবরেনানশিয়াস। তাদের আবার খোঁজার কী আছে?

কিন্তু মশলা একটা ব্যাপার।

সু অথবা উত্তেজক গন্ধী ফল, বীজ, বাদামজাতীয় দ্রব্য গাছের পাতা, বাকল, শিকড়, আঠা, যা দিয়ে বস্তুকে, বিশেষ করে খাদ্যবস্তুকে রুচিকর সুগন্ধ দান করা যায়, ঝাঁঝালো কবা যায় এবং ক্ষুধাবর্ধক করা যায়, এসবের এক কথায় নাম হল মশলা। দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, আদা, ধনে, সর্ষে জৈত্রি, মরিচ, হলুদ, তিল, তিসি, কালোজিরে, ভ্যানিলা, দীর্ঘ তালিকা মশলার, যা পাওয়া যায় মূলত নিরক্ষীয় অঞ্চলেই। খাদ্য, বিশেষ করে মাছ এবং মাংস সংরক্ষণে মশলার বহুপ্রাচীন কাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ছ-মাসের উপরে অ্যাবরেনানশিয়াস জাহাজে ছিল। এক বুড়ো নাবিক মানুয়েল তাকে বলেছিল, শোনো ছেলে, মশলা শুধু মশলা নয়। মশলা কখনো কখনো সোনাও। অথবা সোনার থেকেও দামী।

কথাটার অর্থ সে ঠিকমতো বুঝতে পারেনি।

পরে বুড়ো আরো ব্যাখ্যা করে বলেছিল, শোনো ছেলে, বুড়োদের কাছে শুনেছি রোমানরা সোনা নয়, মশলার পরিবর্তে গথদের সঙ্গে বন্দিবিনিময় করত। তা হলেই বোঝ!

এখনো এ রকম হয় নাকি? সার্ভেন্তেস পড়া অ্যাবরেনানশিয়াস সেই প্রাচীনকে প্রশ্ন করেছিল। মোজাম্বিকের দাসদের বা অন্য কোথাও কি মশলার বিনিময়ে মুক্তি দেওয়ার সুযোগ আছে?

মোজাম্বিক কিংবা মোগাডিসু বা মাম্বাসায় আছে কিনা জানে না সেই প্রাচীন, তবে ভারত সাগরে সোনা ছাড়াও, টাকা ছাড়াও বন্দির পরিবর্ত যে মশলা বা অন্যকিছু নয়, এ কথা মানুয়েল জোর দিয়ে বলতে পারে না।

কিন্তু হুগলি, চাটগাঁ হয়ে দেয়াং, দেয়াঙ্গা বা দিয়াঙ্গা, যা আসলে দেবনগর বা দেবাঙ্গন, পৌঁছে অ্যাবরেনানশিয়াস অনেক কিছুই শিখে এবং বুঝে গিয়েছিল। সেই বুড়ো মানুয়েলের কথার মধ্যে অনেক কিছুই ছিল। দেখতে দেখতে, শিখতে শিখতে এক সময় তার মনে হয়েছিল গির্জাই তার উপযুক্ত স্থান। গির্জার এলাকাই তো শিক্ষার এলাকা, এমনকী গির্জার বিরুদ্ধতার যে শিক্ষা, তার জন্মও তো হয়েছে গির্জাতেই বহুলাংশে। কাজেই অ্যাবরেনানশিয়াস প্রথমেই দিয়াঙ্গার উপাসনাগৃহে থিতু হবার চেষ্টা করল।

উনিশে কার্তিক, শুক্রবার ইগনেশিয়াস ডি সিলভা ছ-জন সহকারী নিয়ে সোহাগপাশায় মিরবহর ইউসুফ জাহাঙ্গিরের কাছে যাত্রা করল। জলপথে পাঁচ ক্রোশ রাস্তা পার হবার সময় তার মনে হল যেন তারা জনমানবহীন এক নিঝুম দেশের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। নদীঘাটে কোথাও কোনো মানুষ নেই। কোনো নদীতে একখানা নৌকাও তারা দেখতে পেল না। নদী সংলগ্ন গ্রামগুলোর বাড়িঘরে জীবনের কোনো লক্ষণ নেই, কোথাও রান্নার ধোঁয়া উঠতে দেখল না তারা। মানুষ তো নেইই, ইগনেশিয়াস ডি সিলভা গোরু-বাছুর বা ছাগল-মুরগি পর্যন্ত দেখল না কোথাও। কদাচিৎ কোনো গ্রামে নিঃসঙ্গ একটি দুটি কুকুরের কান্না, যাকে স্থানীয়রা কুয়ইল দিয়ে কাঁদা বলে, ইগনেশিয়াসের মতো শক্ত হৃদয়ের সৈনিককেও ভারাক্রান্ত করছিল। শুধু ধু-ধু নদী, দুপাশে প্রাচীরের মতো সব গাছপালা, মাঝেমধ্যেই দু'একটি সদ্য পরিত্যক্ত গ্রাম।

ইগনেশিয়াস ডি সিলভা দূর থেকে আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে দেখে শঙ্কিত হয়ে বন্দুক হাতে উঠে দাঁড়াল। মগেরা কি এলাকা ছেড়ে এখনো চলে যায়নি? এমন অবশ্য হওয়ার কথা নয়। গতকাল তারা যে চারটি গ্রাম লুঠ করেছে, তাতে আশাতীত সাফল্য পেয়েছে। তাছাড়া সোহাগপাশার এত কাছে বেশি সময় ধরে থাকার মতো নির্বুদ্ধিতা তারা করবে না।

দূর থেকে ইগনেশিয়াস দেখল নদীতীরে ছ-সাতজন মানুষ একটি মৃতদেহ দাহ করছে। ইগনেশিয়াস ডি সিলভার যুদ্ধযান দেখবামাত্র জ্বলন্ত চিতা ফেলে শ্মশানযাত্রীরা ঊর্ধ্বশ্বাসে সংলগ্ন বনের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইগনেশিয়াস ডি সিলভার কোশা সোহাগপাশার ঘাটে গিয়ে লাগল সূর্য ডোবার কিছু আগে। থানাদার ইউসুফ জাহাঙ্গির গতকালের আঁধারমানিক এবং ধাত্রীনগরের মগ আক্রমণ সম্পর্কে গুপ্তচর মুখে খুব ভাসা ভাসা প্রাথমিক সংবাদ পেয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সে ইগনেশিয়াসের অপেক্ষায় আছে।

থানাদার ভারী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। বস্তুত, শায়েস্তা খাঁর সুবাদার হয়ে ঢাকায় আসার পর থেকে মগ এবং ফিরিঙ্গিরা বেশ কিছুটা সংযত হয়েছে। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম আরাকানের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব মিরজুমলাই হয়তো আগে বুঝেছিল।

শায়েস্তা খাঁর শাসনে প্রদেশের সাধারণ মানুষের মনেও এক ধরনের স্বস্তি ফিরে আসছিল। এরকম সময়ে থানাদার ইউসুফ জাহাঙ্গির যে কিনা এতদঅঞ্চলের মিরবহর রূপেও পরিচিত এবং মেঘনার ইলশা-তেঁতুলিয়া অঞ্চলে যার থানা, সে এত অসতর্ক কীভাবে হল যে মগ সঙ্গে একখানা পর্তুগিজ জাহাজ নিয়ে দশ-বারো ক্রোশ ভিতরে ঢুকে চার-পাঁচটি গ্রাম লুঠ করে গেল। এসব প্রশ্ন উঠবেই এবং মিরবহরকে ঢাকায় সুবাদারের কাছে জবাবদিহিও করতে হবে। চার-পাঁচটি গ্রাম লুঠ হয়েছে এবং পঁচিশ-ত্রিশজন মানুষকেও বন্দি করে নিয়ে গেছে মগেরা।

নদীর ঘাট থেকে দু'জন সহকারীসহ ইগনেশিয়াস থানাদারের তাঁবুর কাছে এল। সুজা বাদশার নবাবি আমলে তৈরি বাড়ির ভিতরে একটা প্রশস্ত খোলা জায়গায় তাঁবুতে ইউসুফের দফতর বসে।

ইগনেশিয়াস তাঁবুর সামনে আসতেই দ্বাররক্ষক বলল, 'সাহেব তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

ইগনেশিয়াস ডি সিলভা তাঁবুর বনাত সরিয়ে দেখল আরো তিনজন পদস্থ সৈনিকের সঙ্গে ইউসুফ জাহাঙ্গির উঁচু জাজিমের উপরে বসে।

সে প্রথমে ইউরোপীয় ভঙ্গিতে জঙ্গি অভিবাদন করল, তারপরে মুসলমানি প্রথায় নিচু হয়ে সম্মান জানাল।

ইউসুফ জাহাঙ্গির ইগনেশিয়াসের কাছে ধাত্রীনগরের লুণ্ঠন বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ শুনল। এর আগেই অবশ্য নদীপথে চলাচলকারী একজন মোগল বণিকের কাছে হরিণঘাটা নদীতে মগের বহর ঢোকার সংবাদ পেয়েছিল থানাদার। এই বিস্তীর্ণ নদী-মেখলা গ্রামাঞ্চলে মগ কখন, কোথায় কীভাবে হানা দেবে, আগে থেকে অনুমান করা কখনোই যাবে না। এই মুহূর্তে প্রদেশের মসনদে শায়েস্তা খানের মতো কুশলী সেনানায়ক এবং প্রশাসক। সুজা বাদশার আমলের সুদিনের পর বাংলার মানুষ আবার সুদিনের সম্ভাবনা দেখছে শায়েস্তা খানের আমলে। এহেন সময়ে মগের হানাদারি কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।

ইউসুফ খান বলল, 'আপনার অধীনে পঞ্চাশ জন সিপাই আছে। কোশা আছে দশখানা। ছোট বড় মিলিয়ে পনেরো-বিশ খানা অন্য নৌকা আছে। এতসব সত্ত্বেও মগ হানা দিয়ে লুঠ করে নিয়ে গেল!'

ইগনেশিয়াস চুপ করে রইল। নিজেই নিজের কাছে ছোট হয়ে আছে।

অস্বস্তি এবং হতাশা প্রবল। চোখ তুলে খানের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না সে।

'কোন রাস্তা দিয়ে ঢুকল মগ? চুপ করে আছেন কেন? জবাব দিন,' খান গর্জন করে উঠল।

আরো তিনজন সহকারী দারোগা একপাশে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। ইগনেশিয়াস বুঝল ইতিমধ্যেই এদের জবাব দেওয়া হয়ে গেছে।

সে বলল, 'লালদিয়া দিয়ে ঢুকেছে হুজুর, তারপরে বিঘাই নদী ধরে ভিতরে এগিয়েছে। ঠিক কোন্ পথে তারা আয়লা নদীতে পড়ল, ঠিক বুঝতে পারছি না। আয়লা হয়ে শেষে আঁধারমানিক, হুজুর।'

খান বলল, 'মিরজাগঞ্জ, গুলসাখালি, ওসব জায়গায় তো আপনার চৌকি আছে? কেউ কিছু টের পেল না!'

ইগনেশিয়াস বলল, 'বিঘাই বিশাল নদী, চওড়ায় কোথাও তো একক্রোশ, সওয়াক্রোশ হতে পারে হুজুর। তাছাড়া সুন্দরবন এগিয়ে এসে ফেলে যাওয়া বসতি গ্রাস করেছে। বিঘাই দিয়ে সারা দিনে দুশো নাও যাতায়াত করে। পাঁচজনের চৌকি থেকে সব দিক খেয়াল রাখা—'

ইউসুফ জাহাঙ্গির এসব জানে। তবুও ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'কাজটা স্ত্রীলোক সরবরাহ করার মতো সহজ নয় জানি কিন্তু করতে হবে। সাতদিনের মধ্যে খবর চাই! মগের দালালদের ধরতে হবে। মগের ঘাঁটি কোথায় জানতে হবে।'

ইগনেশিয়াস অধোবদনে বলল, 'হুকুম!'

ফৌজদারের ইঙ্গিতে চার সহকারী তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এল। অপমানে ইগনেশিয়াসের নাককান ঝাঁঝাঁ করছিল। কারো সঙ্গে আর কথা না বলে সে সোজা এসে তার কোশায় উঠল। ইউসুফ জাহাঙ্গির কম কথা বলা কাজের মানুষ। আগের আমলের হারুন-অল-রসিদের মতো প্রাণখোলা এবং প্রেমিক নয়। হারুনের সুন্দরী স্ত্রীলোক সম্পর্কে দুর্বলতা ছিল। কারই বা থাকে না। সেই দুর্বলতার সূত্র ধরে জলবেদেদের অধিনায়কত্ব ছেড়ে ইগনেশিয়াস আজ মোগল ফৌজের অধীন সহকারী দারোগা।

শায়েস্তা খান প্রবল অরাজকতার মধ্যে সুবার শাসনভার গ্রহণ করে। প্রয়াত মিরজুমলার মতো খানও বণিক থেকে রাজনীতিক এবং রণকুশলী সেনাপতিও। হারুন সুজা বাদশাহের আমলের লোক ছিল। কিন্তু শুধু সে

কারণে নয়, উঁচুতে সামরিক-রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলে স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক নীচ পর্যন্ত তার রেশ পরে। এমনটা হওয়াই শুধু রেওয়াজ নয়, রাজনৈতিক নিয়মও। উপরন্তু হারুন আবেগপ্রবণ হৃদয়বান মানুষ ছিল। টাঁড়া থেকে জাহাঙ্গিরনগরে ফিরে এসেও সুজা বাদশার স্বস্তি ছিল না। বিজয়ী সেনাপতি মিরজুমলা প্রায় ঘাড়ের উপরই নিশ্বাস ফেলছে। বাদশা আরাকানে আশ্রয় নেওয়ার ব্যবস্থা করে ভালোয়া এবং লক্ষ্মীপুর হয়ে প্রথমে সমুদ্র, পরে নদীপথে রোসাঙ্গ পৌঁছাল। হারুন সুজা বাদশার ঘনিষ্ঠ ছিল। জঙ্গলবাড়ির মনুর খাঁ দেওয়ানের নবপরিণীতা স্ত্রী সোনাইয়ের রূপে মুগ্ধ সুজা যখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী দেওয়ানকে হত্যার জন্য সমগ্র পূর্ববঙ্গের নদীপথ দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল তখন তার সঙ্গে চল্লিশ জন বাছাই বীরপুরুষ সহকারী ছিল। এই চল্লিশ জনের একজন হারুন।

হারুন জানত সুজা বাদশার ঘনিষ্ঠ মানুষ বলে পরবর্তী প্রশাসন তাকে হটিয়ে দেবে, এমনকী প্রাণেও মারতে পারে।

ফলে তার নিজের দপ্তরের শ'খানেক রণতরী এবং হাজার খানেক সৈনিক নিয়ে চাঁদপুরে এসে সে সুজার সঙ্গে মিলিত হয় এবং আরাকান যাত্রা করে।

ইগনেশিয়াস-ডি-সিলভা এবং তার স্ত্রী আউলাকেশি ডি সিলভা হারুনকে তার পছন্দের স্ত্রীলোক সংগ্রহ করে দিয়েছিল। হারুন গরিব ব্রাহ্মণ ঘরের এই সুন্দরী মেয়েটির রূপের কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিল এবং নদীতে স্নান করার সময় একদিন দেখে ফেলে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

ইগনেশিয়াস এবং আউলাকেশি মেয়েটিকে প্রলোভন দেখিয়ে ঘর থেকে বের করে আনে এবং হারুনের কাছে পৌঁছে দেয়।

এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ হারুন ইগনেশিয়াসকে তার প্রশাসনিক এলাকার একটি অংশে সহকারী দারোগা নিযুক্ত করে।

ইগনেশিয়াস এবং আউলাকেশি, হারুন-অল-রশিদ এবং সিন্ধুবালা নামের সেই যুবতী, যাকে তারা হারুনের অন্দর মহলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল এবং পরে যার নাম হয় দরিয়া বিবি, তাদের কারো কোনো সংবাদ আর পায়নি। নিঃসন্দেহে সুজা বাদশার যে পরিণতি হয়েছিল তাদেরও তেমনই হয়েছিল।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে যাওয়া নদীর বুকে দৃষ্টিকে মেলে দিল ইগনেশিয়াস। একটা বাঁক ঘুরলে দূরে কিছু একটা দেখে সন্দেহ হওয়াতে পাশে রাখা দূরবিন তুলে চোখে বসাল সে। একখানা বড় নৌকা,

নৌকাখানা কোশা এবং কোশাখানা যুদ্ধযান। আরো পরিষ্কার হতে ইগনেশিয়াস বুঝল কোশার কামান দু'টির উপরে কিছু দিয়ে ঢাকা দেওয়া। কামান ঢাকা কেন! নৌকাখানা হঠাৎ যেন ইগনেশিয়াসের কোশাকে দেখতে পেল এবং দ্রুত পিছিয়ে পাশের একটা খালে ঢুকে গেল।

ইউসুফ জাহাঙ্গির প্রকারান্তরে তাকে অকর্মণ্য বলেছে। ইঙ্গিতে স্ত্রীলোকের দালালও যেন প্রায় বলে ফেলেছিল। এতবড় একটা বর্ধিষ্ণু অঞ্চল লুঠ করতে মগ-ফিরিঙ্গিরা দল বেঁধে এসেছিল অথচ সহকারী দারোগার কাছে কোনো খবর ছিল না। একি বিশ্বাসযোগ্য কথা? জাহাঙ্গির তাকে পরিষ্কার জানিয়েছে, সে যে ফিরিঙ্গি, শাহি দপ্তরে এ বিষয়ে কিন্তু কথা ওঠে, একথা যেন ইগনেশিয়াস ভুলে না যায়। এক সপ্তাহের ভিতর বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করতে হবে, স্থানীয় যেসব চরেরা মগের হয়ে গোপনে কাজ করে, তাদের শনাক্ত করতে হবে।

ইগনেশিয়াস কোশার পাটাতনে উঠে দাঁড়াল। নৌকা পালায় কেন? সব কটা পাল খাটিয়ে দেও! জোরসে বৈঠা মরো! খবরদার হাঁকো!

খবরদার! খবরদার! শাহি ফৌজের আদেশ, নৌকা থামাও, খবরদার!

১২

কোনো কোনো মানুষের স্মৃতির সঞ্চয়, অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি শুধু নিজেকে নিয়েই নয়। সোহাগ-পাশা-দক্ষিণের সহকারী দারোগা যার উপরে সোহাগপাশা থেকে ইলশার মোহানা পর্যন্ত আইন-শৃঙ্খলা নজরদারি এবং শত্রুর, এখানে মূলত মগ এবং ফিরিঙ্গি দস্যু, আক্রমণ প্রতিহত করার প্রাথমিক ব্যবস্থা, সেই ইগনেশিয়াস ডি সিলভা তার উপরওয়ালার কাছে তিরস্কৃত হয়ে তার কোশায় করে ফিরে আসছিল। সে কোনোদিন পর্তুগাল

তো দূরের কথা, গোয়াতেও যায়নি। এমনকী সে তার বাবার কর্মক্ষেত্র দিয়াঙ্গাও কখনো চোখে দেখেনি। তার বাবা লোকটা স্বপ্নদর্শী ছিল এবং বাধ্য শ্রোতা পেলে অনবরত কথা বলত। তার এক বড় বোন ছিল মারিয়া ইনিস। সে প্রায়শই তার ভাইয়ের ভাবালুতা যুক্ত কথাবার্তার মধ্যে বাধা দিত। বলত, ভাই, তুই অন্তত বাবামায়ের ছোটবেলার কাহিনিগুলো নিজের বলে চালাস না। তখন লজ্জা পেলেও পরে ইগনেশিয়াস বুঝেছিল যে মানুষের যাবতীয় অভিজ্ঞতাই যৌথ। ফলে একই কথা বহু বার বলাতে শৈশব থেকে কৈশোরে পৌঁছানোর মধ্যেই ইগনেশিয়াস তার বাবার অভিজ্ঞতা এবং পৃথিবী সম্পর্কে যাবতীয় ধ্যান ধারণার পুরোটাই উত্তরাধিকারের মতো অর্জন করে নিয়েছিল।

অ্যাবরেনানশিয়াসের দিয়াঙ্গা পৌঁছাতে এক বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। লিসবন থেকে তাদের জাহাজ ছেড়েছিল সেপ্টেম্বর মাসে। নাবিকদের আশা ছিল পথে যত বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন এপ্রিল মে মাসের মধ্যে অর্থাৎ ভারত সাগরে মৌসুমি বাতাস উত্তরপুবে বইতে শুরু করার আগে তারা সন্দ্বীপ পৌঁছে যাবে। সেবাস্তিয়ান গনজালেস তার মাতৃভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত হোক কিংবা অন্য কোনো দুরভিসন্ধিতেই হোক লিসবনে তিন গ্যালিয়ন চাল পাঠিয়েছিল। এ ব্যাপারটা শুধুমাত্র একটা নমুনা। সেবাস্তিয়ানের দরকার ছিল গোয়ার পর্তুগিজ প্রশাসকের সহায়তা। সে গোয়ার প্রধানের কাছে আবেদন করল যদি আরাকানরাজের সঙ্গে যুদ্ধে গোয়ার পর্তুগিজরা তাকে যথার্থ সহায়তা করে, তাহলে সন্দ্বীপ পর্তুগালের করদ হবে এবং সেক্ষেত্রে বছরে পুরো এক বহর গ্যালিয়ন চাল সে পর্তুগালে পাঠাবে। ইউরোপে সবার তাক লেগে যাবে।

এই তিন জাহাজ চাল খুব অল্প সময়ের মধ্যে এবং নিরাপদে পর্তুগালে পৌঁছালে সেবাস্তিয়ান লিসবনে এবং গোয়াতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠল। যে দেশে ফিউডালগো জমির ফসলের দশ ভাগের একভাগ থেকে কখনো-কখনো আধাআধি পর্যন্ত খাজনা নেয়, সে দেশের রাজাপ্রজা সবাই সন্দ্বীপের এই চাল পেয়ে বছরে বহর ভর্তি গ্যালিয়ন বা তারও বেশি চাল পাবার সম্ভাবনায় যে পাগল হবে সে তো স্বাভাবিক। পর্তুগালের বারো-চোদ্দ লক্ষ মানুষের সংবৎসরের খোরাকি আর কত হবে? সন্দ্বীপের সঙ্গে সেবাস্তিয়ান

ততদিনে বাকলার কাছ থেকে শাহাবাজপুর এবং পটেলডাঙা ছিনিয়ে জুড়ে নিয়েছে। ইউরোপীয়ারা ততদিনে জেনে গেছে সন্দ্বীপে মাটিতে বীজ ছড়িয়ে দিলেই ফসলের ভারে গাছ নুয়ে পড়ে। শাহাবাজপুরের জমির উর্বরতাও তার থেকে কম নয়।

অ্যাবরেনানশিয়াস যখন দিয়াঙ্গার গির্জায় পৌঁছায় আরাকানের রাজা তখন মিনয়াজাগ্যি সালিম শাহ শ্বেত গজেশ্বর। চারটি শ্বেত হস্তীর আসল মালিক ছিল পেগুর রাজা ন্যানডা বায়েনিং। মিনয়াজাগ্যি এই শ্বেত হাতির লোভেই পেগু আক্রমণ করে এ চারটি হাতিসহ রাজকন্যা সিনডোনং, রাজপুত্র মেং শোয়ে প্রু, আরো একজন রাজপুত্র এবং কয়েক হাজার তেলেইং সেনা বন্দি করে। এইভাবে মিনয়াজাগ্যি সালিম শাহ শ্বেত গজেশ্বর হল।

মিনয়াজাগ্যির সঙ্গে পর্তুগিজদের সম্পর্ক ভালো ছিল। শ্বেত গজেশ্বর উপাধি ব্যাপারটায় পর্তুগিজদের মজা লেগেছিল। বিস্মিতও হয়েছিল তারা। সুসজ্জিত দুশো হাতির সামনে সোনা রুপায় মোড়া চার-চারটি শ্বেত হস্তীর শোভাযাত্রা দেখে স্তম্ভিত অ্যাবরেনানশিয়াসকে এক ইস্পাহানি সমুদ্র সৈনিক বলেছিল, 'আরো কিছু দিন এ দেশে থাকলে আরো অনেক কিছু দেখতে পাবে। এই মগগুলোর মতো বজ্জাত এবং বিশ্বাসঘাতক মানুষ পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাবে না। ও হাতিগুলো সব রং করা। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় কাছে গিয়ে একবার চেটে দেখতে পার। দেখবে তেতো তেতো লাগবে।'

অ্যাবরেনানশিয়াস লোকটার কথা বিশ্বাস করল না। সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল সাদা ঘন করে জাল দেওয়া দুধের রঙের হাতি। রং দিয়ে এমন চেহারা করা যায় না। রাজার নতুন পদবি 'শ্বেত গজেশ্বর' তাকে আরো মুগ্ধ করল। ইউরোপে তারা 'সিংহহৃদয়' কিংবা 'ভয়ংকর' এসব উপাধিধারীদের কথা শুনেছে। কিন্তু 'শ্বেত গজেশ্বর' তো ইউরোপে কল্পনাই করা যায় না। তার গির্জার সঙ্গী একজন দেশি খ্রিস্টান সন্তদাস তাকে বলল অন্য কথা। শ্যাম দেশের জঙ্গলেই নাকি পাওয়া যায় সাদা হাতি। শুধুমাত্র শ্যামের জঙ্গলেই এবং সেও কদাচিৎ। আর এই হাতির জন্য শ্যাম, কম্বোজ, পগাঁ, পেগু, প্রোম, আরাকান ইত্যাদি রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে।

কিন্তু শোভাযাত্রা দেখে গির্জার আবাসে ফিরে অ্যাবরেনানশিয়াসের মাথায় সেরভেন্তেসের ডন কিহোতার কথা জেগে উঠেছিল। সেরভেন্তেস

এসব আড়ম্বর নিয়ে কী যেন সব কথা বলতে চেয়েছেন। ভালো বোঝেনি সে কিন্তু ইউরোপের নাইটদের শিভালরি, ডন কিহোতার ক্রমাগত যুদ্ধ আর পরাজয় এবং রাজা মিনয়াজাগ্যি সলিম শাহ্‌ শ্বেত গজেশ্বরের এই দু'জোড়া সাদা হাতি, এসবের মধ্যে সেরভেন্তেসে নিশ্চয়ই কোথাও একটা সাযুজ্য খুঁজলে পাওয়া যাবে। লিসবন ছেড়ে আসার সময় তার সংগ্রহের বইগুলো সে নিয়ে এসেছিল। ডন কিহোতা আরো একবার ভালো করে পড়তে হবে, অ্যাবরেনানশিয়াস ভাবল। কিন্তু শ্বেত-গজেশ্বর কিংবা শ্বেত-রক্ত-গজেশ্বর বা আরো কাব্যিক ধবল-অরুণ-মাতঙ্গেশ্বর তার মাথা থেকে সরে গেল না।

রাজা পর্তুগিজদের সে-সময়ে চট্টগ্রামের দেবগ্রাম, সন্দ্বীপ ও আরাকানের সিরিয়ামে উপনিবেশ স্থাপন করতে দিয়েছিল। অ্যাবরেনানশিয়াসের স্থান হল দেবগ্রাম বা দিয়াঙ্গার গির্জায়।

গির্জা নামে মাত্রই। পদাধিকারীদেরও তেমন কোনো তর-তম নেই। একজন বৃদ্ধ যাজক আছে, সেই সর্বাপেক্ষা প্রবীণ। তাকে সবাই পাদরি মেনজেস বলে ডাকে। পাদরি মেনজেস ছাড়া গির্জাতে আরো পাঁচজন যাজক আছে। এরা সবাই মিলে খ্রিস্টীয় সংস্কারের কাজকর্ম করে মূলত নিজেদের বোধবুদ্ধিমতো। দশ-বিশ বছর ধরে যে স্ত্রী-পুরুষ যৌথ জীবনযাপন করছে, একত্রে পাঁচ-ছজন সন্তানের জন্য দিয়েছে, হঠাৎ তাদের শুভবুদ্ধি উদয় হতে পারে বা পাপভয়ে ক্রমশ জবুথবু হয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একদিন কারো কাছে শুনল যে, গির্জায় এমন মানুষের জন্যও ব্যবস্থা আছে। কাজেই সপরিবারে একদিন তারা উপস্থিত হয়, যৌথ জীবন এবং সহবাসকে বৈধ এবং ধর্মসঙ্গত করে, সংস্কার হয় তাদের সন্তানদের বাপ্তিস্ম করিয়ে। তারা পুরোপুরি খ্রিস্টান হয়। পাপ ভয় কখন কাকে ধরবে, কেউ জানে না।

একথা অ্যাবরেনানশিয়াসকে বলেছিল পাদরি মেনজেস। তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ভারতবর্ষে ইউরোপ থেকে যারা আসে, তারা কারা জান?'

'কারা?'

'মানুষের অবয়বে যারা শয়তান অথবা মানুষবেশী শয়তান, যারা ওখানে ভয়ংকর কোনো পাপকর্মের ফলে দণ্ডিত, দু-কান কাটা সমাজ লাঞ্ছিত, সমাজ পরিত্যক্ত যেসব মানুষের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, জানোয়ারের স্বভাবের মানুষ যারা কোনোদিন সংশোধিত হবে না বলে নিজেরাই বুঝতে পারে, লাম্পট্য করে প্রচুর ভোগ এবং অনুতাপহীন কদর্য

জীবন যাদের লক্ষ্য, তারাই এদেশে আসে।'

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে বৃদ্ধ হাঁফাতে থাকে। তার হাঁপানি রোগও আছে। সেই টানের মধ্যেই দমের শেষপ্রান্তে গিয়ে হঠাৎ ক্রুদ্ধ জিজ্ঞেসা ছুড়ে দেয় অ্যাবরেনানশিয়াসের দিকে।

'তুমি এসেছ কেন?'

'দেশে থাকলে না খেয়ে মরতে হত,' ভয়ে ভয়ে উত্তর দিয়েছিল সে।

'খাওয়ার জন্য যাজকের বৃত্তি!'

পাদরি মেনজেস কুটিল চোখে তাকে দেখতে থাকে। দম না ফেলেই বলতে থাকে, 'স্পেন পর্তুগালের বহু ক্যাথিড্রালে তোমার মতো সুন্দর চেহারার যুবকের জন্য শুধু খাওয়া নয়, খাওয়া, নেশা, স্ত্রীলোক, পুরুষ যৌনসঙ্গী, তুমি যা চাও তাই পেতে। এদেশে তোমাকে আসতে কে বলল?'

অ্যাবরেনানশিয়াস ভয় পেয়ে নতুন অভ্যাস করা বুলিটা অসচেতন অবস্থাতেই বলে ফেলল। বলল, 'মাতা মেরির জয় হোক।'

পাদরি মেনজেসও পুরোনো অভ্যাসমতো পাদপূরণ করল। বলল, 'যিনি পাপ ছাড়াই গর্ভধারণ করেছেন। কিন্তু অ্যাবরেনানশিয়াস এদেশে কয়েক বছর থাকলে আমার মতো তুমিও হয়তো বিশ্বাস হারাতে শুরু করবে।'

'বিশ্বাস?'

'হ্যাঁ খ্রিস্টীয় বিশ্বাস। পাপ ছাড়াই মেরির গর্ভধারণ ব্যাপারটা আদৌ সম্ভব কিনা অথবা সন্তানধারণের ব্যাপারটা আদৌ পাপ কিনা।'

'ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মেনজেস বলল, 'আমার অনুমান এবং হিসাব যদি ভুল না হয়, অ্যাবরেনানশিয়াস, তাহলে একশো বছরের উপরে পর্তুগিজরা ভারত সমুদ্রের উপরে কর্তৃত্ব করছে। এই বাংলা উপসাগরেও পর্তুগিজদের উপস্থিতি ওই একশো বছর পেরিয়ে না গেলেও, কাছাকাছি তো হবেই। কিন্তু কতজন অন্ধ পুতুল পূজককে আমরা খ্রিস্টান বিশ্বাসের আদর্শে দীক্ষিত করতে পেরেছি? কতজন মুরকে?'

পর্তুগিজদের কাছে সব মুসলমানই মুর। সে মুসলমান যদি বাঙালিও হয় তাহলেও পর্তুগিজ তাকে মুর বলবে। অ্যাবরেনানশিয়াস এখন পর্যন্ত এমন একজন খ্রিস্টানও দেখেনি যে আগে মুসলমান ছিল।

পাদরি মেনজেস বিরক্তি এবং অভিমানে অ্যাবরেনানশিয়াসের মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ঠোঁট ও চোখের কুঞ্চনে নিজের হতাশা প্রকাশ করতে লাগল। শেষে যেন 'কী হবে এসব কথা বলে' ভেবে শান্ত হয়ে গেল একেবারে।

অ্যাবরেনানশিয়াস বলল, 'দয়াময় আমি আপনার কাছে শিক্ষাপ্রার্থী। এদেশে ভাতের খোঁজে এসেছি বটে কিন্তু আমি খ্রিস্টের সেবক হয়েই জীবন কাটাতে চাই। আপনি এ দেশ সম্পর্কে সবকিছু জানেন, বোঝেনও। অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার শিষ্য হবার সুযোগ দিন।'

মেনজেস নিজের ভিতরে আরো যেন খানিকটা গুটিয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, 'ওসব দয়াময়-টয়াময় বোলো না আমাকে। ওসব শুনলে কি জানি কখন হয়তো নিজেকে লিসবন, নিদেন গোয়ার বিশপ ভাবতে শুরু করব। আমি একজন গরিব পাদরি।'

১৩

আউলাকেশি তার বাড়ি সংলগ্ন পুকুরঘাটে এসে একখানা ছোট ডিঙি নৌকায় উঠে বসল। সে স্ত্রীলোক হয়েও একা একাই যত্রতত্র ঘোরাফেরা করে। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাকে যেমন সাহসী করেছে, তেমনি করেছে সংস্কার মুক্ত।

পুকুরের পশ্চিমদিকের একটি নালা পুকুরকে যুক্ত করেছে একটি খালের সঙ্গে। দেশের এই অঞ্চলে প্রায় প্রতি বাড়িতেই অর্থাৎ যাদের বাড়ি বড় খাল বা নদী থেকে দূরে, তাদের এই ব্যবস্থা থাকে।

আউলাকেশি পুকুর থেকে নালা বেয়ে খালে এসে পড়ল। হাত দশ-পনেরো চওড়া খাল এখন জোয়ারের জলে ভর্তি। দু'পাশের গাছপালা ঝোপজঙ্গল ঝুঁকে এসেছে খালের ওপর। অন্যমনস্ক আউলাকেশির মাথায়

মুখে গাছের ডালের ঝাপটা এসে লাগছিল, ঝুঁকে পড়া লতাপাতা শরীরের ঊর্ধ্বাংশে ঝাঁট দিয়ে যাচ্ছিল।

আউলাকেশি নির্জন খাল ধরে বড় নদীর অভিমুখে যাচ্ছে। জীবনের নানা নালা, খাল বেয়ে সে যেমন আজকের জীবনে এসে পৌঁছেছে। স্মৃতির আলো-আঁধারিতে নিমগ্ন আউলাকেশির সেই কিশোরী বয়সের কথা মনে পড়ল। চট্টগ্রাম বন্দরে হরেক রকমের এবং হরেক রঙের মানুষ। আরাকান রাজ সুধম্মার শাসনকাল তখন। চট্টগ্রাম আরাকানের অধীন প্রদেশ, শাসনকর্তা সুধাম্মার কাকা মেংগ্রি। বন্দর চট্টগ্রামের সমৃদ্ধি সারা পৃথিবী জানে। পর্তুগিজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ, চিনা, মোগল, ইত্যাদি বণিকদের শয়ে শয়ে জাহাজ বন্দরে আসা-যাওয়া করে সারা বছর। পুবে ওলন্দাজদের অধিকার বাটাভিয়া পর্যন্ত। আরো পুবে মালয়, আচে, কেডা, পেরাক, জোহর এইসব বন্দরে বন্দরে বিদেশিদের বাণিজ্যে সে সময় লক্ষ্মীর বসত। সমৃদ্ধ চট্টগ্রাম ধনৈশ্বর্যে ফুলেফেঁপে উঠছে। বন্দরের বাজারে নিত্যনতুন উৎসব, নিত্যনতুন উত্তেজনা এবং মজা।

আউলাকেশি এসবের মধ্যে বড় হয়ে উঠতে শুরু করল। বড় হতে হতে বাকলার নোহালিয়া গ্রামের কথা সে ভুলে গেল। ইতিমধ্যে মারিয়া ল্যাবোর্ডে এবং চম্পা মাগদালেনের সহায়তায় তাকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হল। মাসকারহেনা এবং চম্পা মাগদালেনের কোনো সন্তান ছিল না। মাসকারহেনা যখন তাকে দাস বাজার থেকে কিনেছিল চম্পার বদমেজাজের খ্যাতি সত্ত্বেও মনে মনে ভেবেছিল আউলাকেশিকে তারা সন্তান হিসাবে দত্তক নেবে। তার মনে হয়েছিল চম্পার খিটখিটে মেজাজের একটা কারণ হয়তো তার সন্তানহীনতা। কিন্তু চম্পা তাতে রাজি হয়নি। তাকে কোনো মুসলমান পির বলেছিল যে ঈশ্বরের কৃপায় সময়মতোই তার সন্তান হবে। চম্পা সেই আশ্বাসে আউলাকেশিকে দত্তক নিতে রাজি হয়নি। কিন্তু দত্তক না নিলেও এই অসামান্য সুন্দরী মেয়েটির প্রতি তার স্নেহ জন্মেছিল। আসলে আউলাকেশিকে দেখলে যে কোনো মানুষই ভালোবেসে ফেলে। রগচটা চম্পাও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

পনেরো-ষোলো বছরের ইগনেশিয়াস তাদের মনিবের বাড়িতে এই নতুন মানুষটি আসার ব্যাপারটা খেয়াল রেখেছিল। সামান্য আলাপ-পরিচয়ের পরেই সে আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করল, কেমন এক ধরনের দায়িত্ব যেন সে বোধ করতে শুরু করেছে মেয়েটি সম্পর্কে। তাদের মনিববাড়িতে

বহুমানুষের আনাগোনা। প্রথম সুযোগেই আউলাকেশিকে এইসব লোকজনের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে সতর্ক করেছিল সে। কিছুদিনের মধ্যেই তাকে বন্দরের জাহাজঘাটা এবং বাজারের অলিগলি সব চিনিয়ে দিয়েছিল ইগনেশিয়াস। শিখিয়েছিল চেহারা এবং বেশভূষা দেখে চিনতে কোন লোকটা আরবি, কে আর্মেনি। চিনা এবং আরাকানিদের চেহারায় তফাত কী! পর্তুগিজ, ইংরেজ, দিনেমার কিংবা ওলন্দাজদের চেহারা এবং সাজপোশাকের বৈশিষ্ট্যই বা কীরকম এবং কার কেমন চরিত্র।

কিন্তু ব্যাপারটা এক-দেড় বছরের মধ্যেই অন্য রকম হতে শুরু করল। আউলাকেশির বারো বছর বয়স পার হতেই মারিয়া তার বাইরে বেরুনো বন্ধ করে দিল। মগের মুলুকে এমন সুন্দরী মেয়ে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় না। এমনকী ইগনেশিয়াসের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ কমই হতে লাগল। ফলে ইগনেশিয়াস আউলাকেশির প্রতি অন্য ধরনের আকর্ষণ টের পেতে শুরু করল। সারাদিনে আউলাকেশিকে দু-একবার না দেখতে পেলে তার বুকের মধ্যে দুঃখ এবং ক্ষোভ গুমরে উঠত। মা মারিয়া ল্যাবোর্ডে এবং মনিবানি চম্পা মাগদালেনের উপরে কারণে অকারণে ক্রোধ জন্মাত। এভাবে একটা অস্পষ্ট সম্পর্ক বছরখানেক চলার পর ইগনেশিয়াস এবং আউলাকেশির মধ্যে একটা অঘোষিত বোঝাপড়া তৈরি হল। তাদের ভিতরে রহস্য এবং গোপনীয়তা জন্মাল।

চট্টগ্রাম প্রদেশ তথা চট্টগ্রাম বন্দরে অশান্তি লেগেই থাকত। আরাকানরাজ মিনখা মৌং-হোসেন শাহের আমলে মোগলদের সঙ্গে বারবার যুদ্ধ হত। পর্তুগিজদের স্বপ্ন ছিল চট্টগ্রাম পুরোপুরি দখল করে তারা সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করবে। রাজা মিনখামৌং নিজের শক্তি বৃদ্ধি এবং মোগলদের প্রতিহত করার জন্য চারবার পশ্চিমে অভিযান করে। তার ছিল দশলক্ষ সৈন্য, দেড় হাজার রণহস্তী, দশ হাজার রণতরী এবং অসংখ্য কামান। তার বাহিনীর ক্ষিপ্রতা এবং দুর্দান্তপনার খ্যাতি ছিল। রাজা দু'বার মোগল এলাকা ভুলুয়া, একবার ফরিদপুর এবং একবার দক্ষিণ শাহাবাজপুর অভিযান করে। মোগলদের চট্টগ্রাম অধিকারের স্বপ্ন রাজা বারবার ব্যর্থ করে দেয়। এ অঞ্চলে মোগলদের থেকে তাদের শক্তি অনেক বেশি।

চট্টগ্রাম বন্দর শহরে এই সর্বদা সন্ত্রস্ত রাজনৈতিক এবং সামরিক পরিবেশে ইগনেশিয়াস এবং আউলাকেশি বড় হয়ে উঠল। ফকিরের দেওয়া তসবি গলায় পরেও চম্পা মাগদালেনের সন্তান হল না। ক্রুদ্ধ স্ত্রীলোকটি

একদিন পিরের ডেরায় গিয়ে তসবি ছিঁড়ে তার মুখের উপর ছুড়ে ফেলে দিল। এতে পিরের খাদেমরা উত্তেজিত হয়ে চম্পা মাগদালেন এবং তার দুই দেহরক্ষী পুরুষসঙ্গীকে আক্রমণ করল। চম্পা স্বয়ং অত্যন্ত অপমানিত এবং আহত হল। তার সঙ্গীদের প্রচণ্ড আহত করে তবে ছাড়ল পিরের লোকজন।

চট্টগ্রাম যদিও আরাকান রাজ্যের এলাকা কিন্তু সেখানে মুসলমানের সংখ্যাই সর্বাধিক। কাজেই পিরের সমর্থনে লোক বেশিই ছিল। চম্পা মাগদালেন সংকর খ্রিস্টান। তার উপরে তারা আবার পর্তুগিজ গোষ্ঠীভুক্তও নয়। কাজেই কোনোভাবেই তাদের সমর্থনে লোক দাঁড়াল না।

অপমানিত এবং আহত চম্পা মাগদালেন বাড়িতে এসে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করল। মাঝেমধ্যে গোসা ঘরে ঢোকার বাতিক তার ছিল। কোনো অনুরোধ নির্দেশ সে কানে তুলল না। এভাবে দু'দিন যাবার পর মাসকারহেনো মারিয়া ল্যাবোর্ডেকে বলল, 'তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ। না হলে দরজা ভেঙে ফেলতে হবে।'

মারিয়া যে এ দু'দিন চেষ্টা করিনি, তা নয়, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। সে আরো কতক্ষণ দরজা ধাক্কাধাক্কি করল এবং অনেক অনুনয়-বিনয় করল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষে অ্যাবরেন্যানশিয়াস একটা বুদ্ধি বার করল। সে দরজার কাছে গিয়ে খুব কেজো গম্ভীর গলায় বলল, 'ডনা চম্পা, আমাদের মালিক ডন মাসকারহেনোকে অতিসত্বর নোয়াখালি যেতে হবে। নোয়াখালির তাফাল থেকে লোক এসেছে। মোগল সুবেদার ইসলাম খাঁ রাঙামাটি সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ করেছে। যে কোনো সময় যুদ্ধ বেঁধে যাবে। এহেন সময়ে আপনি যদি এখানকার দায়িত্ব না নেন, তাহলে তো আমরা ভেসে যাব।'

এমন দীর্ঘ ভূমিকার পরও যখন দরজা খুলল না, তখন লোকজন ডেকে দরজা ভাঙা হল। অন্ধকার ঘরখানায় পা রাখতেই সাপের ক্রুদ্ধ ফোঁস ফোঁস শোনা গেল। প্রবেশকারী সভয়ে বাইরে এসে মশাল জ্বালিয়ে ভিতরে আলো ফেলল। চক্রধর একটি জাতসাপ অবরুদ্ধ ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একপাশে মাদুরের উপরে শোয়া চম্পা মাগদালেনের দেহে যে প্রাণ নেই তা দূরের থেকেই বোঝা গেল। তার হাতের কাছে সাপের ঝাঁপিটাও খোলা অবস্থায় ছিল। সবার খেয়াল হল তিন-চার দিন আগে জলবেদেরা এসেছিল সাপ খেলা দেখাতে।

খাল থেকে গাঙের প্রশস্ত মুখ দেখতে পেল আউলাকেশি। চম্পা মাগদালেন ছিল সেই জাতের মানুষ যারা বাঁচতে জানে না। সে যে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিল সে কথা ভাবতেই এখন অবাক লাগে আউলাকেশির। সদা বিরক্ত, সদা বিমর্ষ চম্পা যেন পরপারের জন্য নির্দিষ্ট হয়েই ছিল। বস্তুত সে যখন গোপনে বেদে স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে সাপটা কিনে রেখেছিল, তখন পর্যন্ত তার একটা আলো-আঁধারি পরিকল্পনা হয়তো ছিল। তখনো তো সে পিরের লোকদের হাতে নিগৃহীত হয়নি। নিগ্রহ একটা উপলক্ষ্য হল। আউলাকেশি শুনেছিল এর আগেও সে নাকি দু-দুবার আত্মহত্যার প্রচেষ্টা করেছিল।

মাসকারহেনা দরজা খোলার জন্য চম্পা মাগদালেনকে যেসব কথা বলেছিল, তার মধ্যে খুব একটা মিথ্যা ছিল না। সত্যসত্যই চট্টগ্রামে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল। সম্রাট জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে যুবরাজ শাহজাহানের বিদ্রোহের সময় বাংলাদেশে মোগল বাহিনীর ভিতরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে আরকানরাজ সুধম্মা-সলিমশাহ সেনাবাহিনী নিয়ে ঢাকা শহরে প্রবেশ করে। দুই মোগল সেনাপতি মোল্লা মুরশিদ এবং হামিদ হায়দার দুর্দান্ত মগদের আক্রমণে আতঙ্কিত হয়ে নগর ছেড়ে পালিয়ে যায়। সুধম্মার বাহিনী তিনদিন ধরে রাজধানী ঢাকা নগরে লুণ্ঠন, খুন, ধর্ষণ চালিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ এবং অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ-বালকবালিকা অপহরণ করে নিয়ে যায়। সুধম্মা সলিমশাহ খুব অকারণে ঢাকা আক্রমণ করেনি। মোগল সুবেদারের প্ররোচনায় চট্টগ্রামের বারোজন সামন্ত একযোগে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। রাজা বিদ্যুৎ বেগে চট্টগ্রামে এসে সেই বিদ্রোহ দমন করে এবং প্রতিশোধ নিতে ঢাকা পর্যন্ত এগিয়ে এসে মোগল প্রাদেশিক রাজধানীকে তছনছ করে দেয়।

কিন্তু রাজা সুধম্মার রাজত্ব এত শক্তি সামর্থ্য সত্ত্বেও বেশিদিন স্থায়ী হল না। বাইরের পৃথিবীর এত বড় শক্তিশালী রাজা অন্দরমহলের খোঁজ ঠিকভাবে রাখেনি। তার রানি নাৎসিনম মন্ত্রী নরপতিগির সঙ্গে গোপন প্রণয়ে আবদ্ধ ছিল। এই দুই প্রণয়ী চক্রান্ত করে রাজা সুধম্মাকে খুন করল। নরপতিগি সিংহাসন দখল করলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ভূতপূর্ব রাজার কাকা মেংগ্রি বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করল। ওদিকে আরাকানে

সুধম্মার শিশুপুত্র মিনসানিকে সিংহাসনে বসিয়ে একটা শেষ চেষ্টা হল বংশের হাতে সিংহাসন রক্ষা করার। মিনসানির অভিষেকের আঠাশ দিনের মাথায় নরপতিগি শিশুকে হত্যা করে সিংহাসনে বসল। মেংগ্রিকে দমন করবার জন্য নরপতিগি শেষে চট্টগ্রাম বন্দর অবরোধ করে সমানে কামান দেগে গেল। আরাকানরাজ্যের নৌশক্তির খ্যাতি দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সবারই জানা ছিল। মেংগ্রি বাধ্য হয়ে নোয়াখালির যুগদিয়ার মোগল ঘাঁটিতে আশ্রয় নিল।

আরাকানের এই গৃহযুদ্ধের অবসরে আউলাকেশির বয়স পৌঁছে গিয়েছিল ষোলোতে এবং ইগনেশিয়াসের কুড়িতে। চট্টগ্রামে হানাহানি কাটাকাটি এবং গুপ্তহত্যা লেগেই ছিল। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ইত্যাদি গোষ্ঠীর বণিকরা কখনো শুধুই ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে থাকে না। প্রয়োজনে শুধু নয়, সুযোগ পেলেই তারা দস্যুবৃত্তি এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করত। যুদ্ধবিদ্যাটা তাদের ভালোই জানা ছিল। দুর্দান্তপনাতেও তাদের জুড়ি মেলা ভার। কয়েক বছর আগে সন্দ্বীপের যুদ্ধে ধনেপ্রাণে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া পর্তুগিজরা যে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, এমন কথা কেউ চিন্তাই করেনি। শতাব্দীর প্রথম দশকে আরাকানরাজ বাকলার রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পর্তুগিজদের উৎখাত করার জন্য একত্র হয়। প্রথমে আরাকান উপসাগরের সিরিয়াম ও দিয়াঙ্গার পর্তুগিজ উপনিবেশ ধ্বংস করা হয়। পর্তুগিজদের বাণিজ্য কুঠি, গির্জা, ঘরবাড়ি সমস্ত ধ্বংস করে কচুকাটা করা হয় তাদের। মারিয়া ল্যাবোর্দে এবং অ্যাবরেনানশিয়াস সেই উপদ্রবের মধ্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এবং আরো অনেকের সঙ্গে নৌকায় পাড়ি দিয়ে সন্দ্বীপে আসে।

সন্দ্বীপে পর্তুগিজদের বড়সড় উপনিবেশ ছিল। জলদস্যুতা এবং বোম্বেটেগিরিতে পাকাপোক্ত পর্তুগিজ নৌসেনাদের দলপতি ছিল কার্ভালো। আরাকানরাজ দিয়াঙ্গার পর্তুগিজ উপনিবেশ ধ্বংস করার প্রতিশোধে কার্ভালো চট্টগ্রামের বন্দর অবরোধ করে প্রায় ধ্বংস করে দেয়। এই যুদ্ধে চট্টগ্রামের আরাকানি শাসনকর্তা সেনাবাদি নিহত হয়। এইভাবে সিরিয়াম ও দিয়াঙ্গার পর্তুগিজ উপনিবেশ ধ্বংসের বদলা নিল কার্ভালো। সারা বাংলা উপকূল ধরে তখন তিমিতিমিঙ্গিলতন্ত্র। কিছুদিনের মধ্যেই ফতে খাঁ নামক একজন যুদ্ধ ব্যবসায়ী নিজেকে মোগল নৌবাহিনীর একজন অধিনায়ক এই

পরিচয় দিয়ে সন্দ্বীপ দখল করে নিল। সন্দ্বীপ দখল করে সময়ের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে পর্তুগিজদের উৎখাত করে দ্বীপের শাসনকর্তা হয়ে বসল সে। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিতাড়িত পর্তুগিজ এবং বোম্বেটেরা দিয়াঙ্গা ও চট্টগ্রাম থেকে ওড়িশা পর্যন্ত উপকূল অঞ্চলে এবং কখনো কখনো বিশ-ত্রিশ ক্রোশ অভ্যন্তর অঞ্চলে পর্যন্ত ডাকাতি, জাহাজলুঠ, জলদস্যুবৃত্তি, মানুষলুঠ ও চুরি ইত্যাদি যাবতীয় অপরাধ কর্মের মাধ্যমে একটা সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করল। এই গোষ্ঠীর নেতা ছিল সেবাস্তিয়ান গনজালেস এবং গোবিনহা। আরাকানরাজ মিনয়াজাগ্যি একবার চট্টগ্রাম বন্দরের অদূরে অবস্থানরত এই জলদস্যুদের প্রায় ছয়শো সৈন্যসহ অনেকগুলো যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করে দিলেও অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে গনজালেস সন্দ্বীপ অবরোধ করে দখল করে এবং ফতে খাঁকে হত্যা করে কার্যত সন্দ্বীপের রাজা হয়ে বসেছিল।

অ্যাবরেনানশিয়াস মারিয়া ল্যাবোর্ডেসহ এই সন্দ্বীপেই আশ্রয় গ্রহণ করে। একদিন দূর থেকে সেবাস্তিয়ান গনজালেসকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে যায়। এই সেই ব্যক্তি যার নাম সে লিসবন থাকতেই শুনেছিল। এই সেই ব্যক্তি বন্ধু যার নামে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বীর, বুদ্ধিমান, সুদর্শন এই পর্তুগিজ যে প্রতিভাশালী, তা তাকে দেখে যে কোনো লোক বলে দিতে পারবে। অ্যাবরেনানশিয়াসের মনে হয়েছিল রাজা হওয়ার উপযুক্ত বটে সেবাস্তিয়ান।

তারা সন্দ্বীপের গির্জাতেই আশ্রয় নিয়েছিল। যদিও অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা ইতিমধ্যেই তারা পার হয়েছে। কিন্তু এখনো শরীর থেকে লিসবনের গন্ধ যায়নি। একদিন সদলবলে গনজালেস গির্জায় এল। অ্যাবরেনানশিয়াস পড়বি তো পড় একেবারে আচমকা তার সামনে। গনজালেস দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল তার দিকে।

'পর্তুগিজ?'

'হ্যাঁ সিনোর!'

'কবে এসেছ?'

'বছর দুয়েক সিনোর।'

'কোথায় বাড়ি ছিল?'

'সেন্ট অ্যান্টনি ডেল টোরজাল সিনোর।'

সেবাস্তিয়ানের চোখ কুঞ্চিত হল। ছোকরা চালবাজি করছে না তো?

মাত্র দু'বছর হল এদেশে এসেছে, তার নিজের কতদিন হল? বিশ-পঁচিশ বছর নিশ্চয়ই হয়ে গেছে। এখন খ্রিস্টীয় কত সাল? মনে মনে সে হিসাব করে দেখল সালটা ১৬১০। তাহলে সে সেই অ্যান্টনি ছেড়েছিল মাত্র বাইশ বছর আগে। সে তারিখটা তার অবশ্য মনে আছে। ১৫৮৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সে সেন্ট অ্যান্টনি থেকে বেরিয়েছিল। গোয়ার উদ্দেশে জাহাজে চেপেছিল এর নয় দিন পরে ১৮ সেপ্টেম্বর। সেবাস্তিয়ানের একবার ইচ্ছা হল ছোকরাকে গ্রামের কথা দু'একটা জিজ্ঞেস করে। বাপ-মায়ের কথা দু'একটা মেয়ের কথা। পরক্ষণেই চমক ভাঙল তার। পাগল! সেসব মেয়ে এতদিনে বুড়ি হয়ে গেছে নির্ঘাত।

গির্জার পাদরি বেরিয়ে এসে তাকে একেবারে রাজকীয় অভিবাদন করল। সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক এবং দু'টি তরুণ বয়সের ছেলেমেয়ে। তাদের চেহারায় মগ বৈশিষ্ট্য অ্যাবরেনানশিয়াসের চোখেও ধরা পড়েছে। এরা চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা আনাপুরমের বিধবা এবং তাদের ছেলেমেয়ে। সেবাস্তিয়ান তাদের নিয়ে এসেছে খ্রিস্টান বানাবার জন্য। তার মাথায় অনেক পরিকল্পনা।

পাদরির কাছে সে বলল, 'এরা আরাকানের রাজা মিনখামৌংয়ের নাতিনাতনি আর ইনি এদের মা প্রয়াত রাজপুত্র আনাপুরমের বিধবা। এরা তিনজনেই স্বেচ্ছায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে। এদের এখানে রেখে গেলাম। আপনার যা যা করণীয়, করবেন।'

একটু দূরে জনাদশেক দেহরক্ষী ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অ্যাবরেনানশিয়াসকে ইঙ্গিতে কাছে আসতে বলে ঘোড়ার দিকে হাঁটতে হাঁটতে গনজালেস জিজ্ঞেস করল, 'ঘোড়া ছোটাতে জান?'

'না সিনোর!'

'তরোয়াল?'

'না সিনোর!'

'তা হলে মরতে এদেশে এসেছ কেন?'

লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে শূন্যে চাবুক আস্ফালন করল গনজালেস। উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করল না সে। তার দেহরক্ষীরা তার আগেপিছে ঘোড়া ছুটাল।

অ্যাবরেনানশিয়াস এদেশে এসেছিল খেয়েপরে বাঁচতে। এই দু'বছরেই তার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে বুঝেছে মরাটা এদেশে কোনো ব্যাপারই নয়। সে ধীরে ধীরে প্রার্থনা ঘরের দিকে এগুল।

পাদরি সেবাস্তিয়ানের নিয়ে আসা রাজার নাতি নাতনি এবং তাদের মাকে ধর্মকথা শোনাবার আয়োজন করেছে। অ্যাবরেনানশিয়াস জানে ক'দিন আগেই চট্টগ্রামের শাসক আনাপুরমকে বিষ খাইয়ে খুন করেছে সেবাস্তিয়ান। এখানে কোনো কথাই গোপন থাকে না। গোপন রাখার চেষ্টাও কেউ করে না। চক্রান্ত এবং গোপন খুন, প্রকাশ্য যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, শত্রুতা এবং মিত্রতা ভারত সাগরের ঢেউয়ের মতোই সতত আবর্তিত হতে থাকে। কোনো শক্তিই মুহূর্তের জন্য স্বস্তিতে থাকতে পারে না। আরাকানরাজ মিনয়াজাগ্যির মৃত্যুর পর রাজা হল তার জ্যেষ্ঠপুত্র মিনখামৌং। মিনখার সঙ্গে তার ছোটভাই আনাপুরমের সম্পর্ক ভালো ছিল না। ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক পুরোপুরি শত্রুতামূলক হয়ে যাবে একথা অনুমান করে রাজা মিনয়াজাগ্যি আনাপুরমকে আরাকান থেকে সরিয়ে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা করে দিল।

মিনখা রাজা হয়ে দেখল চট্টগ্রামে আনাপুরম পর্তুগিজদের সঙ্গে দহরমমহরম চালিয়ে মহাশক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তার দেহরক্ষী বাহিনীতেই চারশো পর্তুগিজ। শাসনকর্তার প্রশ্রয় পেয়ে মেঘনার মোহনা থেকে চট্টগ্রামের উপকূল পর্যন্ত অঞ্চলে এই পর্তুগিজরা যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। এদের অত্যাচারে মোগল এবং আরবি সওদাগরের জাহাজ চট্টগ্রাম সমুদ্রে ভিড়তেই সাহস করছে না।

মিনখা এসব ঘটনায় শুধু যে বিরক্ত হল, তাই নয়, শঙ্কিতও হল। উপরন্তু পর্তুগিজদের সে ঘৃণা করত। যুবরাজ থাকাকালীন একবার বঙ্গোপসাগরে তার বহরকে ডিব্রিটো নামে এক জলদস্যু কাপ্তেন লুঠ করে এবং কিছু দিনের জন্য তাকে বন্দি করে রাখতেও সমর্থ হয় সেই ডিব্রিটো। মিনখা সে কথাও ভোলেনি।

চট্টগ্রামে পর্তুগিজদের আধিপত্য খর্ব করার জন্য মিনখা নির্দেশ দিলেও আনাপুরম সে নির্দেশকে বিশেষ পাত্তা দিল না। অবাধ্য আনাপুরমকে শায়েস্তা করার জন্য চট্টগ্রামে সৈন্য পাঠাল রাজা।

রাজকীয় বাহিনীর সামনে দাঁড়াতে না পেরে আনাপুরম সদলবলে সেবাস্তিয়ান গনজালেসের কাছে সন্দ্বীপে পালিয়ে গেল। সেবাস্তিয়ানের

অনেক রকমের উচ্চাশা ছিল। আরাকান থেকে বাকলা পর্যন্ত বিস্তৃত একটা পর্তুগিজ উপনিবেশ যে সম্ভব, সে স্বপ্ন সে এতদিনে ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে প্রকাশ্যেই দেখতে শুরু করেছিল। আনাপুরম সন্দ্বীপে আশ্রয় নিতে কয়েকদিন খুব পানভোজন চলল। তারপরে মৈত্রীর চিহ্নস্বরূপ আনাপুরমের এক বোনকে খ্রিস্টান বানিয়ে সেবাস্তিয়ান বিয়েই করে ফেলল।

সন্দ্বীপের গির্জা ঘরে তখন প্রায় প্রতিদিনই খ্রিস্টান হওয়ার অনুষ্ঠান। আনাপুরমের সঙ্গীসাথীদের অনুরোধ করে কিংবা লোভ দেখিয়ে খ্রিস্টানধর্মে দীক্ষা দেওয়া চলল বেশ কয়েকদিন।

কিন্তু এই প্রচেষ্টায় প্রথমেই আপত্তি করতে শুরু করে আনাপুরম নিজে। কিন্তু গনজালেসের মাথায় তখন পরিকল্পনা পাকা। সন্দ্বীপের জাহাজঘাটে আনাপুরমের নিজস্ব দু'খানা জাহাজে কী কী ধনরত্ন আছে, গনজালেসের ততদিনে সব জানা হয়ে গেছে। বহুপুরোনো এইসব রাজপরিবারের ধনৈশ্বর্যের কথা পর্তুগিজরা সবাই জানে। আনাপুরম খ্রিস্টান হতে আপত্তি করতে গনজালেস তাকে একদিন বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করল। ফলে আনাপুরমের ধনরত্ন, স্ত্রীপুত্রকন্যা সবই গনজালেসের হস্তগত হল।

যথাযথ শোকপালনের পর্ব শেষ করার আগেই সেবাস্তিয়ান তিনজনকে গির্জা ঘরে নিয়ে এল। সন্দ্বীপের পাদরি গনজালেসের থেকে কম স্বপ্ন দেখে না। সে যখন পর্তুগাল ছেড়েছিল দেশে তখন একের পর এক আকাশচুম্বিগির্জার পত্তন হচ্ছে। ভাগ্যের তাড়ায় সে যখন শেষ পর্যন্ত এসে সন্দ্বীপে পৌঁছেছে, তখন থেকেই মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করে আসছে একটা গির্জা তাকে বানাতেই হবে। চান্ডিকানে পর্তুগিজেরা ভালো গির্জা বানিয়েছিল। রাজা প্রতাপাদিত্য সে গির্জা ধ্বংস করে পর্তুগিজদের তাড়িয়ে দেয় ও হত্যা করে। গোয়ার মতো না হোক পোর্টো গ্রান্ডির বা চট্টগ্রামের মতো তো হতে বাধা নেই। এতদিনে তার স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়েছে। সেবাস্তিয়ান গনজালেস সন্দ্বীপের রাজা হয়েছে। প্রভূত ক্ষমতাশালী লোক সে। পাদরি তাকে বুঝিয়েছে যে শক্তিশালী গির্জা না থাকলে রাজ্যও কখনো শক্তিশালী হবে না। মনে হয়, কথাটা বুঝেছে সে। দলে দলে লোককে সে খ্রিস্টান করার জন্য নিয়ে আসছে। সেবাস্তিয়ান কথা দিয়েছে আর একটু সামলে নেওয়ার পর গির্জার বাড়ি তৈরি করার কাজে সে হাত দেবে। মাটির লম্বা ঘরের উপরে শনের চালা। ঘরখানা উত্তর

দক্ষিণে লম্বা। উত্তর দিকের দেয়ালে যিশুর একখানা এবং শিশু যিশুকে কোলে নিয়ে মেরির একখানা, মোট এই দু'খানা ছবি টাঙানো। দুই ছবির মাঝখানে একখানা কাঠের ক্রুশ। সামনের দিকে বেশ খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে দু'পাশে দু'সারি বসার আসন। ছাড়া জায়গায় অলটার। লম্বা ঘরখানার তিন দিক দিয়ে ঢোকার দরজা আছে।

আনাপুরমের বিধবা এবং তার দুই ছেলেমেয়ে সামনের দিকে আসনে বসলে পাদরি তাদের পরমেশ্বরের মহিমা বুঝাতে শুরু করল। পাদরির বুলিতে অশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ। ভঙ্গি কেতাবি। এই কেতাবি ভাষাও তৈরি করেছে পর্তুগিজ পাদরিরা। বাংলা ভাষাকে ব্যাকরণসম্মত রূপ দেবার একটা ঐক্যবদ্ধ প্রয়োগ পাদরিরা করেছে যার লক্ষ্য অবশ্যই খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার ও প্রসার। কিন্তু বাংলা ভাষা তাতে সমৃদ্ধ হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। অসংখ্য নতুন শব্দ পর্তুগিজ থেকে বাংলায় এসেছে। এই মুহূর্তেই বহু মানুষ জানেই না যে আচার, আতা, নোনা, ক্যানেস্তারা, আনারস, আলকাতরা, ক্রুশ, বিস্তি, গির্জা, চাবি, টোকা, পেয়ারা, পেঁপে এহেন শতাধিক শব্দ পর্তুগিজ ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে।

সে বলল, 'শুনিলাম রাজার ভাই তোমারে বিভাও করিতে রাজাবন্দ করিয়াছে। খ্রিস্তায়াঁ বিভার আগে কনফেসার করিবে। অধিবাস, সোহাগপানি, বাইসবিয়া যেমত হিন্দুরা করে—না করিবে।'

বিধবা বলল, 'আমি হিন্দু নই, আমি বৌদ্ধ।'

চট্টগ্রামে থাকার ফলে সে বাংলা মোটামুটি বলতে পারে।

পাদরি বলল, 'ছিলে কিন্তু তিন দিন আগে তুমি খ্রিস্তায়াঁ হইয়াছ। এখন রাজাবন্দ কারণ নিশানা বদল করিবে।'

বিধবা বলল, 'কিসের নিশানা?'

পাদরি বলল, 'রাজাবন্দর নিশানা, এহা আঙ্গুটি কি বা মালা হইতে পারে। আন্তেনিওঁ কহিবে ফলানা, আমি তোমাকে বিভাও করিব। তুমি কহিবে, আমি তোমার লগে বিভাও হইব। তা বাদে নিশানা বদল হইবেক।'

দুইজন খোজা প্রহরী বাঁ দিকের দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে এবং ভিতর দিকে নজর রাখছে। আনাপুরমের বিধবা বুঝল যে পাদরি সমস্ত চক্রান্তের খবরই রাখে বা সেবাস্তিয়ান তাকে আগে থাকতে তৈরি করে রেখেছে। গনজালেসের বাহিনীতে অনেকজন মগ কাপ্তান আছে, আছে মগ

সৈনিকও। যদিও তারা পেশাদার সৈনিক এবং মূলত দুর্বৃত্ত, তবুও সাবধানে পা ফেলতে হবে। সেবাস্তিয়ান ভাই অন্তোনিওর সঙ্গে আনাপুরমের বিধবার বিয়েটা সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারলে একটু নিশ্চিন্ত হত। আনাপুরমের বোনকে সেবস্তিয়ান নিজে ইতিমধ্যেই বিয়ে করে ফেলেছে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সেই রাজকন্যা সেবাস্তিয়ানের পাটরানির মর্যাদা আদায় করে নিয়েছে অথবা সেবাস্তিয়ান তাকে সেই পদ দিয়েছে। কী সাধারণ মানুষের সমাজে, কী রাজপরিবারে, মেয়েমানুষের কোথাও কোনো স্বাধীনতা নেই। তাদের মতামত, ভালোলাগা মন্দলাগাকে কেউ বিবেচনায় আনে না।

কিন্তু আনাপুরমের বিধবা কিছুতেই তার স্বামীকে, যে স্বামী তাকে এমন চমৎকার দু'টি ছেলেমেয়ে উপহার দিয়েছে, ভুলতে পারছে না। সে বলল, 'পাদরি মশাই, আন্তোনিওকে আমি এরকম কোনো কথা দিইনি কিংবা নিশানা বদলও করিনি। আমি বিধবা হিসাবে এই দু'টি ছেলেমেয়েসহ বাঁচতে চাই।'

পাদরি বলল, 'সাশানিয়া দেশে এক অকুমারী মাইয়া বড় ধনী আছিল। সেই মাইয়ায় এক সুন্দর গরিব পুরুষের লগে বিভাও হইবার কিরা করিল। সেই মাইয়ায় বাদে কিরা ভাঙ্গিল এবং আর এক পুরুষ বিভাও করিল। বিভাওর দিনে অনেক আনন্দ, নাচন-কোন্দন হইল। এহার মধ্যে দুই ভূতে সওয়ার ধরান করিয়া আসিল। দুই অচিনা ভূতে মাইয়ারে নাচাইল। লগে নিজেরাও নাচিল। নাচিতে নাচিতে সকলের সাক্ষাতে মাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। আর দিন দুই ভূতে সওয়ারের ধরান আসিয়া মাইয়ার পিন্ধন আনিয়া দিল। কহিল, এহি তোমার মাইয়ার পিন্ধন, মিথ্যা কিরা করিল, কিরার শাস্তি পাইল, নরকে গতি হইল।'

বিধবা বলল, 'পাদরিমশাই আমি কাউকে কোনো কথা দিইনি, কিরা তো দূরের কথা। আমি একজন অসহায় বিধবা। আমার স্বামী কয়েকদিন আগে নিহত হয়েছেন। তিনি কীভাবে নিহত হলেন তাও আমার কাছে পরিষ্কার নয়। তবে তিনি যে যুদ্ধে মরেননি, তা তো সবাই জানে। খ্রিস্তাং ধর্মে যদি আমাকে বিধবা হিসাবে বেঁচে থাকার অনুমতি দেয় তবে আমাকে সেই ব্যবস্থায় গতি করুন।'

বিধবা স্বয়ং রাজকন্যা এবং মহাপরাক্রমশালী রাজা মিনয়াজাগ্যির পুত্রবধূ। স্বাভাবিক ভাবেই সে রাজনৈতিক বুদ্ধিও ধরে। উপমহাদেশের উপকূলের রাজ্যগুলোর রাজনীতি এবং যুদ্ধবিগ্রহ, পরিবর্তন এবং রূপান্তর

সবই তার কিছু কিছু জানা আছে। আজকের রাজা মিনখা মৌং, আজকের সেবাস্তিয়ান গনজালেস কাল কোথায় থাকবে কেউ জানে না। আজ তার পুত্র ধর্মান্তরিত হয়ে হয়েছে মার্টিন, কাল যে সে ফের বুদ্ধকে শরণ করবে না, সে কথা কে বলতে পারে? এবং মার্টিন যে ধম্মমতিন হয়ে আরাকানের সিংহাসনে বসবে না, সে কথাও যুক্তিতর্কের খাতিরে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। বলল, 'ঠাকুর, সিদ্ধিক্রুশের চিহ্ন করি কপালে, মুখে এবং বুকে, আমাকে গির্জার ঘরে সেবিকা হবার অনুমতি এবং ব্যবস্থা করুন। আমি অকুমারী মারিয়া ঠাকুরানির সেবায় এবং প্রচারে জীবন অতিবাহিত করতে চাই। ঠাকুর আপনার খ্রিস্টের দোহাই।'

পাদরি দুঃখিনি বিধবার দুঃখে খানিকটা যেন বিগলিতও হল। বলল, 'তবে এখানে থাক। পরে রাজার সহিত কথা কহিব।'

মারিয়া ল্যাবোর্ডে এসব ঘটনার সাক্ষী ছিল। সে আনাপুরমের বিধবার মনের মধ্যে কী ছিল বুঝতে পারেনি। কিন্তু তার দয়া হয়েছিল। বিধবা যখন দেহে সিদ্ধিক্রুশের চিহ্ন আঁকছিল, সে অনুরূপ করছিল। পাদরির উপরে তার অঢেল কৃতজ্ঞতা ছিল। যুদ্ধ থাকলে অনাথ থাকবে। অনাথের বন্দোবস্ত গির্জা ছাড়া আর কে করবে। কাজেই সন্দ্বীপের গির্জাতেও অনাথালয়ের একটা কৈফিয়তের মতো নমুনা ছিল। খাওয়াপরার বিনিময়ে মারিয়া সেখানে পাদরির দয়ায় একটা কাজ সংগ্রহ করে নিয়েছিল।

আনাপুরমের বিধবা গির্জাতেই থাকল এবং কে জানে কীভাবে বেশ কিছু অলংকারও সে দান করল গির্জার উন্নতিকল্পে।

কিন্তু অ্যাবরেনানশিয়াস এবং মারিয়ার এই স্থিতিও দীর্ঘস্থায়ী হল না। কয়েক বছরের মধ্যেই সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে মগরাজা মিনখা মৌংকে মিত্রতা করতে হয়। মোগলরা যে কোনো মুহূর্তে চট্টগ্রাম ছিনিয়ে নিতে পারে, ভুলুয়া তো চলেই গেল। ফলে সেবাস্তিয়ানের সহায়তায় মিনখা মৌং চাঁদপুর থেকে ফেনী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল এবং জলপথ দখল করল। সেবাস্তিয়ান মগ নৌবাহিনীর কাপ্তেনদের পানভোজনের জন্য নিজের জাহাজে ডেকে এনে খুন করল। অনেককে বন্দি করে সন্দ্বীপে নিয়ে গিয়ে দাসবাজারে বেচে দিল। এই অভূতপূর্ব বিশ্বাসঘাতকতার প্রত্যুত্তরে মগরাজা সুযোগমতো ওলন্দাজদের সহায়তা নিয়ে সন্দ্বীপ আক্রমণ করে পর্তুগিজদের কচুকাটা করে। পর্তুগিজ

সেনাপতি মেনজেস নিহত হয়। সেবাস্তিয়ান গনজালেসের সম্পর্কে এর পরে আর কেউ কিছু শোনেনি। বাংলার উপকূল অঞ্চলে রাজত্ব করার যে স্বপ্ন পর্তুগিজরা দেখেছিল, তা চিরকালের মতো মিলিয়ে যায়। ভাগ্যের তাড়ায় অ্যাবরেনানশিয়াস মারিয়াকে নিয়ে এসে চট্টগ্রামে আশ্রয় পেল। ততদিনে সে মাসকারহেনার ব্যবসায়ে কর্মচারী হিসাবে যোগ দিয়েছে এবং মারিয়ার গর্ভে ইগনেশিয়াসের জন্ম হয়েছে।

আউলাকেশির চট্টগ্রাম জীবনের স্মৃতি এক বিশেষ কারণে ভারী মধুর। মাসকারহেনার বাড়িতে সে নিরাপত্তা যেমন পেয়েছিল, পেয়েছিল এমন একটা পরিবেশ যাতে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। উপরন্তু বয়ঃসন্ধির সময় আসার আগেই ইগনেশিয়াস গোপনে তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে অঙ্গীকার করে বসেছিল। বয়ঃসন্ধিতে দু'জনের সম্পর্কের বোধ্য এবং রহস্যময় আকর্ষণ মগকর্তৃক লুণ্ঠিত বালিকার ভিতরে নতুন করে জীবনকে উপভোগ করার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। আউলাকেশি প্রতিমুহূর্তে বিস্মিত হতে শুরু করেছিল, প্রতি মুহূর্তে তার অন্তরঙ্গ এবং বহিরাঙ্গের পৃথিবী নিজেকে উন্মুক্ত করে তাকে দেখাচ্ছিল এবং চেনাচ্ছিল নতুন নতুন অঞ্চল।

এইভাবে চার-পাঁচ বছর পার হবার পর মারিয়া ল্যাবোর্ডে মাসকারহেনার সামনে গিয়ে একদিন সরাসরি বলল, 'মালিক, আউলাকেশিকে আমরা পুতের বউ করতে চাই, আপনি ওকে আমাদের দান করুন।'

বাঙালেরা দাসদাসীকে ঘরের ছেলেমেয়ের মতোই দেখে। দাসদাসী কিংবা তাদের পুত্রকন্যার সঙ্গে ঘরের মানুষের বিয়েও অপ্রচলিত নয়। মাসকারহেনা কিংবা মারিয়া ল্যাবোর্ডের অভিজ্ঞতায় এ বিষয়টা নতুন এবং যেহেতু তাদের উভয়েরই মানসিক অভিব্যক্তি মানবিক, কোনো অসুবিধা হল না।

মাসকারহেনা উচ্চহাস্য করে এদেশি রসিকতা করল। বলল, 'তলে তলে তোমার এই বুদ্ধি—আমার বেয়ান হতে চাও! বেশ বেশ, খুব ভালো। কন্যাপণ কী দেবে?'

এক বুড়ি দাসী ছিল কাছাকাছি। সে বলল, 'আউলাকেশি আগে ছিল বাওনের মাইয়া। গায়ের রং দেখে বোঝেন যে তারা ছিল ধনী। ধনী উচ্চবর্ণের ঘরে কন্যাপণ নাই এ দেশে, বরপণ আছে। মাইয়ার পালতু বাপ

তো বেনে। মারিয়া বিবি উল্টা পণ চাইতে পারে।'

মাসকারহেনো তাকে কপট ধমক দিয়ে বলল, 'তুই মাগি থাম! আসছে এক সাউধের দালাল। মারিয়াবিবির সঙ্গে গোপনে কততে বখরা করেছিস এই বিয়ের ঘটকালি?'

এসব আনন্দের অভিব্যক্তি। বিয়ে এবং পরে সন্তান উৎপাদন এমন সব সামাজিক পারিবারিক আনন্দের অভিব্যক্তির জন্ম দেয়। সবাই মাতে।

কিন্তু মারিয়া ল্যাবোর্ডে তার নিজের বিয়ের বৃত্তান্ত স্মরণ করে কেমন বিহ্বল হয়ে গেল। সেসব কথা সে কিংবা অ্যাবরেনানশিয়াস কেউই আর নতুন করে মনে করতে চায় না। কিন্তু সেই ভয়ংকর দিনগুলো তো ভুলবার নয় কিছুতেই।

সন্দ্বীপের সঙ্গে বিরোধের পরিণতিতে দিয়াঙ্গা এবং সিরিয়ামের পর্তুগিজরা সম্পূর্ণ ধ্বংস। সেই বিরোধে আরাকানরাজ চট্টগ্রামের পর্তুগিজ উপনিবেশের বাণিজ্য কুঠি, কারখানা, দুর্গ এবং গির্জা প্রভৃতি সম্পূর্ণ দখল করে। পর্তুগিজরা দলে দলে নিহত হয় এবং বাকিরা যে যেখানে পারে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

এই নিহতদের মধ্যে ছিল বৃদ্ধ পাদরি মেনজেস। সে তার গির্জার অনাথ আশ্রম এবং প্রচারবেদী ছেড়ে কোথাও যাবে না বললে তরুণ অ্যাবরেনানশিয়াস অনাথ আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসিনী মারিয়া ল্যাবোর্ডের হাত ধরে এসে তার সামনে দাঁড়াল। বলল, যে কারণে এত দূরদেশে আমি এসেছিলাম তা আপনাকে বলেছি। এদেশে ইউরোপীয়রা ধনী হওয়ার জন্যে আসে। ধনী হওয়ার মতো সাহস কিংবা প্রতিভা, কোনোটাই আমার ছিল না। তাই আমি সে পথে যাইনি। এখানে এসে আপনার আশ্রয়ে স্বস্তি পেয়েছিলাম। আপনার কাছ থেকে দূরে যেতে হলে একজন সঙ্গী চাই। এই দূরবর্তী দেশে রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর বিবাহের কেলেঙ্কারিতে কারো কিছু যাবে আসবে না। আমি পবিত্র জল নিয়ে আসছি, করুণাময়, আপনি আমাদের বিবাহ সংস্কার করিয়ে দিন।

পাদরি মেনজেসের সেই শেষ সংস্কার।

আধঘণ্টার ভিতরে তৈরি হয়ে স্বামী-স্ত্রী-অ্যাবরেনানশিয়াস এবং মারিয়া অন্য অনেকের সঙ্গে একখানা জালিয়া নৌকায় সন্দ্বীপের পথে বেরিয়ে পড়েছিল। পিছনে মেনজেসের নিজের হাতে তৈরি অনাথ আশ্রম পড়ে রইল

তিপ্পান্ন জন শিশু এবং বালক-বালিকা নিয়ে। তারা হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সব জাতের অনাথ। মেনজেস তাদের এতকাল রক্ষা করেছে। জালিয়া নৌকায় যারা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সন্দ্বীপ যাচ্ছে, তাদের কারো সামর্থ্য নেই এই অনাথদের ভার বহন করে।

অ্যাবরেনানশিয়াস পরবর্তী জীবনে আর কোনোদিন জানতে পারেনি এই আটত্রিশ জন শিশু এবং পনেরো জন কিশোর-কিশোরীর শেষ পর্যন্ত কী পরিণতি হয়েছিল। কেননা সবাই জানত সব ফিরিঙ্গিই, সে সওদাগর হোক আর সৈনিকই হোক, আসলে জলদস্যু এবং দাস ব্যবসায়ী। এই ফিরিঙ্গিরাই মগদের লুটেরা, ধর্ষক এবং জলদস্যু বানিয়েছে। কাজেই এই তিপ্পান্ন জন যে সমুদ্রপারের দাস বাজারে, এমনকি মগদের নিজস্ব বাজারে ভালো দামে বিক্রি হবে, এতে আর সন্দেহ কী? মেনজেস কী করে আটকাবে? তার আয়ুই বা আর কত দিনের?

এইভাবে একদিন ষোলো বছরের আউলাকেশির সঙ্গে কুড়ি বছরের ইগনেশিয়াসের বিয়ে হয়ে গেল। আউলাকেশির নতুন পরিচয় হল আউলাকেশি ডি সিলভা। নতুন জীবন, মুক্ত জীবন, আনন্দ আর উত্তেজনায় ভরপুর জীবন শুরু করল আউলাকেশি। চট্টগ্রামের 'খ্রিস্তাং' সমাজে সুন্দরী হিসাবে এমন খ্যাতি ছড়াল তার যে খাঁটি ইউরোপীয় রক্তের সুন্দরীরাও তার রূপের কাছে ম্লান হয়ে গেল।

খালটির মুখের দিক ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছিল। অন্যমনস্ক থাকার কারণে আউলাকেশি প্রথমে খেয়াল করেনি। যেহেতু সময়টা জোয়ারের, কাজেই তাকে কখনো বৈঠা, কখনো লগি ঠেলতে হচ্ছিল। আচমকা নৌকাটা একবার ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করতে লগি ফেলে সে শক্ত হাতে বৈঠা ধরল। গাঙের মুখের বিস্তৃতি এখান থেকে স্পষ্ট। বৈঠা মেরে সে গাঙে এসে পড়ল। এবার তাকে যেতে হবে জোয়ারের সঙ্গে। ফলে বৈঠাটাকে শুধু গতিমুখ নির্ধারণের কাজে ব্যবহার করাই যথেষ্ট বিবেচনা করে সে স্থির হয়ে বসল।

সোহাগপাশার বন্দর সংলগ্ন অংশের বেশ খানিকটা তফাতে গোটা কয়েক শিরিষগাছের বিস্তারি ছায়ায় ইসমাইল সর্দারের বেবাইজ্যাবহর। আউলাকেশি ডি সিলভা ডিঙি নিয়ে সেই বহরের মধ্যে ঢুকল। কে একটা উটকো মেয়েমানুষ নাওয়ের আড্ডার একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়েছে এ

খবর সর্দারের কাছে নিমেষে পৌঁছে গেল।

সর্দার জানে কে আসছে। গতকাল দারোগা ইগনেশিয়াস সরকারি কর্তব্য হিসাবে তো বটেই, নিজের প্রাণের গরজে এসেও খোঁজখবর নিয়ে গেছে। সর্দার জানে যে আসছে, তার নাম আউলাকেশি ডি সিলভা। আউলাকেশি ডি সিলভার মতো রূপসী এবং সাহসী মেয়েমানুষ সে সারাজীবনে দেখেনি।

আউলাকেশিকে দেখে সে বিস্তৃত হাসল। বলল, 'এস বিবি, বস। কাল সাহেব এসেছিল। তাকে বললাম, মাস দুয়েক তার রাজত্বে থাকতে চাই। অনুমতি পেয়েছি।'

আউলাকেশির চোখে জল এসে গেল। খুব চাপা একটা অভিমান কোথাও লুকিয়ে আছে এখনো, সর্দারের কথায় যেন প্রকাশ পায় তা।

'কেমন আছ, সর্দার?'

'এই ব্যস আছি। তবে মনে হয় আর বেশিদিন নাই।'

সর্দারের শীর্ণ দেহে বয়স এবং রোগ স্পষ্ট।

কথা বলতে বলতে পুরানো পরিচিতেরা অনেকে এল। আউলাকেশির শরীর ও মনে আবেগ উথলে উঠল। জীবনের একটা ভয়ংকর সময়ে এই মানুষগুলোর সঙ্গে সে এবং ইগনেশিয়াস বেশ কয়েকবছর ছিল।

বস্তুত সেই কয়েকবছর এই দলের সঙ্গে ঘুরে না বেড়ালে তাদের হয়তো অস্তিত্বই এতদিনে বিলুপ্ত হত। সন্দ্বীপের পর্তুগিজ রাজ খতম হওয়ার পর থেকে মোগল-আরাকানি-ত্রিপুরি-অহোম নতুন করে আবার যুদ্ধ শুরু করল। সেই সব যুদ্ধের মধ্যে সব থেকে বড় যুদ্ধ ছিল মোগল আর আরাকানের মধ্যে চট্টগ্রামের দখল নিয়ে যুদ্ধ। মোগল বাহিনী অনেক চেষ্টা করেও চট্টগ্রাম দখল করতে পারেনি। আরাকানরাজ সান্দু-সুধর্মা-সুবর্ণপ্রাসাদ-অধীশ্বরের আমলে সম্রাট শাজাহানের পুত্রদের মধ্যে বিরোধ শুরু, যার পরিণতিতে মোগল সেনাপতি মিরজুমলার তাড়া খেয়ে সুজারাজাকে পালিয়ে যেতে হয় আরাকানে। বিশ্বাসঘাতকতা অথবা সুজার সংগ্রহের অগাধ মণিমুক্তার লোভে অথবা মোগল রাজপুত্রের নিজের তরফের কোনো ভুল চালে শেষ পর্যন্ত সপরিবারে তারা নিহত হয়।

এইসব রাষ্ট্রীয় হাঙ্গামার সামান্য আগে ইসমাইল সর্দার সোহাগপাশার গাঙে এসে তার যাযাবরি বহরের আড্ডা গেড়েছিল। সে সব খুব বেশি দিনের কথা নয়। সোহাগপাশার মোগল যুদ্ধবহরের সইরাল হারুন অল

রশিদ জলবেদেদের হাত-সাফাই, ভানুমতী, রংতামাসা, উদ্ভট জীবজন্তু, মানুষ এবং সাপের খেলা দেখে মুগ্ধ। হারুনের চরিত্রে বীরত্বের পাশাপাশি আমোদপ্রিয় একজন প্রেমিকের উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতো। মিঠা ও নোনা সাত ঘাটের জল খাওয়া ইগনেশিয়াস এবং আউলাকেশি হারুনের মতিগতির হদিশ পেয়ে ও নিয়ে একদিন সিন্ধুবালা নামের এক বামুনের বিধবা মেয়েকে তার বহরের কুমিরমুখী জলযানে তুলে দিয়ে পুরস্কার চাইল।

পুরস্কার জুটল বহরের একজন সহকারী দারোগার চাকরি। প্রায় সাত-আট বছরের জলবেদের জীবনের সমাপ্তি ঘটল তাদের। এই সোহাগপাশাতেই একদিন সর্দারের হাঁটু ছুঁয়ে অভিবাদন করে নেমে গেল তারা। সর্দার বলেছিল, 'জানি, তোমরা আমাদের সঙ্গে চিরকালের মতো থেকে যাওয়ার মানুষ নও। তবুও অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিলে। আবার কখনো আসব এই ঘাটে, আবার দেখা হবে।'

পৃথিবীর অধিকাংশ যাযাবর গোষ্ঠী একই পথ ধরে পরিক্রমা করে। এতদিন বাদে দল আবার ঘুরে আসাতে আউলাকেশি কেমন উতলা বোধ করল। আসলে পৃথিবীতে মানুষের গৃহস্থি তো যাযাবর জীবনের অস্তিমেই। সেই যাযাবরের রক্তসব মানুষের ভিতরেই আছে। সর্দারের সামনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে চোখ ভেজাল আউলাকেশি। কাপড়ে চোখ মুছে শেষে বলল, 'সেই দিনটার কথা মনে পড়ে যখন সাঁতরে আমরা দু'জনে তোমার নাওয়ে উঠেছিলাম।'

সর্দার চোখ কুঁচকে হাসল।

চট্টগ্রামে ব্যাপক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। পর্তুগিজদের সঙ্গে আরাকান রাজাদের ভাব-ভালোবাসা এবং হিংসাযুদ্ধ উভয়ই ছিল লাগাতার। আপাতশান্তির মধ্যে কখন যে হিংসা শানিয়ে উঠবে, আপাতযুদ্ধের মধ্যে কখন যে প্রেমপ্রীতি লতিয়ে উঠবে, কেউই হিসাব রাখতে পারত না। আসলে যুদ্ধটাই আসল। শান্তি শুধু পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি।

চট্টগ্রামের শুধু পর্তুগিজ নয়, বিদেশি বণিকদের মহল্লা আগুনে পুড়ে মাটিতে মিশে গেল। মগ হানাদারদের আক্রমণে পর্তুগিজরা বেশিরভাগ নিহত হল। তাদের মধ্যে অ্যাবরেনানশিয়াস এবং মারিয়া ল্যাবোর্ডে মাসকারহেনার কুঠিবাড়িতে আগুনে পুড়ে মরল। মাসকারহেনার হদিশ শেষপর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি। একখানা ফরিদপুরি গদু নৌকায় আশ্রয়

পেয়ে কিছু মানুষ দরিয়ায় ভেসে পড়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল ইগনেশিয়াস এবং আউলাকেশি। মগদের দু'খানা জাহাজ থেকে চারদিকে সন্দেহজনক কোনো জলযান দেখলেই গোলাদাগা হচ্ছিল। গদু নৌকার বৃহৎ আকৃতিতে তাদের সন্দেহ হয়। গোলা দেগে তারা নৌকা ডুবিয়ে দেয়। প্রায় ছ-সাত ঘণ্টা একখানা কাঠ ধরে ভেসে থাকার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে দূরে ইসমাইল সর্দারের অদ্ভুত আকৃতির নৌকাগুলো দেখতে পেয়েছিল তারা। ইসমাইলই তাদের উদ্ধার করে।

এতখানি রাস্তা উজান বেয়ে এসেছে আউলাকেশি। সারা শরীর ঘামে ভেজা। বলল, 'নিজের বাপ কেমন ছিল জানি না। বাপের তুল্য তুমি। তোমাকে ভুলব না। একবার নাসিরা আম্মার কাছে যাব, অনুমতি কর।'

সর্দার হেসে তাকে বিদায় দিল। আউলাকেশি নিজের নৌকায় ফিরে এসে আগের মতোই এ নাও ঠেলে, ও নাও ধরে জিজ্ঞেস করতে করতে নাসিরাবিবির নাওয়ে এল। নাওয়ে ওঠার আগে গলা তুলে জয়ধ্বনি দিল, 'জয় হোক মা মনসার, জয় হোক নাসিরা আম্মার।'

ছইয়ের নীচ থেকে একখানা হলুদবরণ মুখ উঁকি দিয়ে বলল, 'কেরে এমন অসময়ে জোকার দেয়?'

একটু সময়ের অপরিচয়ের কুয়াশা, তারপরে বৃদ্ধার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল, 'বিবি? আউলাকেশি?'

আউলাকেশি বলল, 'জ্বে, কেমন আছ ডাইনিবুড়ি?'

নাসিরা এই দলের সর্দারনি। যাবতীয় ভানুমতি, সাপ খেলার কৌশল, মারণ-উচাটন বশীকরণ ক্রিয়াকলাপের হোত্রী নাসিরা পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষাদাত্রীও বটে। সবই শেখায় কিন্তু ভাগ্যগণনার বিদ্যা সবাইকে শেখায় না সে। কেউ বলে সে ইসমাইল সর্দারের স্ত্রী, কেউ বলে সৎমা, কেউ বলে আসল মা, কেউ বলে বোন, কেউ বলে নাসিরার সঙ্গে ইসমাইল সর্দারের এই সব সম্পর্কই বিদ্যমান। কে জানে কী করে এসব হয়। তবে বেবাইজ্যারা জানে পৃথিবীতে না হওয়ার মতো কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

বৃদ্ধার কুঞ্চিত চোখে বাসি সুরমার নীল দিগন্ত রেখা যেন চামড়ার উপরে চিরকালের মতো বসে গেছে। দুই বাহুতে, বুকে উল্কি। গলায় বিচিত্র রঙের বড়মাপের পাথরের মালা একগন্ডা।

আউলাকেশি বলল, 'একটা বড় কাজের উদ্যোগ করেছি। অনেক বড়

কাজ। গুনে বলে দেও মনস্কামনা পূর্ণ হবে কী না।'

নাসিরা বলল, 'এক বড় কাজ করে আমাদের ছেড়ে চলে গেলি। আবার কী বড় কাজ করছিস?'

আউলাকেশি বলল, 'সে কথা এখন কাউকে বলা যাবে না। তোমাকেও না। শুধু বলে দাও সফল হবে কিনা।'

নাসিরা তার গুপ্তবিদ্যা শেখায় শুধু তার মেয়ে মুক্কিকে। তাকে ডাক দিয়ে বলল, 'আউলাকেশির কেশ এখন যেমন পরিপাটি তাতে একটাও উকুন পাবি কিনা সন্দেহ। জটির মাথা থেকে চারটে উকুন নিয়ে আয়।'

জটি দলের সব থেকে প্রাচীন জটাবুড়ি। মাথায় গোটা তিনেক পাথরের দলার মতো জটা, তাতে অজস্র উকুন।

মুক্কি বাঁ-হাতের তালুতে চেপে চারটে উকুন নিয়ে এসে আউলাকেশির ডান হাতে দিল। মুঠো বন্ধ করার আগে আউলাকেশি সভয়ে শিউরে উঠল। চালের দানার আয়তনের চারটে জন্তু হাতের তালুতে পড়েই হাঁটতে শুরু করল। আউলাকেশি হাত মুঠো করে চেপে রাখল তাদের।

একটা পোড়া মাটির সরা মিহি বালি দিয়ে ভর্তি। মুক্কি সরাটা নাসিরার হাতে দিলে নাসিরা বালির উপরে আউলাকেশির হাত চেপে ধরে গাঙের বিস্তৃতিতে চোখ রেখে খানিকক্ষণ বিড়বিড় করল। শেষে হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'ফেল জানোয়ারগুলোকে বালিতে।'

আউলাকেশি এ পদ্ধতি জানে। উকুন যদি বালির ভিতরে সেঁধিয়ে যায়, মনোবাসনা পূর্ণ হবে প্রার্থীর। আর যদি চিৎ হয়ে উকুন পা ছুড়তে থাকে, তবে কপাল খারাপ।

সে হাত উপর করে বালিতে উকুন ফেলল। ফেলার সঙ্গে সঙ্গে দুই জানোয়ার তরতর করে বালির ভিতরে ডুবে গেল। ফের ভেসে উঠল, ফের ডুবে গেল। অন্য দুটো চিত হয়ে পা ছুড়তে লাগল।

নাসিরা বলল, 'এবার বুঝে দেখ।'

আউলাকেশি বলল, 'কী?'

নাসিরা বলল 'আধাআধি। যা তোর বাসনা, তার আধাআধি পূরণ হবে। কোন আধা, আমি জানি না।'

আউলাকেশি একটু বিমর্ষ হয়ে ফিরে এল নিজের নৌকায়। আসার আগে বুড়ির পায়ের কাছে এক খুতি কড়ি রেখে এল।

ফেরার পথে ভাটা শুরু হয়েছে। ফলে বড় গাঙের ভাটিতে ডিঙ্গি তরতর করে চললেও খালের মুখে উলটো চাপে তাকে কসরত এবং শক্তিক্ষয় করতে হয়। মন তার চিন্তামগ্ন। ফলে ডিঙ্গি এদিক-ওদিক সরে যাচ্ছে বারবার। নাসিরা বলেছে, 'এবারে বুঝে দেখ,' বলেছে, 'আধাআধি।' তার মানে কী? আধাআধি কোনো সংকল্প বা বাসনার সমাধান হয় কি? দু'দিন আগে ওলন্দাজ জাহাজি ইয়েকব, কবিরাজ ক্ষেমংকর সেন, সে স্বয়ং এবং ইগনেশিয়াস বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ওলন্দাজ জাহাজে করে তারা ওড়িশার পিপলি বন্দরে যাবে। ইগনেশিয়াস চরমুখে খবর সংগ্রহ করেছে যে মগেরা একখানা পর্তুগিজ জাহাজে করে ধাত্রীনগরের লুণ্ঠিত বালক-বালিকা, স্ত্রীপুরুষ সবাইকে ওখানেই বিক্রি করবে। মগদের চরেরা দু-চারজন ধনী গৃহস্থের কাছে এসে গোপনে মুক্তিপণের পরিমাণও জানিয়ে গেছে। ক্ষেমংকর ধাত্রীনগর থেকে লুণ্ঠিত কয়েকজনকে, বিশেষ করে তার বন্ধুর কন্যা দু'টিকে উদ্ধার করে আনতে চায়। শুধু মাত্র মানবিক কারণে নয়, এদেশে সসম্মানে বাঁচতে হলে দয়ালহরিদের আঘাত করতে হবে। খর্ব করতে হবে তাদের ক্ষমতা, এমন ভেবেছিল সে। এই সংকল্পের একজন অংশীদার আউলাকেশি। কিন্তু নাসিরা অর্ধেকের বিচার করল কেন? হঠাৎ মনের গহন থেকে গোপন একটি আকাঙ্ক্ষা বুদবুদ তুলল। সে কখন যেন ভেবে রেখেছিল যা করতে চলেছে তাতে ক্ষেমংকরের সমাজচ্যুতি অনিবার্য। ক্ষেমংকরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে তাদের মেয়ে পাউলার সঙ্গে—। সে আচমকা ভারী বিমর্ষ হয়ে গেল।

১৩

সমুদ্রে সূর্য ডোবে আচমকাই কিন্তু তারপরেও দীর্ঘসময় ধরে মায়াময় আলোয় আলোকিত থাকে জলভাগ।

সূর্য ডোবার মুহূর্তে হরিণঘাটা নদীর মুখ থেকে সেই জালিয়া নৌকাগুলোর ছ-খানা বের হল যারা আঁধারমানিক ধাত্রীনগর ইত্যাদি গ্রামে হানা দিতে গিয়েছিল।

পাঁচখানা নৌকায় সশস্ত্র রক্ষী ছাড়া দুইভাগে ভাগ করা বন্দি। বন্দিদের হাতের তলা ফুটো করে সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে সরু বেত ঢুকিয়ে মালার মতো গেঁথে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা পালাবার চেষ্টা বা বেশি নড়াচড়া করারও চেষ্টা না করে। এইভাবে প্রতি মালায় চার-পাঁচ জন করে মোট ত্রিশ-বত্রিশজন বন্দিকে নৌকার খোলের মধ্যে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তিন দিন আগে এইসব মানুষকে গ্রাম থেকে লুঠ করে আনার পর মগের দলটা লালদিয়া, হরিণঘাটা ইত্যাদি নদী সংলগ্ন সুন্দরবনের চরায় লুকানো তাদের অস্থায়ী ঘাঁটিতে আশ্রয় নিয়েছিল।

দলটার মধ্যে বেশিরভাগই মগ। কয়েকজন পর্তুগিজ জারজও আছে। এই মুহূর্তে একজন হিন্দুও আছে যে ব্যক্তি লুঠের সময় এদের সঙ্গে ছিল না। এই লোকটির নাম যুগল সাধু। যুগলের গলায় তুলসীমালা আছে। এতে প্রমাণ হয় যুগল বৈষ্ণব। যুগল এই দলটি বা এরকম অন্য দলের সঙ্গে চুক্তিতে কাজ করে। যুগল সাধু উপকূল অঞ্চলের বণিক। সে স্বয়ং এবং তার চরেরা গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে খবর সংগ্রহ করে। সেসব শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয় নয়। ব্যবসা, বাংলা উপকূলের অশান্ত রাজনীতি এবং দস্যুবৃত্তির সমস্তরকম খবরের ব্যবসাও সে করে। কোন ঘরে কোন তারিখে বিয়েসাদি

লাগবে, কোথায় উৎসব শুরু হয়েছে, কার ঘরে সুন্দর ছেলেমেয়ে আছে, এইসব খবর। চাঁদপুরের ঘাটের কাছ তার একখানা দোকান এবং গুদামঘর আছে। চাল, ডাল, নারকেল, সুপারি, মশলা এবং দাসদাসী এসব হল যুগল সাধুর প্রকাশ্য ব্যবসা। কিন্তু চাঁদপুর বাজার এমন একটা জায়গা যেখানে ব্যবসা করা নানা কারণে ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়েছে। মগ, ফিরিঙ্গি তো আছেই, আছে আরো নানা রঙের বদমাস এবং পরজীবী মানুষ। এসবকে সন্তুষ্ট করে যদি তুমি চলতে পার, তাহলেই তুমি ব্যবসা করতে পারবে। কিন্তু এতসব উৎপাতকে সহ্য করে ব্যবসা করার উৎসাহ কয়জন মানুষেরইবা থাকে। কাজেই যুগল সাধুকে নতুন ব্যবসার কৌশল খুঁজে বার করতে হয়েছে। তার ধূর্তবুদ্ধি এবং সাহস ছিল বেশ জোরালো।

যুগল অবশ্য একবারও সর্বসমক্ষে তার মুখ দেখায়নি। তার নিজের একখানা সশস্ত্র কোশা আছে। কোশায় গোলাবর্ষণ করার জন্য দুটি কামানও বসানো আছে। মাঝি এবং রক্ষী-সহ যুগল সাধুর কোশায় বারোজন ভৃত্য আছে। এদের মধ্যে দু'জন মাঝি এবং দু'জন পেশাদার রক্ষী।

যুগল গত তিনদিন ধরে চারদিকে নদী, সমুদ্র এবং জঙ্গল ঘেরা গ্রামটাতে আছে। এই গ্রাম মগ এবং ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অত্যাচারে পরিত্যক্ত আরো বিশ-পঁচিশটি গ্রামের একটি। পশ্চিমের সুন্দরবন ক্রমশ এগিয়ে এসে একদা সমৃদ্ধ বর্তমানে পরিত্যক্ত এইসব গ্রাম গ্রাস করেছে। এই গ্রামটি, যার নাম এককালে ছিল ভাণ্ডার, এখন মগ-ফিরিঙ্গি এবং তাদের জারজদের অস্থায়ী আড্ডা। যুগল সাধু দেনাপাওনা এবং বন্দি স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যৌন মিলনের আকাঙ্ক্ষায় কখনো কখনো এখানে আসে।

এবারের ধাত্রীনগরের লুণ্ঠনের পিছনে বিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠা কন্যাটির প্রতি যুগল সাধুর আকর্ষণ প্রধান কারণ। যুগল এমন এক বিকৃতকামী বজ্জাত যার তুলনা শুধু ফিরিঙ্গি সমুদ্রদস্যুদের সঙ্গেই মেলে। সম্ভবত সে কারণেই তাদের মেলামেশা এত ঘনিষ্ঠ। মাস দুয়েক আগে ধাত্রীনগরে তার কুলগুরু দয়ালহরি চক্রবর্তীর বাড়ি গিয়ে ঘটনাচক্রে বিষ্ণুপ্রিয়র এই অনূঢ়া, নিতান্ত বালিকা কন্যাটির উপরে তার চোখ পড়ে। কন্যাটি তার মায়ের সঙ্গে চক্রবর্তীর বাড়িতে কোনো ব্রত উপলক্ষে গিয়েছিল। যুগল সাধু বিষ্ণুপ্রিয়র ব্রাহ্মণীর রূপ এবং স্বাস্থ্য দেখে হতবাক হয়েছিল। সত্যভামার সঙ্গে তার কনিষ্ঠা কন্যা মঞ্জরীও ছিল। দশ-এগারো

বছর বয়সি এই বালিকাকে দেখে যুগলের খুব আফশোস হয়েছিল। গরিব বামুনের ঘরে এইসব মেয়েলোকের দরকারটা কী, এমন ভেবেছিল সে।

ধাত্রীনগরে যাওয়ার আগে যুগল সোহাগপাশায় কবিরাজ ক্ষেমংকর সেনের সঙ্গে দেখা করেছিল। আসলে কবিরাজের কাছে আসাই তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

চিকিৎসক হিসাবে ক্ষেমংকর সেনের নাম বহুদূর বিস্তৃত। যুগল সাধু হালে একটা নতুন রোগের শিকার হয়েছে। নতুন রোগ মানে রোগটি এদেশে নতুন। রোগটি তার চিকিৎসকদের মতে যৌন। কিন্তু চাঁদপুরের কবিরাজের চিকিৎসা তাকে নিরাময় করতে পারেনি বরং একজন তাকে বলেছে যে, ফিরিঙ্গিরা এ রোগ এ দেশে আমদানি করেছে। ওষুধ কিছু নেই কিন্তু একটি নির্ঘাত মুষ্টিযোগ আছে। কিন্তু সে ব্যবস্থা তেমন সহজপ্রাপ্য নয়। যৌনসংসর্গ হয়নি এমন কোনো বালিকার সঙ্গে সহবাস করলে রোগটি পূর্বের আধার ছেড়ে নতুন আধার অর্থাৎ ওই বালিকার শরীরে চালান হয়ে যাবে। কিন্তু যে দেশে পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে হয় যায় সে দেশে অক্ষতযোনি বালিকা কোথায় পাওয়া যাবে?

বিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্যের এই মেয়েটির বিবাহের চেষ্টা হচ্ছে এমন খবর সে সংগ্রহ করেছিল। ধাত্রীনগরে অবস্থান কালেই সে চন্দ্রাবলীকেও খুঁজে বার করল এবং মঞ্জরী সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত করল। এক ঢিলে দুই পাখি মারার স্বপ্নে সে তারপরে মগদের গুপ্তচর ধম্মা চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করে।

হরিণঘাটা-লালদিয়া-ইলশা সংলগ্ন সমুদ্রপথ ইউরোপীয় জাহাজ চলাচলের অনুকূল নয়। বিস্তৃত সমুদ্র জলাভূমির অনেক দূর পর্যন্ত বাও মাত্র পনেরো-কুড়ি হাত গভীর। সে গভীরতাও সর্বত্র সমান নয়। খুব অভিজ্ঞ নাবিক না হলে গভীর সমুদ্র ছেড়ে উপকূলের দিকে বেশি ভেড়ে না কেউ। পর্তুগিজ ফিরিঙ্গিরা বিগত ষাট-সত্তর বছর ধরে অনবরত যাতায়াত করতে করতে এই সমুদ্রে তাদের নিরাপদ পথ ও নির্ভরযোগ্য উপকূল বের করে নিয়েছে। জলের রং, পাখি এবং স্রোত তাদের উপকূলের কাণ্ডজ্ঞান তৈরি করে। বস্তুত, মেঘনার ঘোলা জলে উপকূলের সমুদ্র বহুদূর পর্যন্ত ঘোলা রঙের হয়ে থাকে। সেই নিরাপদ দূরত্বে অনেক ঝড় ও ঢেউয়ের আঘাত খাওয়া, বিবর্ণ একখানা পুরানো জাহাজ নোঙর করে দাঁড়িয়েছিল। ছোট আকারের

জাহাজখানা দেখলে বোঝা যায় সেখানা জলদস্যুদের জাহাজ।

মগদের কোশাগুলো পূর্ণ পাল তুলে সেই জাহাজের দিকে যাত্রা করল। সমুদ্র শান্ত। মৌসুমি বায়ুর দিক ইতিমধ্যেই পরিবর্তিত হয়ে ফিরতি হয়েছে। ফলে সব পালগুলো নিমেষে ফুলে উঠে কোশাগুলোর গতি দ্রুততর হল।

সমুদ্রের পনেরো ক্রোশের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বসবাস করা সত্ত্বেও তারা কখনো সমুদ্র দেখেনি। সাতাশজন বন্দির মধ্যে দশজন বালক যাদের বয়স বারো-চোদ্দর উপরে নয়। পাঁচজন বৃদ্ধ বা প্রায়বৃদ্ধ পুরুষ। এদের প্রত্যেকের চেহারাতেই সচ্ছলতার ছাপ আছে। বাকি বারোজন ন-দশ বছরের বালিকা থেকে ত্রিশোর্ধ্ব যুবতী।

এই শেষ ভাগে পড়েছে বিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্যের স্ত্রী এবং অবশ্যই দুই কন্যা। বন্দি হওয়ার পর প্রথম তিনদিনে তারা দুঃখ এবং যন্ত্রণার প্রাথমিক পর্বটা পার হয়ে এসেছে। এই তিনদিনে তারা তিনজনেই ধর্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে নিতান্ত বালিকা মঞ্জরীর জন্য যুগল সাধুর অগ্রিম বায়না ছিল।

অবশ্য মঞ্জরীর সঙ্গে সহবাস যুগলের খুব সুখকর হয়নি। মঞ্জরী বিড়ালীর মতো ক্ষিপ্র এবং অসম্ভব সাহসী বালিকা সে। যুগল সাধুর মতলব বোঝামাত্র সে প্রতিরোধে নিজেকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছিল। যুগল তাকে যখন মিথ্যা ভালোবাসা এবং এই নরক থেকে মুক্ত করার মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছিল সে একেবারে চুপ করে ছিল। যুগল তার গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করতেই সে প্রথমে অশ্লীল গালি দিয়ে থুতু ছেটাতেও শুরু করল। সে যেন থুতুর ঝড়। বিকৃতকাম যুগল প্রথমে একটু হতচকিত হয়ে গেলেও মুখের উপরে অনবরত বর্ষিত থুতুর ভিতরে সীধুর স্বাদ পেল যেন। সে আনন্দের সঙ্গে হাঁ করে বালিকার মুখনিসৃত থুথু গিলতে লাগল।

আরো খানিকটা অগ্রসর হতে মঞ্জরী সাক্ষাত মার্জারীর মতোই যুগলের চোখের ভিতরে আঙুল চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল এবং এমন সব অশ্লীল গালিবর্ষণ করল যা শুনে যুগল আরো পুলকিত হল। মঞ্জরী এইসব বাছাই গালিগালাজ তাদের অন্দরের ছোঁয়াগণ্ডির বাইরের দাসীদের কাছ থেকে নির্ভুল শিখেছিল।

আর দেরি না করে তার দাস দু'জনকে ডেকে তাদের সহায়তায় জোর করে বালিকার অক্ষতযোনি ছিন্ন করল যুগল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে

হল উপদংশ ব্যাধিজনিত তার জ্বালা যন্ত্রণার যেন নিমেষে উপশম হয়ে গেল। বালিকা যত জোরে আর্তনাদ করে উঠল, যত বীভৎস ভঙ্গিতে তার চোখের মণি কোটর থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম হল, যত দ্রুত শয্যাকে সে রক্তাক্ত করল, যুগল সাধু তত নিশ্চিন্ত হল। তার গূঢ় কবিরাজ তাকে অক্ষতযোনি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার এবং রোগচালান করার অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ এই ধরনের নানারকম লক্ষণের কথাই বলে দিয়েছিল।

তৃপ্ত যুগলের ইঙ্গিতে মূর্ছিত বালিকার দেহ কাঁধের উপরে ফেলে দাস তারপরে তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এল।

পাশাপাশি আচ্ছাদনহীন দু'টো খোয়াড় তৈরি করে রেখেছে মগেরা। বৃত্তাকারে বাঁশ এবং কাঠ দিয়ে তৈরি খোয়াড় দুটো উঁচু এবং দুর্ভেদ্য। আচ্ছাদন না থাকলেও অস্থায়ী এই খোয়াড় থেকে পালানোর কোনো সম্ভাবনাই কেউ মনে স্থান দেয় না। সবাই জানে মগের কাছ থেকে পালানো যায় না। খোয়াড় দুটোর বাঁশ-কাঠের বৃত্তের বাইরে বাবলা, বেল এবং খেজুর কাঁটার জাংলা ফেলে দুর্গম করা হয়েছে।

মগের হাত থেকে রেহাই মরে গেলে। মোগলেরা বলে চারজন মগের একখানা নৌকা পথে পড়লে একশোজন দেশি মানুষের বজরা প্রথম চেষ্টা করবে পালাতে এবং শেষেও চেষ্টা করবে পালাতে। মগভীতি ভাটিতে এমন প্রবল যে যুদ্ধ দূরস্থান, প্রতিরোধের কথা কেউ চিন্তাও করবে না। শেষে উপায় না থাকলে সেই একশোজন মানুষ জলে ঝাঁপিয়ে জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করতে করতে ডুবে মরবে।

দুই খোঁয়াড়ের একটাতে পুরুষ এবং বালকদের জড়ো করে রাখা হয়েছে, অন্যটায় স্ত্রীলোক এবং বালিকাদের। তিনজন কিংবা চারজন করে বন্দিকে বাঁ হাতের তালু ছিদ্র করে, সেই ছিদ্রপথে বেত গলিয়ে তাদের স্বচ্ছন্দ গতিবধি, এমনকী নড়াচড়াও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। বেতের দুই অন্তিমকে গ্রন্থিবদ্ধ করা হয়েছে এমন এক কৌশলে যা সবার জানা নয়। জানলেও অবশ্য সে গিঁট খোলার চেষ্টা কেউ করবে না।

সত্যভামা, শর্মিষ্ঠা এবং মঞ্জরীর সৌভাগ্যক্রমে তাদের একত্রে একই বেতের কুণ্ডলীতে গুচ্ছ করে বেঁধে রাখা হয়েছে। সূর্য যখন মাঝ আকাশ ছাড়িয়ে খানিকটা পশ্চিমে হেলেছিল, দু'জন সশস্ত্র মগ ঘেরার ভেতরে ঢুকে গুচ্ছ থেকে মঞ্জরীকে খুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল। সত্যভামা এবং শর্মিষ্ঠার

চিৎকার এবং ক্রন্দনে তারা ভ্রুক্ষেপ মাত্র করল না। অন্য স্ত্রীলোকেরা নির্বাক হয়ে এই দৃশ্য দেখল। বিগত তিনদিনে এমন ধরনের ঘটনা আরো কয়েকবার হয়েছে। বস্তুত, যুবতীদের মধ্যে প্রায় সবাই ইতিমধ্যেই ধর্ষিতা, কেউ কেউ একাধিকবার। এই একাধিকবারের দলে শর্মিষ্ঠা আছে। আছে সত্যভামা।

একটু পরে মূর্ছিতা মঞ্জরীকে কাঁধে করে যুগল সাধুর দাস বন্দিদের ঘেরাতে এসে হাজির হল। একজন প্রহরী মগ তার ভয়ংকর মগাই দা হাতে এল তার পিছনে। মূর্ছিতা মঞ্জরীকে মাটিতে নামিয়ে দিতে সত্যভামা মুক্ত দক্ষিণ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল রক্তাক্ত সন্তানকে।

মগ সেই অবস্থায় বেতের আগা মঞ্জরীর তালুতে ফুঁড়ে অন্য দু'জনের সঙ্গে যুক্ত করল তাকে। সহসা সত্যভামা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে অভিশাপ দিল, 'সর্বনাশ হবে তোদের! বজ্রপাত হবে তোদের মাথায়! তোদের দেশ জ্বলে-পুড়ে যাবে! শকুনে ঠুকরে খাবে তোদের ছেলেমেয়ের চোখ! ওরে মগ, ওরে সর্বনাশা মগ, নিরপরাধ মানুষের ঘরবাড়ি লুটে, খেয়ে সাধ মেটে না তোদের, তোরা সেই অসহায় মানুষগুলোকে ধর্ষণ করে, বিক্রি করে মানুষের সমস্ত শুভবুদ্ধি, মানুষের যত মঙ্গল, মানুষের যত পবিত্রতা, সব তোরা ধ্বংস করিস! ঈশ্বর যদি নাও থাকে, রেহাই পাবি না তোরা! ঈশ্বর না থাকলেও আকাশ আছে! ঈশ্বর না থাকলেও ভূমিকম্প আছে! আছে ঝড়, ঝঞ্ঝা, মহামারী! তোদের রেহাই নাই মগ, তোদের পরিণতি হবে এইসব মানুষের থেকেও ভয়ংকর!'

সত্যভামা তার নিজস্ব ভাষায় এই ভয়ংকর অভিশাপ দিলেও মগের কোনো ভাবান্তর হল না। মগ জানে চট্টগ্রামের পশ্চিমের যাবতীয় ভূ-ভাগ তাদের। সেই ভূ-ভাগে হাঁস, মুরগি, গোরু, শুয়োর যেমন তাদের, মানুষও তেমনি তাদের। তাদের রাজা মোগলের অধীন সমস্ত বাংলাদেশ তাদের জায়গির দিয়েছে তার সমস্ত সম্পদ, পশু এবং মানুষসহ। মানুষ ধরে নিয়ে তারা জলপথে নিজের দেশে নিয়ে যায়। নিজেদের প্রয়োজনে দাস করে রাখে, রাজাকে দেয়, ফিরিঙ্গিদের কাছে বিক্রি করে দেয়, যারা আবার সমুদ্রগামী জাহাজে করে করমণ্ডল উপকূলের কালিকটে, গোয়া কিংবা বোম্বে কিংবা আরো পশ্চিমে সমুদ্রপারের অপরিচিত দেশে নিয়ে তাদের বিক্রি করে। এই প্রক্রিয়ায় যারা মরে, তারা বেঁচে যায়।

সত্যভামার অভিশাপের প্রতিক্রিয়ায় অথবা কিছু না বুঝে মগ তার

স্বাভাবিক হিংস্রতায় তার মুখের উপর আড়াআড়ি একটা কর্কশ আঘাত করল। সত্যভামার নাক এবং মুখের ভিতর থেকে টাটকা রক্ত গড়িয়ে মাটিতে পড়ল। উন্মাদিনীর মতো মাটিতে পড়া রক্তের ফোঁটার দিকে সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল।

মগ বন্দিদের ঘেরা থেকে বেরিয়ে যেতে এক মুহূর্তের সুযোগে দাস বলল, 'মা, তোমার মেয়ের এ-দশা যে করেছে, সে ব্যক্তির নাম যুগল সাধু। সে চাঁদপুরের বেনে।'

দাস বেরিয়ে যেতে কেমন শান্ত হয়ে গেল সত্যভামা। দাসের কথাগুলো হঠাৎ যেন অর্থবহ হয়ে উঠল তার মস্তিষ্কে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, কী হবে এসব খবরে তার? কিছুক্ষণ আগে গোটা তিনেক ডাব্বায় মগেরা জল ঢেলে দিয়ে গিয়েছিল। আর কাঁচা চাল মুঠো মুঠো করে ছড়িয়ে দিয়েছিল ঘেরার মধ্যে। বন্দিরা সেই চাল এখনো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে সত্যভামা ডাব্বার জল হাতে তুলে মঞ্জরীর নিম্নাঙ্গের ক্ষত ধুইয়ে দিতে দিতে এতক্ষণে করুণ বিলাপ শুরু করল।

ফিরিঙ্গিদের জাহাজের সঙ্গে মগদের জালিয়া এবং কোশাগুলো নোঙর করে মগ দস্যুদের প্রধান উ-কিনহো দুজন পার্শ্বচরকে নিয়ে দড়ির মই বেয়ে জাহাজে উঠে গেল। জাহাজের পর্তুগিজ কাপ্তান অগাস্টিনো মুখে এবং বাহুতে গভীর পুরানো ক্ষত বহনকারী বীর। বীরত্বের সর্বাধিক প্রদর্শনী ডানদিকের জখম চোখটি কাপড়ের ঠুলিতে ঢাকা। সব মিলিয়ে অগাস্টিনো একটি মূর্তিমান বিভীষিকা। অগাস্টিনো এই জাহাজের এবং জাহাজ আশ্রিত প্রায় চল্লিশজন দস্যুর প্রধান। সে উ-কিনহোকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল এবং সে রাতটা উভয়দলের প্রধানরা জাহাজে পান ভোজনে মত্ত হল। মগের কোশা থেকে কয়েকজন যুবতীকে উঠিয়ে আনা হল। যারা দস্যুদের হুল্লোড়ে নাচগান করবে এমন আকাঙ্ক্ষা দস্যুদের। এই যুবতীদের দলে অনিবার্যভাবে শর্মিষ্ঠা ছিল।

দস্যুরা অল্প সময়ের মধ্যেই পানভোজনে বেসামাল হয়ে পড়ল। জাহাজে পর্তুগিজদের নিজস্ব জনাপাঁচেক স্ত্রীলোক ছিল। তারা কিছুক্ষণ নাচগান করল। যতক্ষণ তারা নাচগান করল বন্দিনীরা একপাশে জবুথবু হয়ে বসে থাকল। এও একরকম স্বস্তি। শেষে নাচগান করতে করতে ফিরিঙ্গি স্ত্রীলোকেরা

বন্দিনীরা কাছে এসে টানাটানি করে তাদের নাচগানের ফাঁকা জায়গাটায় নিয়ে এল এবং তাদের উদ্দাম হুল্লোড় সর্বস্ব নাচ ও গানের সঙ্গে বন্দিনীদের যুক্ত করতে প্রয়াস পেল। ফলে নাচগানের নামে একটা বিশৃঙ্খল হল্লাই হতে লাগল। অনিচ্ছুক, সর্বাঙ্গে ক্ষত এবং যন্ত্রণা নিয়ে বন্দিনীরা সবাই মাতাল দস্যু এবং তাদের সঙ্গিনীদের ধাক্কাধাক্কির উপকরণ হল। এর মধ্যেই কয়েকজন দস্যু বন্দিনী যুবতীদের সঙ্গে কুকুরের মতোই যে কোনো বিভঙ্গে উলঙ্গ যৌনাচারে প্রচেষ্ট হল।

শর্মিষ্ঠার দেহসৌষ্ঠব একজন দস্যু ওই হুল্লোড়ের ভিতরেই শনাক্ত করতে পেরেছিল। শর্মিষ্ঠা তার অক্ষত হাত খানা দিয়ে সে ব্যক্তিকে মৃদু প্রতিহত করার চেষ্টা করছিল নিতান্ত সংস্কারের বশেই। দস্যু তাতে মজা পেল। উপরন্তু সে ছিল মদে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ একজন মাতাল। ফলে শর্মিষ্ঠার প্রতিরোধের মধ্যে সে প্রেমিকার ব্রীড়াই যেন খুঁজে পাচ্ছিল। তার কোমর জড়িয়ে ধরে মাতাল তাকে অপেক্ষাকৃত আঁধার অংশে আকর্ষণ করে নিয়ে এল। বড় বড় কয়েকটা জলের পিপে দিয়ে একটা দিকে সামান্য আড়াল ছিল। দস্যু তাকে সেই পিপের গায়ে চেপে ধরে একটা বিকল্প পদ্ধতিতে তার যৌন ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করতে শর্মিষ্ঠা বিস্মিত হয়ে গেল। গত চারদিনের মধ্যে তার এবং তার সঙ্গিনীদের যেসব অভিজ্ঞতা হয়েছে, একজন মানুষের তিন জন্মে তত অভিজ্ঞতা হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই ব্যক্তির পদ্ধতিটা বুঝতে তার সময় লাগল। প্রথমে মনে হল লোকটা অভিনব কোনো পদ্ধতি আশ্রয় করতে চাইছে তার কাম নিবৃত্তির জন্য। পরে সে ভাবল মাতাল বোধ হয় দিশা ঠিক করতে পারছে না। কিন্তু সব শেষে সে বুঝল, এসব নয়, মাতালের তৃপ্তি যে আধারে, তা স্ত্রীলোকেরা না হলেও চলবে। বস্তুত দস্যু তার বালক-সদৃশ দেহকাণ্ডেই সম্ভবত আকৃষ্ট হয়েছিল।

এত সবের পরেও শর্মিষ্ঠার সমস্ত শরীর ঘিনঘিন করে উঠল, এত সবের পরেও শর্মিষ্ঠার শরীরের বিতৃষ্ণা ক্রোধে প্রকাশ পেল। পিছন ঘুরিয়ে মাতাল তাকে পিপের উপরে চেপে ধরে রেখেছিল। সেই অবস্থাতেই শারীরিক এবং মানসিক ঘৃণায় সে পা ছুড়ল। মাতাল কয়েক পা ভারসাম্যহীনভাবে লটপট করে পিছিয়ে কাঠের মেঝের উপর আছড়ে পড়ল। একটা সিন্দুকের গায়ে মাথাটা ঠুকে গেল তার। মাতাল অনুচ্চে জড়ানো গলায় অবোধ্য ভাষায় গালাগালি দিল শর্মিষ্ঠাকে কিন্তু উঠল না, বা উঠতে পারল না।

প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাত উঁচুতে মাস্তুলের আসনে অন্ধকার হয়ে যাওয়া সমুদ্রেও নজর রেখে বসেছিল বুড়ো মালুম। অন্ধকারে তার দেখার বিষয়বস্তু এই মুহূর্তে কোনো দূরাগত আলো। কিন্তু নীচে জাহাজের পাটাতনের আলো আঁধারের মধ্যে আদিম নাচগান এবং নাটক তার বুড়ো রক্তেও তুফান তুলেছিল সম্ভবত। বিশেষ করে শর্মিষ্ঠা ও মাতাল দস্যুর পালা উপর থেকে সে মনোযোগ দিয়েই দেখছিল এবং উপভোগও করছিল। মাতাল ভূপাতিত হতেই দড়ি বেয়ে মর্কটের ক্ষিপ্রতায় বৃদ্ধ মুহূর্তে নীচে একেবারে শর্মিষ্ঠার সামনে এসে নামল। মাথায় ফেটি, হাঁটুর সামান্য নীচ পর্যন্ত পাতলুন, উপর থেকে পেট পর্যন্ত বোতাম লাগানো ঢোলা জামা এবং কোমরবন্ধে অস্ত্র, এমন বিচিত্র পোশাকে লম্বা দাড়িআলা বৃদ্ধ অমন ক্ষিপ্রতায় তার পায়ের কাছে শূন্য থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হতে শর্মিষ্ঠা 'ওঃ মাগো' বলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। তার তাৎক্ষণিকভাবে মনে হয়েছিল এ কোনো শ্বেতাঙ্গ জাহাজির প্রেতাত্মা। জাহাজিরা মরে গেলেও জাহাজ কিংবা দরিয়া ছাড়ে না আর তাদের তো প্রায় সবারই অপঘাত মৃত্যু হয়।

১৪

শায়েস্তা খানের আমলে ফুল্লশ্রীর মনসামঙ্গল বাঙালির ঠাকুরের আসনে পাকাপাকি ফুল বেলপাতা পেতে শুরু করেছে। দুখানা শক্ত কাঠের মলাটের মধ্যে বিজয় গুপ্তের পুঁথি আলাদা একখানা জলচৌকির উপরে স্থান করে নিয়ে বাঙালি গৃহস্থের পূজা আদায় করে নিয়েছে।

এর একশো বছর আগেই অবশ্য শেষবারের মতো চাঁদের চোদ্দডিঙা কালীদহে তলিয়ে গিয়েছে। সপ্তগ্রাম, হুগলি এবং চট্টগ্রামকে শীর্ষবিন্দু করে বঙ্গোপসাগরের সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ একদিকে নাগাপত্তন, ত্রিবাঙ্কুর, পুলিকট,

মসুলিপত্তন, গঞ্জাম অন্যদিকে রোসাঙ্গ, পেগু, সিরিয়াম টেনাসেরিম এবং মালাক্কা অন্তরীপের মালয়, কেডা, পেরাক, জোহর, আচে হয়ে বান্টাম পর্যন্ত এক বিস্তৃত স্বাধীন সমুদ্র বাণিজ্য ষোলো শতকের গোড়া পর্যন্ত চালু ছিল। সেই চালু বাণিজ্যে সপ্তগ্রাম, হুগলি কিংবা চট্টগ্রাম থেকে যেসব জাহাজ সমুদ্র যাত্রা করত, তার মধ্যে আরব, পারস্য এবং গুজরাটের বণিকদের জাহাজগুলোই শুধুমাত্র ছিল না, শঙ্খধর, চন্দ্রধর, শ্রীমন্ত, ধনপতিদের বাণিজ্যবায়ু এবং সমুদ্রস্রোতের ভরসায় চলা বেশ কিছু জাহাজও ছিল।

তারপরে খাড়িতে পর্তুগিজরা এসে গেল। আরব সাগরে পর্তুগিজ রাজশক্তির সহায়তা সত্ত্বেও পর্তুগিজ বণিকদের একচেটিয়া বাণিজ্য সম্ভব হয়নি। কিন্তু পর্তুগিজরা যে সেখানে প্রধান শক্তি তাতে কোনো ভুল নেই। এই অঞ্চলে বাণিজ্য করতে হলে পর্তুগিজ কার্তাজ নিতে হত আরব, গুজরাটি বা ইউরোপীয় অন্য জাতিগুলিকে। কার্তাজের দাম বেশি না হলেও পর্তুগিজদের এতে অন্যভাবে লাভ হত। কার্তাজ নেওয়া জাহাজগুলিকে পর্তুগিজদের অধীন বন্দর ব্যবহার করতে হত। পর্তুগালের তাতে লাভ ছিল ষোলো আনার উপরে আঠেরো আনা।

ক্রমে চট্টগ্রামে, সপ্তগ্রামে এবং হুগলিতে পর্তুগিজদের বসবাস এবং ব্যবসাবাণিজ্য এমন শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে বাংলার খাড়ির বিশাল সওদাগরি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে। কেননা পর্তুগিজরা শুধু যে বাণিজ্য নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল, এমন নয়। বাণিজ্য হলে বাণিজ্য, না হলে জলদস্যুবৃত্তি, তাতেও যদি সুবিধা না হয়, তা হলে খাড়ির এই ত্রিভুজের গায়ে লেগে থাকা অসংখ্য ছোটবড় রাজ্যের নিজস্ব রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা, এমনকী সম্ভব হলে নিজেরাই কোথাও কোথাও জোরালো সামরিক শক্তি কিংবা নিজেরাই শাসনক্ষমতা দখল করে রাজা হয়ে বসা।

গঙ্গা এবং মেঘনার মুখে, সুবর্ণরেখা কিংবা ইরাবতীর মোহনায় থানা গেড়ে বসে থাকা পর্তুগিজ শক্তির পক্ষে মোটেই অসুবিধার হল না। চন্দ্রধর, শঙ্খধর, শ্রীমন্ত, ধনপতিদের পক্ষে করমণ্ডল, কলম্বো থেকে আচে, বালি, যবদ্বীপ কিংবা মলাক্কায় আর নাও ভাসানো সম্ভব হল না। মোগল রাজপুরুষের বাংলার খাড়ির বাণিজ্যে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ কোনো নতুন ঘটনা ছিল না। বস্তুত বাংলার চাঁদ, শঙ্খ, ধনপতিদের হারিয়ে যাওয়া বাণিজ্য সুজা বাদশা, মিরজুমলা, শায়েস্তা খান, আজিম উশশানের সহায়তায়

নতুন ভরকেন্দ্র তৈরি করল। বাঙালি বণিক শেষ পর্যন্ত নোনাজল ত্যাগ করে এইসব বণিক শক্তির সরবরাহকারী হয়ে সন্তুষ্ট থাকল। যুগল সাধু এরকমই একজন বণিক। তার বংশ ও ব্যক্তিগত একমাত্র অহংকার এই যে তার ছোট ঠাকুর্দা শশধর সাধু জীবনে দুবার যবদ্বীপ পর্যন্ত জাহাজ চালিয়েছিল। যবদ্বীপে যে একটি বিয়েও করেছিল।

বঙ্গোপসাগরে স্বাধীন বাণিজ্যের লড়াই দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। কোনো শক্তিই স্বাধীন বণিকদের চলাফেরা বা বাণিজ্য পুরোপুরি কব্জা করতে পারেনি। গোয়ার প্রশাসন বেসরকারি পর্তুগিজ জাহাজগুলিকে মসুলিপত্তনের বাণিজ্যবহর আক্রমণ করার জন্য উৎসাহিত করত যাতে বাঙালখাড়িতে মসুলিপত্তনের বণিকরা মশলার ব্যবসা থেকে ক্রমশ সরে যেতে বাধ্য হয়। মসুলিপত্তনের সঙ্গে যাতে আচে কিংবা পেগুর বাণিজ্য না চলে গোয়া সেই চেষ্টা করত। জলদস্যু বণিকেরা বহুবার মসুলিপত্তনের জাহাজ আক্রমণ করে। এই ধরনের ঘৃণ্য কাজ যে পর্তুগিজ সরকারি জাহাজও করত না, এমন নয়। বাণিজ্য ও দস্যুতার মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করত না তারা।

শায়েস্তা খানের আমলে বঙ্গোপসাগরের বাণিজ্যচিত্র অন্য রকম হয়ে যায়। বিজয়নগরের ধ্বংসের পর পুলিকট ক্রমশ তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। কিন্তু প্রায় সমসময়েই তার উত্তরে মসুলিপত্তন বন্দর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শায়েস্তা খান যখন বাংলার সুবেদার, গোলকোণ্ডার সুলতান ওলন্দাজ কোম্পানিকে বাংলা খাড়ির বাণিজ্যে এত সুবিধাসুযোগ দিতে শুরু করল যে মসুলিপত্তনের ভারতীয় বাণিজ্যও দুর্বল হয়ে পড়ল। ওলন্দাজ কোম্পানি সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে মালাক্কা অধিকার করলে বঙ্গোপসাগরের স্বাধীন বাণিজ্য নতুন করে ধাক্কা খেল। এর আগেই অবশ্য ওলন্দাজেরা বাটাভিয়ায় শক্তিশালী উপনিবেশ স্থাপন করেছে। সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়েই ওলন্দাজেরা পর্তুগিজ ঘাঁটি নাগাপত্তন দখল করে নিয়ে সেখানে তাদের নিজস্ব শক্তিশালী কেন্দ্র স্থাপন করে। অর্থাৎ বাঙালখাড়িতে তারা নতুন শক্তিকেন্দ্র, নতুন বাণিজ্য সম্পর্ক তৈরিতে তৎপর হয়ে উঠল। ইয়েকবেরে পোর্টো মারিয়া ইলশার মুখে চরায় আটকে পড়ার ঘটনা এই সময়কার। ফৌজদার স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসায় জাহাজের কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করল এবং জাহাঙ্গিরনগরে শায়েস্তা খানের দপ্তরে বিস্তৃত সংবাদ পাঠাল। রাজনীতিতে যাকে প্রয়োজন তার দুর্বলতাও জানতে হবে।

সুজা বাদশার আমলে বাংলায় যেটুকু স্বস্তি ছিল, তা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কেননা কিছু দিনের মধ্যেই শুরু হয় সম্রাট শাজাহানের ছেলেদের মধ্যে আত্মকলহ। এই বিরোধে বুড়ো শাজাহানের সব থেকে সুযোগ্য পুত্র আওরঙ্গজেব জয়ী হয়। অন্য দুই ভাইকে পরাজিত এবং নিহত করে আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসল। বাপকে বন্দি করে রাখল আগরা দুর্গে। শেষ পর্যন্ত সুজা খাজুয়ার যুদ্ধে পরাজিত হলে নিজের পরিণতি সম্পর্কে নিঃসংশয় হল এবং পালাতে শুরু করল।

পিছনে আওরঙ্গজেবের সমুদ্র বণিক সেনাপতি মিরজুমলা। সুজা, বাংলার মানুষের প্রিয় সুজা রাজা বা সুজা বাদশা প্রাণ ভয়ে পালাতে শুরু করল। সুজা জানত সে ধরা পড়লে অন্যান্য ভাইদের যে দশা হয়েছে, তারও সেই দশা হবে। সুজা নিজেও জানত অন্য কোনো পরিণতি সম্ভব নয়। নিজে দীর্ঘদিন বাংলার মতো বিশাল সুবার প্রিয় শাসক হয়েও সুজা জানত মিরজুমলা পর্তুগিজ, ইংরেজ, ওলন্দাজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিজেতা সমুদ্র বণিক। দেশ এবং অন্তর্দেশীয় কূটনীতি, তা বাণিজ্যেই হোক আর রাজনীতিতেই হোক মিরের থেকে এই মুহূর্তে হিন্দুস্থানে কে আর বেশি জানে? কাজেই সুজাকে পরাজিত প্রদেশের নদী, মাঠ, ঘাট, রাজধানী, শহর বন্দর কেউই আশ্রয় দিতে পারল না। পরাজিত বাহিনীকে নতুন করে সংহত করার সময় এবং সুযোগও আর নেই। মিরজুমলা কি সে সুযোগ আর দেয়! সুজার বুঝতে কিছু বাকি রইল না। আসলে ব্যাকরণ তো সেও জানত। খাজুয়ার যুদ্ধে মির যদি পরাজিত হত, সে একই কাজ করত। মিরের পরাজিত বাহিনীকে ধাওয়া করে গঙ্গা উপত্যকা ধরে সুজা দিল্লির দিকে যাত্রা করত। রাস্তায় তার সামনে যে কোনো প্রতিরোধকে গুঁড়িয়ে দিত সে। শেষ পর্যন্ত দিল্লি বা তার আগেই শেষ নির্ধারিত যুদ্ধটা হয়ে যেত এবং সুজা বাদশা যদি সে যুদ্ধে জিতত, আওরঙ্গজেবের অবস্থাও এই মুহূর্তে সুজার মতোই হত। আওরঙ্গজেব যদি পালাতে না পারত, ধরা পড়ে খুন হত, আর পালাতে পারলে হয়তো মক্কায় গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিরাপদ হত সে। সুজা জানত তাদের এই ভাইটার আবার বেশ কিছু ধর্মীয় মানবিক ভণ্ডামি আছে।

সুজা নিজেও অবশ্য তাই চাইল। খাজুয়া থেকে টাঁড়া, টাঁড়া থেকে পদ্মায় রণতরী ভাসিয়ে ঢাকা থেকে কর্ণফুলি বেয়ে, নাকি স্থলপথে ভুলুয়া-লক্ষ্মীপুর অথবা ত্রিপুরার পার্বত্য জঙ্গলের পথ বা বিপথ ধরে আরাকান। সেই

আরাকান, বাংলা সুবার অধীশ্বর থাকাকালীন চট্টগ্রামের দখল নিয়ে যার সঙ্গে বিগ্রহের সম্পর্ক এতকাল।

তারপরের ঘটনাটা আর রাজনীতি, কূটনীতির আওতায় থাকে না। তারপরে বিষয়টা হয়ে যায় মানবিক, কাব্যের, দর্শনের। পিতৃদ্রোহ, ভ্রাতৃদ্রোহ, এত হত্যা, যুদ্ধ, রক্ত, এসব কি আল্লার অভিলাষ, না, শয়তানের! আল্লা যদি সর্বশক্তিমান! বাদশা নয়, মানুষ হিসাবে সুজাকে তার পরিবার পরিজনের কথা ভাবতে হয়। ছেলেগুলোর কী হবে! মেয়েদের ইজ্জত! রাজপরিবারের ব্যাকরণ তখন পৃথকভাষ্যে, পরিবারগত। আর একেবারে শেষ পর্যায়ে সুজা যেন সেই অসহায় হতভাগ্য পিতা, যে তার কন্যাদের সম্মান রক্ষা করতে পারে না।

সুজা বাদশা এবং তার স্ত্রীপুত্রকন্যাদের বিষয়ে সারা দেশ জুড়ে নানা রকম গল্প ছড়াল। শেষ পর্যন্ত মিরজুমলার বিস্তারিত অনুসন্ধানে আওরঙ্গজেব জেনে নিশ্চিন্ত হল যে সুজা নিহত এবং তার ছয় সন্তানের মধ্যে একজনও আর জীবিত নেই। আর সেই শেষ গল্পটায় একটা ভয়ংকর স্ববিরোধ, মতান্তরে মজা আছে। সুজার সঙ্গে তার বীরপুরুষ রণচতুর বন্ধু এবং সহচররা ছিল। এর মধ্যে সুজার অনুগত সৈয়দ আলম বাদহকাশ, সৈয়দ কুলী উজবেক, বাড়হার সৈয়দগোষ্ঠী, বিভিন্ন মর্যদার কর্মচারী ও পরিচারক ইত্যাদিরা তো ছিলই, ছিল সুজার চল্লিশজন দুর্ধর্ষ দেহরক্ষী। এই দলে অবশ্যই ছিল হারুন অল রশিদ। আরাকানগামী এই দলের লোকসংখ্যা পাঁচশো থেকে হাজার তিনেক হবে। সঠিক সংখ্যা কেউ শেষ পর্যন্ত বলতে পারেনি। সুজা এবং তার পরিবারের দুঃখে সারা বাংলা কেঁদেছিল।

রাজধানীতে বসবাসকারী প্রচুর সংখ্যক মুসলমান অধিবাসী, রানির অভিভাবকত্বে মাত্র আট-দশ বছর বয়সের বালক রাজা সুধর্মা এবং প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ মুসা, এসব তথ্য বিবেচনা করে সুজা খুব সম্ভবত তার অনুচর ও স্থানীয় কিছু প্রতিপত্তিশালী মুসলমানের সহায়তায় একটা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে আরাকানের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। ফলে সবংশে এবং সানুচর তাকে কোতল হতে হয়। স্ববিরোধের গল্পটা এই, আরাকানিরা হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ করে বাংলা থেকে যে সম্পদ এবং যাদের লুট করে নিয়ে আসে রাজাকে তার সিংহভাগ দিতে হয়। কিন্তু সুজাকে সপার্ষদ কচুকাটা করলেও তার স্ত্রী পিয়ারাবানু, তিন কন্যা রওশনআরা, গুলরুখ বানু ও আমেনা বানু

এবং নিশ্চয়ই এদের সঙ্গে আরো অনেক মহিলাকে হত্যা করা হয় উপোস করিয়ে, কেননা বৌদ্ধধর্মে স্ত্রীলোকের রক্তপাত যে নিষিদ্ধ! বুড়ো শাজাহান এ খবর শুনে হাহুতাশ করে বলল, ওই জংলি রাজাটার উপরে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হতভাগ্যের একজন সন্তানও আর জীবিত থাকল না! আগ্রাদুর্গে বন্দি শাজাহানের এই দীর্ঘশ্বাস শোনার জন্য পাশে ছিল কেবল কন্যা জাহানারা এবং দুর্গেশ্বর ইতিবার নামক খোজার নিযুক্ত কোনো স্ত্রীলোক গুপ্তচর। ইতিবার যথা সময়ে এই প্রায়-স্বগতোক্তি আওরঙ্গজেবের কানে পৌঁছে দিল। শাজাহানকে শাসন করা এবং যাতে কোনোমতেই তার ধারেকাছে কেউ না আসতে পারে এসব দেখার দায়িত্ব আওরঙ্গজেব ইতিবারকেই দিয়েছিল। এই বুদ্ধিমান এবং কুশলী খোজাকে শিশু বয়সে বাংলার গ্রাম থেকে চুরি করে এনে খোজা করে বিক্রি করা হয়েছিল। এক সময় সে সম্রাট শাজাহানের ব্যক্তিগত ভৃত্যদের মধ্যে ছিল। তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে সম্রাট তাকে আওরঙ্গজেবকে দিয়ে দেয়। আওরঙ্গজেবের অধীনে কাজ করার সময় তার ধাপে ধাপে উন্নতি হয় এবং ইতিবার আওরঙ্গজেবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে। এই বিশ্বস্ততার সেরা পুরস্কার আগ্রাদুর্গের অধীশ্বর হওয়া।

নদী পথে নিজের কর্মস্থলে এগোবার সময় ইগনেশিয়াস বিগত কয়েক বছরের দেশ জুড়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আলোচনা করছিল মনে মনে। সে তার বাবা অ্যাবরেনানশিয়াসের কাছ থেকে যে কোনো বিষয়কেই গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস অর্জন করেছিল।

ফৌজদার মির বহর জাহাঙ্গির ইউসুফ শায়েস্তা খানের ছেলে উমেদখানের বন্ধু। এ অঞ্চলের মির বহর হিসাবে তার নিয়োগ নতুন। ইগনেশিয়াসের নিয়োগ সুজা বাদশার আমলে যখন এখানে জায়গিরদার ছিল হারুন-অল-রশিদ। হারুন সুজার পতনের সময় সঙ্গী ছিল এবং সম্ভবত আরাকানের রাজধানী রোসঙ্গে তার প্রভুর সঙ্গেই নিহত। সুজা টাঁড়ার যুদ্ধে মিরজুমলার কাছে পরাজিত হবার পর আর নতুন করে শক্তি সংহত করার কথা ভাবেনি। জাহাঙ্গিরনগর বা ঢাকায় এসে সে আরাকানের রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে।

যোগাযোগ হলে অনের ধনরত্ন এবং অন্যান্য আশ্বাসের বিনিময়ে রোসাঙ্গ রাজসভার কর্তাব্যক্তিরা মানুয়েল কোয়েলো নামক পর্তুগিজ ফিরিঙ্গিকে পাঠাল সুজাকে আরাকান নিয়ে যাওয়ার জন্য। এ হল সেই বাঘমারা

কোয়েলো। অ্যাবরেনানশিয়াস এ লোকটাকে চিনত। দুর্দান্ত স্বভাবের ও লোকটাকে ছোটবেলা দিয়াঙ্গায় দেখেছে সে। একবার শ-খানেক লোককে নিয়ে দিয়াঙ্গার গির্জায় হাজির হয় কোয়েলো। এই শ-খানেক লোকের মধ্যে আধাআধি ঢাকা, শ্রীপুর এসব জায়গা থেকে লুঠ করা স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, বাকিরা এদের বন্দি করে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসা বোম্বেটে। তাদের বেশির ভাগই ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের জারজ। কেউ কেউ গোয়া, বম্বে, কলম্ব থেকে কোনো বড়সড় দুষ্কর্ম করে পালিয়ে আসা অপরাধী। তাদের চোখমুখ দেখলেই বোঝা যায় এরা না করে এহেন অপকর্ম পৃথিবীতে নেই। বুড়ো মেনজেস তখন আরো বুড়ো হয়েছে। আশি বছর বয়স পার করে তখনো সে পৃথিবীর বুকে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ততদিন তার খেপা মেনজেস নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দিয়াঙ্গার মানুয়েল কোয়েলো, আন্তনিও কারভালো ইত্যাদিরা তখন আরাকান রাজার বন্ধু। সেবাস্তিয়ান গনজালেস সন্দ্বীপ দখল করে শক্তিশালী শাসক হয়ে বসেছে। কিছুদিনের মধ্যেই গনজালেস বাকলার শাহাবাজপুর আক্রমণ করে নিজের দখলে নিয়ে নিল। কারভালো ছিল গনজালেসের অনেক যুদ্ধের প্রথম সহকারী, যোগ্য শাগরেদ। প্রথমে তারা বাকলার রাজা রামচন্দ্রের সহায়তায় সন্দ্বীপ দখল করল, পরে সুযোগ বুঝে তার হাত থেকে শাহাবাজপুর কেড়ে নিল। কিছুদিনের মধ্যে আরাকান রাজাদের সঙ্গে তার এত সদ্ভাব হল যে সাত ঘাটের জল খাওয়া পর্তুগিজ ফিরিঙ্গির মাগীরাও আরাকানের রাজমহিষীর অন্তঃপুরে হইহই করে ঢুকতে বেরুতে শুরু করল। ঠিক এই সময় কোয়েলো এবং কারভালো ওই শতখানেক মানুষকে নিয়ে দিয়াঙ্গার গির্জায় হাজির হল পাদরি মেনজেসের সামনে ধর্মান্তরের উদ্দেশ্যে।

'করুণাময়, প্রভুর এই মেষশাবকদের রক্ষা করুন।

অশীতিরপর মেনজেসের চোহারা আদৌ খ্রিস্টীয় সন্তের মতো হয়নি,বরং তার স্বর্ণধবল দীর্ঘ চুল দাড়ি এবং অনুরূপ ভ্রূ, যা ঝুঁকে পড়ে নীল চোখ দুটোকে আধাআধি ঢেকে ফেলে, তাকে দেবরাজ জুপিটারের চেহারার আদল এনে দিয়েছে। তেমনি ক্রুদ্ধ এবং দাম্ভিক।

সে বলল, 'কেন, এদের কোন শেয়ালে তাড়া করেছে?' শুনে বোম্বেটেরা দু'একজন অট্টহাস্য করে উঠল। কোয়েলো কোমর থেকে চাবুক খুলে সামনে যাকে পেল এলোপাথাড়ি দু-চার ঘা মারল। মুখে এমন কদর্য ভাষা বলল যা

কোনো ক্রমেই একজন যাজকের সামনে বলা উচিত নয়। মেষশাবকেরা একটু সতর্ক দূরত্বে সরে গেল।

মেনজেস উদ্ধত চেহারা ও হাবভাবের বোম্বেটেদের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলল, 'এসব মেষশাবকের যথার্থ রাখাল দেখছি প্রভু যিশু নয়, আপনারাই। আর এই যথার্থই ভীত সন্ত্রস্ত শাবকদের কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? এরা কি স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর হতে এসেছে? এরা কোথাকার? কারা এরা? কীভাবে এরা এখানে এল?' সে বন্দিদের দিকে ইঙ্গিত করল।

কোয়েলো হচ্ছে সেই বাঘা কোয়েলো। একবার সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় মানুয়েল কোয়েলো ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। সঙ্গীসাথী এবং ভৃত্যদের সে আদেশ করল পাড়ে নেমে রান্নাবান্না করতে। কিন্তু মাঝিরা কিছুতেই বনের ভিতরে নামতে রাজি হল না। কোয়েলোর সঙ্গীরাও তাকে নিষেধ করল। দাম্ভিক কোয়েলো বলল, 'আরে বাঘও কোয়েলোকে চেনে, কাজেই ধারে ঘেঁষবে না। থামাও নৌকা।'

কিন্তু মাঝিরা সুন্দরবনের বাঘকে চেনে। বস্তুত, জঙ্গলের ফাঁকফোকর দিয়ে বড়মিয়াঁর ডোরার দু-একটা পোচ ইতিমধ্যেই তারা দেখে ফেলেছে। কজেই কোয়েলো অপেক্ষা বড়মিয়াঁকে বেশি ভয় পাওয়াই তারা যুক্তিযুক্ত মনে করল।

অপমানিত কোয়েলো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কোষ থেকে টেনে বার করল তরোয়াল। বলল, 'কই চল দেখি কোথায় তোদের বাঘ। বাঁধ, নৌকা বাঁধ, আমি একাই যাব।'

মাঝিরা ভাবল, সেই ভালো। এটাকে যদি বাঘে খায় এই অসুমার জঙ্গলে, যেখানে বাঘ আর গাছ সমসংখ্যক, তাহলে বাঘ আর কোয়েলো দুটোর হাত থেকেই রেহাই পাওয়া যাবে।

কোয়েলো জঙ্গলের ভিতরে সামান্য ঢুকতেই নৌকার লোকেরা বাঘের আক্রমণাত্মক গর্জন শুনল এবং দ্রুত নৌকা নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিল। কিন্তু শেষ না দেখে তারা যায় কী করে?

বাঘের হুংকারের সঙ্গে সঙ্গে কোয়েলোর হুংকারও মিলল। কিন্তু হুংকার আর আর্তনাদের মধ্যে তফাত কোথায় যখন বাঘে মানুষে লড়াই হয়?

একটু পরে হুংকার বা আর্তনাদ থেমে গেল এবং বাঘের একটা কাটা কান হাতে করে কোয়েলো নদীতীরে এসে দাঁড়াল। মাঝিদের বলল, 'যা

এবার ওটার চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে আয়। ওটার চামড়া দিয়ে ঢাক বানিয়ে বাজাব।' রক্তাক্ত লোকটা নৌকায় পা ঝুলিয়ে বসে রক্ত ধুয়েছিল।

সে যথার্থই সে কাজটা করেছিল এবং সেই থেকে সে বাঘা কোয়েলো।

সেই বাঘা কোয়েলো কবরে পা-বাড়ানো একটা বুড়োর এ ধরনের তির্যক কথাবার্তা সহ্য করে কী করে? তবুও মেনজেসকে সহ্য করতে হয় তাদের। কারণ গোয়ার ক্যাথিড্রালের সঙ্গে সম্পর্ক এই মেনজেস পাদরিরই। গোয়াকে অকারণে চটানো ঠিক নয়। বিশেষ করে এই সময় যখন সন্দ্বীপ পর্তুগিজদের দখলে, শাহাবাজপুর পায়ের তলায়। কাল হতে পারে পুরো বাকলা, পরশু ভালোয়া এবং লক্ষ্মীপুর হতে বাঁধা কোথায়? এবং এসব যদি সম্ভব হয় আরাকান হাতের তালুতে আসতে বেশি সময় লাগবে না।৳

কারভালো বলল, 'করুণাময়, আপনাকে উপদেশ দেওয়া আমাদের সাজে না। কিন্তু ধৃষ্টতা মাফ করবেন, খ্রিস্টান হওয়া ছাড়া অন্য যাবতীয় পথ যখন মানুষকে নরকের আগুনেই নিক্ষেপ করে, কী যায় আসে পদ্ধতিতে?'

খ্রিস্টীয় ১৫৬২-তে মেনজেস সেই যে অপর্টো বন্দর থেকে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল তারপরে পঞ্চাশ বছর বোধ হয় পার হয়ে গেছে। আর ফিরে যাওয়া হয়নি।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে ইউরোপের কোনো খবরই সে রাখে না। কারভালো এই মুহূর্তে যে কথাটা বলল সেটা ইউরোপীয় খ্রিস্টান জগতেরই একটা চিন্তার প্রতিরূপ। আফ্রিকা মহাদেশ থেকে হাজার হাজার কৃষ্ণকায় দাসদাসীকে চরম লাঞ্ছনা এবং অত্যাচারের মাধ্যমে জাহাজের খোলে ঠাসিয়ে ইউরোপ আমেরিকার দাস বাজারে নিয়ে হাজির করা হচ্ছে। স্পেন, পর্তুগাল, ইংরেজ, ওলন্দাজ কেউ সে ব্যবসা থেকে সরে আসার কথা কল্পনাও করে না। কিন্তু খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে কিছু লোকের আঘাত লাগে যে। কিছু মানুষ তো উলটোপালটা কথাও কিছু বলতে চায়, লেখে। ফলে ভয়ভীতি-সঞ্চারি ধর্মীয় বিবেকে একটা প্রলেপ দেওয়া দরকার, বোকাসোকা মানুষ তাতে পাপ ভয় থেকে খানিকটা রেহাইও পায়।

মেনজেস এসব কথা জানে। পর্তুগাল তো আসলে চাষিদের দেশ। কিন্তু চাষিদের দেশ হলে কী হয়, জমি পাথুরে, প্রকৃতি বিরূপ। সন্দ্বীপ কিংবা বাকলার জমির ফলন দেখলে পর্তুগিজদের চোখ কপালে উঠে যাবে এ ব্যাপারটা তো স্বাভাবিক। কাজেই ধর্ম, নীতি, বিবেক, এসবকে চোখ-ঠারা

ছাড়া আর উপায় কী?

এসব কথাবার্তার সময় অ্যাবরেনানশিয়াস কাছেই ছিল। অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসী করার মধ্যে পাদরি কেন এত সব প্রশ্ন তোলেন, তা সে ঠিক বুঝতে পারে না। অবশ্য তার চোখ কান আস্তে আস্তেই খুলছে। খুলছে মেনজেসের সঙ্গে আলোচনাতেই। এদেশে এসে প্রথমে তার ধারণা হয়েছিল যে এ দেশের সবাই বোধ হয় মুর। পরে বুঝল, না, মুররা এদেশের শাসক আর বেশিরভাগ অধিবাসী হিন্দু। আরো পরে দিয়াঙ্গায় কিছুদিন বসবাস করার পর টের পেল আরাকানবাসীরা এ দুইয়ের কোনো দলেই পড়ে না, তারা বৌদ্ধ। যে আরো আশ্চর্য হয়েছিল যে, বৌদ্ধরা নাকি সম্পূর্ণ অহিংস।

মেনজেস তার ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে বলছে, 'এ দেশের মহম্মদিদের তুমি মুর বলছ কেন? এদের মধ্যে একজনও মুর নেই একথা বলছি না। কিন্তু পর্তুগালে যাদেরকে মুর বলা হয়, হিন্দুস্থানে তারা বিশেষ কেউ নেই বলেই আমার মনে হয়। হিন্দুস্থানের মহম্মদিদের মধ্যে তুমি আরবি, হাবসি, আরমানি, মিশরি, পারসি, মোগল পাঠান, উজবেক ইত্যাদি সব জাতের মানুষ পাবে। এরা এদেশ জয় করে এখানে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে আছে না হোক পাঁচ-ছশো বছর, মিলে গেছে এদের মানুষের সঙ্গে। যারা বাইরের ওইসব দেশ থেকে এসেছে, তারা যে আবার তাদের দেশে কোনোকালে ফিরে যাবে এমন মনে হয় না। তবে পর্তুগিজ, ইংরেজ, ওলন্দাজদের সম্পর্কে আমার এরকম মনে হয় না। তারা যতই এখানে ওখানে নানারকম দখলদারি করুক না কেন, স্থায়ী ভাবে এদেশে বসবাস করতে চায় না। তারা বাণিজ্যটাই ভালোভাবে করতে চায়। কিন্তু অনেক জায়গায় অন্যরকম ঘটনা ঘটছে, যেমন গনজালেস সন্দ্বীপের রাজা হয়ে বসেছে।'

অ্যাবরেনানশিয়াস মেনজেসের ব্যাখ্যায় অস্বস্তিবোধ করছে। পাঁচশো বছর ধরে পর্তুগিজরা মুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে মুক্তির জন্য। যুদ্ধ করে জিতেছে। মুরদের প্রতি ঘৃণা সমস্ত পর্তুগিজের রক্তে। কিন্তু বুড়ো মেনজেস এই ভারতীয় মহম্মদিদের তুলনামূলক বিচারে পর্তুগিজদের চেয়ে মহত্তর মানুষ মনে করে। আর ভারত সমুদ্রে, আটলান্টিকে, চিন সমুদ্রের বন্দরে বন্দরে, দ্বীপে কিংবা বার দরিয়ায় যেসব পর্তুগিজ জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বাণিজ্য করে, দস্যুবৃত্তি করে মেনজেস তাদের ঘৃণা করে।

'এরা সবাই যে কোনো উপায়ে ধনোপার্জন করে দেশে ফিরে

ফিউডালগো হয়ে বসতে চায়', সে বলেছে।

কারভালোর কথার উত্তরে মেনজেস বলল, 'এ তত্ত্বটা আপনাদের মাথা থেকেই বেরিয়েছে, ডন কারভালো! পৌত্তলিক হিন্দুরা বিশ্বাস করে বলি দেওয়া কাজটায় দু'ধরনের মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। প্রথমত, বলির আয়োজকদের ধনৈশ্বর্য বৃদ্ধি হয়। আর দ্বিতীয়ত, বলি প্রদত্ত পশু বা মানুষ নিধনের পথে সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ সবারই উপকার!'

বলির কথা উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবরেনানশিয়াসের মনে পড়ল এ অঞ্চলে পর্তুগিজ বাণিজ্য এবং জলদস্যুতা শুরু হওয়ায় প্রথম দিকের বীভৎস ঘটনাটা। একদিন কথা-প্রসঙ্গে মেনজেসই এই গল্প করেছিল তার কাছে। গোয়ায় পর্তুগিজরা থিতু হয়ে বসার পরই গোয়ার প্রশাসক প্রতি বছর বাংলাদেশে একখানা করে জাহাজ পাঠাত। পনেরোশো ছাব্বিশে রুই-ভাজ-পেরিয়ার নামক এক কাপ্তেন চট্টগ্রামের বন্দরে এসেই এ অঞ্চলের সমুদ্রে জলদস্যুতা শুরু করে। তাতে চট্টগ্রামের শাসক পর্তুগিজদের উপর চটে যায়। পেরিয়ার লোকটা দুঃসাহসী তো বটেই, ইতরও। এদেশে তখন পর্তুগিজদের অনুকরণে মোগল বণিকরাও বিশাল আকারে সমুদ্র জাহাজ বানাতে শুরু করছে। বন্দরে এরকম একখানা জাহাজ নোঙর করা ছিল, যার মালিক খাজা শাহাবুদ্দিন। পেরিয়ার জাহাজখানা নিয়ে বার সমুদ্রে বেরিয়ে গোয়ার পথ ধরল। একবার বারদরিয়ায় পড়লে তাকে আর ধরে কে।

এর দুবছর পরে মার্টিন অফেন্সো-দ্যা-মেলো নামে একজন পর্তুগিজ কপ্তেনের একখানা বেসরকারি জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ে পড়ে চট্টগ্রামের কাছাকাছি উপকূলে এসে নোঙর করতে বাধ্য হয়। অফেন্সো-দ্য-মেলো সম্ভবত মালয়, কেড়া, পেরাক, মালাক্কা এইসব পুবের অর্থাৎ দক্ষিণ চিন সমুদ্রের বন্দরগুলোর হাল হকিকত বুঝতেই বেরিয়েছিল। কেননা পশ্চিমের বন্দরগুলোতে রাজশক্তি প্রবল, অনেক প্রতিযোগী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী। ইচ্ছেমতো বাণিজ্য কিংবা বোম্বেটেগিরি কোনোটাই তেমন সহজ হচ্ছিল না। মেলো বা মেলোর মতো এক আধজন তাই নতুন ক্ষেত্র খুঁজছিল।

সমুদ্রপারের জেলেরা মেলোকে চট্টগ্রামে পৌঁছে দেবে বলে চকোরিয়ার শাসনকর্তা খোদা বকসের কছে পৌঁছে দেয়। খোদা বকস খান সেই সময় তার প্রতিবেশী এক জমিদারের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। দলবলসহ মেলোকে সে বন্দি করল এবং মুক্তির শর্ত দিল প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধে তাকে সহায়তা

করতে হবে। পর্তুগিজদের সহায়তায় যুদ্ধে খোদা বকস জয়ী হলেও শর্ত মতো পর্তুগিজদের সে ছাড়ল না।

ঝড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মেলোর অন্য দু'জন সঙ্গী তাদের জাহাজের সর্বস্ব দিয়ে পর্তুগিজদের মুক্তি কিনতে চাইলেও প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধজয়ী খোদা বকস আরো অর্থ চাইল।

অগত্যা শেষ প্রচেষ্টা পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা সফল হল না।

মেনজেস বলেছিল, 'এদেশে হিন্দু পৌত্তলিকেরা নরবলি দেয়, এ কথা জানা আছে তোমার, অ্যাবরেনানশিয়াস?'

অ্যাবরেনানশিয়াস আঁতকে উঠেছিল।

'নরবলি!'

মেনজেস বলেছিল, 'হ্যাঁ নরবলি। সুন্দর, সুলক্ষণ বালক খুঁজে এনে অথবা মা-বাপের কাছ থেকে ক্রয় করে হিন্দুরা বলি দেয় তাদের আরাধ্য দেবীর কাছে।' অ্যাবরেনানশিয়াস এই বীভৎস বর্ণনার মধ্যেও আচমকা একটা বুদ্ধিমান কৌতূহল প্রকাশ করল।

'দেবীর কাছে? পুরুষ দেবতার কাছে নয় কেন?' মেনজেস তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

বলল 'ঠিক বলেছ। এ কথাটা আমি আগে কখনো ভাবিনি কেন? হ্যাঁ আমি শুধু স্ত্রী দেবতার কাছেই বলি দেওয়ার কথা শুনেছি। ত্রিপুরার রাজবাড়ির মন্দিরে প্রতিবছর দেবীর সামনে একটি সুলক্ষণ বালককে বলি দেওয়া হয়। বলিদানের পর সেই রক্ত মেখে মানুষেরা নৃত্য করে। এসব নাকি খুব পুণ্যের ব্যাপার।'

অ্যাবরেনানশিয়াস বলল, 'এ দেশটাকে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের আওতায় যত তাড়াতাড়ি আনা যায়, ততই মঙ্গল।'

মেনজেস বলেছিল, 'কেন? বিশ্বাস বিশ্বাসই। খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসের থেকে পেগানদের বিশ্বাস কি কম জোরালো? শোনো, অ্যাবরেনানশিয়াস, দলবলসহ অফেন্সো-দ্য-মেলো যখন পালাচ্ছিল তখন আরো বিপর্যয় হয় তাদের। গ্র্যামের লোকের কাছে তারা ধরা পড়ে। এইলোকগুলো মুসলমান ছিল না, ছিল হিন্দু, দলের মধ্যে ফেন্সো-দ্য-মেলোর অপূর্ব সুন্দর নিতান্ত তরুণ ভাইপো গনজালেস-ভাস-দ্য-মেলোও ছিল। ব্রাহ্মণেরা এরকম সুলক্ষণ,

সুন্দর বালককে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। সে গ্রামে কারও হয়তো বলির মানত ছিল। দেবতাই তার বলিকে জুটিয়ে দিয়েছেন, এমন বলা হল সেখানে এবং পরম সমারোহে সেই বালককে দেবীর সামনে বলি দিল ব্রাহ্মণেরা।'

শুনে দীর্ঘ সময় স্তব্ধ হয়েছিল অ্যাবরেনানশিয়াস। পরে বলল, 'আর অফেন্সো? তার কী হল?'

মেনজেস বলল, 'শেষ পর্যন্ত গোয়ার ভাইসরয় ন্যুনো-দ্য-কুনহোর প্রচেষ্টায় সেই শাহাবুদ্দিন, যার জাহাজ পেরিয়ার লুট করে গোয়ায় নিয়ে গিয়েছিল, মধ্যস্থতা করে। তিন হাজার ক্রুসেড এবং যাবতীয় জিনিসপত্রসহ সাহাবুদ্দিনের জাহাজের বিনিময়ে অফেন্সোকে মুক্ত করা হয়।

কারভালো কিংবা কোয়েলো সাহসী কিন্তু ধৈর্যহীন মানুষ। তারা দেখল এ খেপা বুড়োর সঙ্গে অনাবশ্যক তর্কাতর্কিতে গিয়ে লাভ কী। তার থেকে বরং দায়িত্বটা যখন ওর, ওর ঘাড়ে রেখে দিয়েই সরে যাওয়া ভালো।

কারভালো বলল, 'করুণাময়, ঈশ্বরের অভিসন্ধি আমরা কেউ জানি না। তবে ঘটনাচক্রেই হোক আর দৈব নির্বন্ধেই হোক, আমরা পৃথিবীর এক প্রান্তে, আমাদের স্বদেশ থেকে বহু দূরে একত্রে আছি। আপনি নিজেই স্থির করুন এই হতভাগ্যরা প্রভুর করুণা পাবে কিনা।'

অভিবাদন করে দুজনেই চলে গেল।

মেনজেস জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দুজনের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে অ্যাবরেনানশিয়াসের দিকে ফিরল।

বলল, 'কী রকম চালাক দেখলে? আমি অবশ্য চাচ্ছিলামও যে ওরা চলে যাক। নরকের কীট কতকগুলো!'

অ্যাবরেনানশিয়াস পাদরির মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

পাদরি বলল, 'এবার কাজ শুরু কর। ওদের ডেকে হিন্দু মুসলমান আলাদা হয়ে দাঁড়াতে বল।'

দেখা গেল তিনভাগের দু'ভাগ মোটামুটি হিন্দু এবং একভাগ মুসলমান। পাদরি মেনজেস হিন্দুদের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'প্রভু যিশুর মহান ধর্মে আগামীকাল তোমাদের দীক্ষিত করা হবে। তোমাদের কারো কিছু বলবার আছে?'

চেহারা একসময় সুকুমার ছিল এমন একজন কৃশকায় তরুণ বলল, 'এরকম একটা কথা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামিকে জিজ্ঞেস করা হয় বলে

শুনেছি। তোমার কাছে তো আর কোনো বিকল্প নেই, পাদরি?'

মেনজেস পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। বলল, 'তুমি ব্রাহ্মণ, না?'

তরুণ বলল, 'ছিলাম, এখন আর নই। যবন সংস্পর্শে, যবন স্পৃষ্ট খাদ্য খেয়ে আমার জাত নষ্ট হয়েছে।'

'জাত নষ্ট হয়েছে!' মেনজেস বলল, 'জাত কি দুধ কিংবা পাকা ফল যে পচে নষ্ট হবে?'

তরুণ বলল, 'কী উপমা! দুধ, ফলের অভাব কী এদেশে? পচলে ফেলে দিয়ে ফের নিয়ে আসা যাবে। তোমরা তো দুধ, ফলের লোভেই এদেশে এসেছ? দুধ ফল শস্য মাংস?'

'তবে কী সে বস্তু?' মেনজেস বিস্তারিত হতে চাইল? 'সে কী তোমার ধর্ম? অথবা ধর্মের থেকেও বড় কিছু?'

তরুণ বলল, 'ধর্মও এবং আমার রুচি, শিক্ষা, আচার।'

অ্যাবরেনানশিয়াস তার প্রায় সমবয়স্ক লোকটির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে। ডানদিকের কানের লতিতে রক্ত জমে আছে, সম্ভবত লুণ্ঠনের সময় কোনো দস্যু কানের স্বর্ণকুণ্ডল টেনে ছিঁড়ে নিয়েছে। হতবল কিন্তু দাম্ভিক বুদ্ধিমান চেহারা এবং কথাবার্তার কেমন যেন নিরুদ্বেগ নিয়তিবাদীর মতো। অ্যাবরেনানশিয়াস মেনজেসকেও চেনে। যদিও উপযুক্ত সময় নয় কিন্তু সমান দাম্ভিক পাদরি এই তরুণের সঙ্গে একটা বিতর্কে ঢুকে পড়তে পারে। অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়, শুধুমাত্র জানবার জন্য। অদম্য জানার স্পৃহা এই অশীতিপর পাদরির।

সে বলল, 'তোমার এই নষ্ট ধর্ম এবং জাত কি আর পুনরুদ্ধার করা যায় না!'

তরুণ বলল, 'মনে হচ্ছে বিষয়টা সম্পর্কে তোমার যা হোক একটা ধারণা আছে। তবুও তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, জাত গেলে হিন্দুর আর কিছু থাকে না।'

'আমি শুনেছি হিন্দু শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে জাত এবং ধর্ম খোয়ানো মানুষ আবার স্বজাতে, স্বধর্মে ফিরে আসতে পারে।'

মেনজেস তীক্ষ্ণ জুপিটার চোখে তাকিয়ে রইল তরুণের দিকে।

তরুণ বলল, 'হিন্দু প্রায়শ্চিত্তের বিধান বড় ভয়ংকর। বহুক্ষেত্রে প্রাণ পর্যন্ত চলে যায়। প্রায়শ্চিত্ত ধর্ম মানলেও সমাজ মানবে না। চিহ্নিত করে

রাখবে বংশপরম্পরায়। জাত সমাজের সম্পত্তি, ধর্মের নয়।'

পাদরি মেনজেস খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'আরেকটা সংশয় আছে আমার, তোমাকে শেষ প্রশ্ন করি। তোমাকে যদি খ্রিস্ট এবং মহম্মদের ধর্মের মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তুমি কোন্‌টা পছন্দ করবে?'

'খ্রিস্টধর্ম।' তরুণ যেন কিছুমাত্র না ভেবে তৎক্ষণাৎ উত্তর করল।

'কেন?' মেনজেস যেন জানত।

'আমরা হিন্দুরা অন্য ধর্মকে আত্মস্থ করি, হিন্দুধর্মের অসংখ্য শাখা উপশাখার মধ্যে ঢুকিয়ে নিই। ইসলামের ক্ষেত্রে এই আত্মীকরণ পদ্ধতি তেমন কাজে লাগেনি। একেবারে যে লাগেনি তা নয়, তবে ইসলামের প্রহরীরা ভারী সতর্ক এবং কঠোর', তরুণ উত্তর করল।

'খ্রিস্টানধর্ম অনেক নমনীয় হবে বলে তুমি আশা কর?' পাদরি বিষয়টা থেকে কেন যেন সরতে চাইছে না।

তরুণ মুখে কিছু না বলে, ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল। মাথার সঞ্চালন 'হ্যাঁ' বাচক।

মেনজেস খুব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন? কেন এমন মনে হচ্ছে তোমার?'

অ্যাবরেনানশিয়াস এই প্রথম তরুণের সপ্রতিভতাকে সংকুচিত হতে দেখল। সে রহস্যময় হাসি হাসতে চেষ্টা করল, হাসলও কিন্তু তার মনে হল তাতে বুদ্ধিদীপ্তি ছিল না আগের মতো।

মেনজেস বলল, 'ব্রাহ্মণ, আমি তাহলে আশা করতে পারি যে আগামীকাল সকালে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হতে তুমিই হবে আমাদের প্রথম এবং প্রধান ব্যক্তি?'

তরুণ পাদরির চোখ থেকে চোখ সরিয়ে প্রাঙ্গণের সীমানায় দাঁড়ানো একটা বিশাল দেবদারু গাছের শীর্ষে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। খানিক সময় ওভাবে কী যেন চিন্তা করে চোখ মাটিতে নামিয়ে সে বলল, 'অগত্যা।'

'তোমার দলের অন্য হিন্দুরা নিশ্চয়ই এ নিয়ে আর দ্বিমত পোষণ করবে না।' মেনজেস জিজ্ঞেস করল।

তরুণ বলল, 'আমি এদের দলপতি নই পাদরি। তবে মনে হয় খুব একটা অশান্তি তোমাদের হবে না।'

পাদরির ইঙ্গিতে অ্যাবরেনানশিয়াস হিন্দুদের সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি, সবাই খ্রিস্টান হতে সম্মত আছ তো?'

সবাই চুপ করে রইল। শুধু একজন গর্জন করে উঠে বলল, 'কক্ষনো নয়, জীবন থাকতে ধর্মান্তরিত করতে পারবে না কেউ আমাকে!'

অন্য এক ব্যক্তি তার কথার রেশ টেনে তাকে সমর্থন করল। সগর্বে বলল, 'হ্যাঁ!'

অ্যাবরেনানশিয়াস মুসলমানদের সামনে দাঁড়িয়ে একই প্রশ্ন করল। প্রায় সব কজন একেবারে সমস্বরে বলল, 'না-া-া! আমরা কক্ষনো ঈশাই হব না।'

পাদরি মেনজেস জানে জোর করে এদের খ্রিস্টান বানানো হবে কিন্তু যদি কখনো এরা সুযোগ পায় বা যখনি সুযোগ পাবে, সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো ধর্মাচরণে ফিরে যাবে। আইবেরিয়ার পাঁচশো বছরের ক্রুসেড শেষ হয়েছে তাও হয়ে গেল দুশো বছর। এই দুশো বছরে মুসলমান শক্তি পর্তুগালে খুব পরাক্রমবিহীন নয়। গ্রানাডার পতন হল পনেরো শতকের শেষে। এই সাতশো বছরের মধ্যে মুরদের সঙ্গে পর্তুগাল এবং স্পেনের বাণিজ্য হয়েছে, সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান হয়েছে কিন্তু ধর্ম বিরাট বিভেদের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বিভেদের ফলে সংঘর্ষও অব্যাহত আছে।

পর্তুগিজরা যাকে বলে রিকংকুয়িস্তা, তার বয়সও দুশো বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু স্পেন, পর্তুগালে যারা স্বেচ্ছায় বা বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে, মেনজেস এসব জানে, খ্রিস্টানরা তাদের ফের নিজেদের আয়ত্তে ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ সফল হয়নি। যুবকের রহস্যময় হাসিটা হঠাৎ কেন যেন এতক্ষণ তার কাছে অর্থবহ মনে হল। তার এও মনে হল মহম্মদি ধর্মে অত্যন্ত শক্তিশালী এমন কোন রসায়ন আছে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মমতে নেই।

১৫

ধাত্রীনগর এবং আরো তিনটি গ্রামে মগ আক্রমণের পরে নয়দিন পার হয়ে গেছে। এই নয়দিনে মোটামুটি যা হিসাব হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ছাব্বিশজন স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা মগেরা ধরে নিয়ে গেছে। এই ছাব্বিশ জনের মধ্যে চার জন পঞ্চাশ-ষাটোর্ধ্ব প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ আছে। এরা সবাই অবস্থাপন্ন মানুষ।

মগেরা প্রায় এক প্রহর সময় ধরে লুঠতরাজ এবং হল্লা ও ধর্ষণ করে। যারা ধর্ষণযোগ্য এবং ধর্ষিত, মগেরা তাদের কাউকেই ফেলে রেখে যায়নি। লুণ্ঠনের সময় লুকানো .ধনসম্পদ বের করে না দেওয়ায় ক্রুদ্ধ মগেরা তিনজনকে হত্যা করেছে।

সচ্ছল অবস্থার সবকটি পরিবারের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়েছে। দরিদ্র পরিবারগুলির সম্পদ তাদের অল্পবয়স্ক পুত্রকন্যারা। মগ যাকেই ধরতে পেরেছে, বন্দি করেছে। নদীতে মগের নাও নোঙর করার খবর পাওয়া মাত্র গ্রাম ফাঁকা হয়ে যায়। সবাই জঙ্গলে আশ্রয় নিতে ছোটে এবং ঘন জঙ্গল ও কাঁটা লতা ঝোপের আড়ালে অনেক ভিতরে ঢুকে তারা লুকিয়ে পড়ে। তারাই মগের হাতে ধরা পড়েছে যারা দৌড়তে অক্ষম, রোগগ্রস্ত বা পালাবার সময় বা সুযোগ পায়নি।

এই শেষোক্ত দলে বিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্যের স্ত্রী এবং দুই কন্যা পড়ে। যেহেতু তাদের বাড়িতে কালীপুজোর প্রচলন নাই, তারা তাদের নিকটতম জ্ঞাতির বাড়িতে পূজার উপাচার পৌঁছে দিতে গিয়েছিল। আচমকা 'মগ-মগ' চিৎকারে দিশা ঠিক করতে পারেনি যে কোন দিকে পালাবে। ফলে একবার এদিক আর একবার ওদিক করে ঠিক যে দিক থেকে মগেরা এগিয়ে আসছিল,

সে দিকেই দৌড়তে থাকে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে।

নদী যেহেতু গ্রামকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরেছে সেই কারণে মগেরা ওই গোটা অর্ধচন্দ্র ধরে গ্রামে প্রবেশ করেছিল। অন্তত ছ-সাতটি জায়গাতে তারা নাও নোঙর করে, প্রতি দলে আটজন-দশজন করে উঠে গ্রামের দিকে এগিয়ে আসে। মগেরা সংলগ্ন গ্রাম আঁধারমানিকে প্রবেশ করেনি। তার কারণ আঁধারমানিকের নগদিদের যোদ্ধা হিসাবে খ্যাতি আছে। তাদের রামদা, তলোয়ার, বল্লম, রায়বাঁশ, টেঁটা ইত্যাদি অস্ত্রগুলো নিয়মিত শান দেওয়া হয়। এ খবর সম্ভবত মগদের কাছে ছিল।

জঙ্গলেও পালায়নি আবার মগদের হাতে ধরাও পরেনি এরকম তিনটি পরিবার ধাত্রীনগরে ছিল। এই তিনটি পরিবারেরই মাটির তলায় এক ধরনের আপৎকালে লুকিয়ে থাকার জন্য সুড়ঙ্গ ঘর ছিল। যার প্রবেশ পথ জানা না থাকলে কোনো লোকের পক্ষেই বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয়।

ধাত্রীনগরের সবচেয়ে সচ্ছল গৃহস্থ নাগভূষণ বসুর বাড়িতে ইটের তৈরি একটি মন্দির আছে। মন্দিরের বিগ্রহ সদাশিবের। মন্দিরের চাতাল পাথরের। কোনো একটি পাথরের নীচ দিয়ে গেছে সুড়ঙ্গ পথ। নাগভূষণ ঢাকায় নবাবি দপ্তরের হিসাব রক্ষকের কাজ করে। বর্তমানে সে কর্মক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় সুড়ঙ্গের ঘর আছে কবিরাজ ক্ষেমংকর সেনের বাড়িতে। মগের হল্লা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেমংকর স্বয়ং, ওলন্দাজ বণিক ইয়েকব, বিষ্ণুপ্রিয় এবং বাড়ির দু-তিনজন মহিলা, ক্ষেমংকরের ব্যক্তিগত দাসী ময়ূরী সুড়ঙ্গ পথে ঢুকে আত্মরক্ষা করেছিল।

তৃতীয় গোপন কক্ষটির গৃহস্থ দয়ালহরি চক্রবর্তীর। দয়ালহরির পরিবারও সুড়ঙ্গে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে।

ধাত্রীনগরে মগদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে মাত্র একজন ব্যক্তি। সেও ধাত্রীনগরের নাগরিক নয়। আঁধারমানিকের আবু মুসার মূকবধির পুত্র আবু নিসার বিষ্ণুপ্রিয়র কন্যা শর্মিষ্ঠার ইজ্জত বাঁচাবার জন্য মগদের আক্রমণ করে একজন ফিরিঙ্গিকে হত্যা করেছে। আরো দুজনকে জখম করে নিজে নিহত হয়েছে।

গ্রামব্যাপী হাহাকারের মধ্যে একসময় টের পাওয়া যায় জীবন আবার চলতে শুরু করেছে। যাদের ঘরবাড়ি শুধুমাত্র লুণ্ঠিত হয়েছে, তারা সব থেকে ভাগ্যবান। মগ তাদের পাত্তা পায়নি, শুধু ধনসম্পত্তি নিয়ে চলে

গেছে, এ বড় কম কথা নয়।

মগ যাদের স্পর্শ করেছে, মারধর করেছে অথচ নিয়ে যায়নি, তারা আতঙ্কিত এই ভেবে যে, মগস্পর্শ দোষে সমাজপতি যে কোনো সুযোগে তাদের সমাজচ্যুত করবে।

যাদের ঘরের বালক-বালিকা যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে মগ তাদের নৌকায় উঠিয়ে নিয়ে চলে গেছে, তাদের জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে। তারা কী করবে, কার কাছে নালিশ জানাবে, কিছুই বুঝতে পারছে না।

সব থেকে অসহায় অবস্থা বিষ্ণুপ্রিয়র। তার আত্মীয়রা তাকে বাড়িতে আটকে রেখেছে। তার মানসিক ভারসাম্য সাময়িকভাবে নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

মগ আক্রমণের পর দিনই ইগনেশিয়াস সরজমিনে তদন্ত করে গেছে। দশদিন পরে সে আবার এল। এসে সরাসরি দয়ালহরির বাড়িতে গিয়ে সে হাজির হল। তাদের মধ্যে কী কথা হল বাইরের কেউ জানল না।

ইগনেশিয়াস তারপরে ক্ষেমংকর সেনের বাড়িতে গেল। ইয়েকব তখনো সেখানে ছিল। কেননা ক্ষেমংকরের সোহাগপাশায় না ফিরে গেলে ইয়েকব একাকী সেখানে যেতে ভরসা করছে না। আবার ক্ষেমংকরও এই বিধ্বস্ত গ্রামকে এভাবে ফেলে নিজে সোহাগপাশায় গিয়ে সুখে থাকতে চাইল না।

ইগনেশিয়াস বলল, ‘খান সাহেব আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।’

‘কেন? কেউ কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?’

ক্ষেমংকর ব্যস্ত হল।

‘অন্দরমহলে কেউ বোধহয় সন্তানসম্ভবা। বোধহয়, কিছু শারীরিক অসুবিধা দেখা দিয়েছে। আপনিই ভালো জানবেন।’

ক্ষেমংকর জানে বটে। খানের পুত্রবধূর সন্তান হবে এই প্রথম। ফলে দুশ্চিন্তা ক্ষেমংকরেরও কম নয়।

‘মগদের বিষয়ে কিছু খোঁজখবর পেয়েছেন নাকি?’

ইগনেশিয়াস একটু ইতস্তত করে বলল, ‘কিছু পেয়েছি কিন্তু সে খবরে এখন আর কী হবে? ভবিষ্যতের শিক্ষা হিসাবে যদি কোনো কাজে লাগে। আচ্ছা কবিরাজ মশাই, যুগল সাধু নামে কোনো ব্যক্তি কি আপনার কাছে এসেছিল? যুগল সাধু একজন বেনে।’

‘যুগল সাধু-যুগল সাধু, নামটা যেন চেনা চেনা লাগছে! ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। চাঁদপুরের সওদাগর যুগল সাধু। এসেছিল তো। কেন বলুন তো?’

'কী রোগের চিকিৎসার জন্য এসেছিল?'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সে তো ভয়ংকর রোগ—উপদংশ। তার তো কোনো চিকিৎসা নেই, সে কথাও তার কাছে গোপন করিনি। আমাদের তো সব কথাই খুলে বলার নিয়ম।'

ইগনেশিয়াসের মুখের স্বাভাবিক রং বিষণ্ণতা। সেই বিষণ্ণ মুখাকৃতি আরো করুণ হল।

'যুগল সাধুর কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?'

ক্ষেমংকরই আবার জিজ্ঞেস করল।

ইগনেশিয়াস সংক্ষেপে যুগলের সম্পর্কে যতটুকু সন্দেহ তা বলল।

'তাকে কি গ্রেপ্তার করেছেন?'

'না, তবে তার একজন গোলামকে জামিন রেখে তার নাও ছেড়ে দিয়েছি। তার সম্পর্কে কারুর তো কোনো অভিযোগ নেই। কোনো প্রমাণও নেই আমাদের হাতে। কিন্তু আমার সন্দেহ ধাত্রীনগরের এই মগ আক্রমণের সঙ্গে ওর কোনোরকম যোগাযোগ আছে। যুগল মেঘনার বুকে আমাদের কোশা দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার নাও নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। আমাদের সন্দেহ হয়েছিল। তার নাও আটকাবার পর সে বলেছিল, দূর থেকে যুদ্ধযান দেখে সে নাকি ভেবেছিল মগের কোশা। আমার বিশ্বাস হয়নি। তবে সমস্ত গোষ্ঠীর বণিকেরাই তো বেশ শক্তিশালী। তাছাড়াও খান সরকারি প্রয়োজনেও এদের কাছ থেকে অর্থ ধার নেন। সাধু খানের বিশেষ পরিচিত।'

'ওই আটক করা লোকটি কি কিছু সন্ধান দিয়েছে?'

'দিয়েছে। লোকটির চোখ দেখে আমার মনে হয়েছিল ও কিছু কথা বলতে চায়। তাই ওকেই আটক করেছিলাম। ও অনেক কথাই বলেছে। সম্ভবত কোনো কারণে মালিকের উপরে তার ঘৃণা এবং আক্রোশ হয়েছে। আপনার গ্রামের যেসব স্ত্রীলোক লুণ্ঠিত হয়েছে তাদের মধ্যে দুই মেয়েসহ এক মা কেউ আছে?'

'হ্যাঁ!'

'বিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্যের পরিবার তো?'

'হ্যাঁ!'

'যুগল সাধু ছোট বালিকাটিকে ধর্ষণ করেছে। কোনো চিকিৎসক তাকে এমন নিদান দিয়েছে যে অক্ষতযোনি—'

ক্ষেমংকর মুখ নামিয়ে নিল। মগ লুণ্ঠিত বালিকার সম্পর্কে মানুষ আর

কোনো আশা মনে পোষণ করার যুক্তি খুঁজে পায় না। তবুও মৃত্যু যেহেতু সম্পূর্ণ ছেদ, সেই কারণে সময়ে ব্যাপারটা মা বাপ স্বজনেরা প্রকৃতির নিয়মে মেনে নেয়, কালের নিয়ম হিসাবে সান্ত্বনাও পায় এক সময়।

কিন্তু মগের হাতে লুণ্ঠিত কন্যা কোথাও না কোথাও আছে। শরীর, মন, ধর্ম, অস্তিত্বের সমস্ত কিছু নিয়ে সে লাঞ্ছিত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে, এই যন্ত্রণা দীর্ঘকাল ধরে মনে পুষে রাখে। শেষে বহু বছরের কালক্রম যখন দৈনন্দিনতার মধ্যে বিষয়টাকে হারিয়ে ফেলে তখনো ক্বচিৎ কখনো কোনো ঘটনার সূত্র ধরে স্মৃতি জেগে ওঠে এবং পুরানো ক্ষতের উপরে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের খোঁচা লাগে।

বারো-চোদ্দো বছর আগের ঘটনার কথা স্থানীয়রা সবাই মনে রাখেনি। কিন্তু সিন্ধুবালার আশ্চর্য রূপের কথা নিশ্চয়ই কারো কারো মনে আছে। সিন্ধুবালাকে বাঘে নিয়ে গিয়েছিল, এমনই জনশ্রুতি। কিন্তু বাঘে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেও অন্য গল্প থাকে। সে সবও নিশ্চয়ই মনে আছে অনেকের।

সোহাগপাশার গাঙের ঘাটের শতাধিক বেবাইজ্যার নাও এসে লেগেছিল। বেবাইজ্যারা দশ-পনেরো খানা নাওয়ের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আশপাশের কাছে-দূরের গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ধাত্রীনগরের নদী আঁধারমানিকে ইগ্‌নেশিয়াসের অধীন এরকম পনেরোখানা নৌকার আড্ডা ঘাট থেকে সামান্য সরে ঘাটি গেড়েছিল। জলবেদেদের নানা বয়সের স্ত্রীপুরুষ বাঁশবাজি, দড়িবাজি, সাপ ইত্যাদির খেলা, হাতসাফাই ভানুমতি, বাতের ওষুধ, ধাতের ওষুধ, বাঁজা মেয়েমানুষের সন্তানবতী হওয়ার ওষুধ ইত্যাদি নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াত।

একদিন বিকেলবেলায় বেদেদের আড্ডায় একব্যক্তি খোঁজখবর নিতে এল। মধ্যবয়স্ক লোকটি ভৃত্যস্থানীয় হলেও একধরনের কর্তৃত্বে অভ্যস্থ।

'পরশু সকালে বাওনপাড়ার কোন মাথারি গেছিল, সর্দার?'

বেদেরা সদা সতর্ক মানুষ।

'বাওনপাড়ার তো কেউ যায় নাই', ইগনেশিয়াস নির্দ্বিধায় বলেছিল। কিন্তু নৌকার ছইয়ের তলা থেকে ততক্ষণে আউলাকেশি মাথা বার করেছে।

'ক্যান, জিগায় ক্যান?'

'এট্টু বাইরে আয়ো, কথা আছে।'

আউলকেশি বাইরে এল।

'কী কথা?'

'তয় তুমিই গেছিলা?'

'হ, জিগায়েন ক্যান?'

'যে বাড়ি গেছিলা হের দক্ষিণে তিনবাড়ি পরে মাধব ভট্টাচায্যের বাড়ি। হেই বাড়িতে সন্ধ্যার পর একবার যাইতে হইবে।'

'ক্যান্, হে বাড়িতে আমি যামু ক্যান্?'

'হেয়া আমি জানি না, তয় মনে লয় তুমি কিছু জান। হে বাড়িতে এক বুড়ি আছে, হে তোমারে দ্যাখতে চায়।'

'যাইয়া কী অইবে? যামু না আমি,' অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলেছিল আউলাকেশি।

আগন্তুক বলল, 'আমার কওয়ার কথা কইলাম, এহন তোমার যা ভালো মনে লয় করবা।' সে বিদায় নিয়েছিল।

সন্ধ্যার পরে অন্ধকারের মধ্যে নির্দিষ্ট বাড়িটির বেড়ার গর্তে চোখ লাগিয়ে বসে ছিল ইগনেশিয়াস। ভিতরের আঙিনায় উবু হয়ে বসে আছে আউলাকেশি। এক অতিবৃদ্ধা স্ত্রীলোক আঙিনা থেকে প্রায় এক মানুষ উচ্চতার দাওয়ার উপরে শুয়ে আছে। দাওয়ার উপরে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছে। সেই আলোয় অন্ধকার খুব কমই কেটেছে। আধা-আলো, আধা-অন্ধকারে বিভিন্ন বয়সের কিছু স্ত্রীপুরুষ এদিকে-ওদিকে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে আছে।

খুব ক্ষীণস্বরে বৃদ্ধা কিছু নির্দেশ দিল, যা ইগনেশিয়াস দূর থেকে শুনতে পেল না। দেখল, খোঁজখবর নিতে যাওয়া লোকটি প্রদীপ হাতে আঙিনায় নেমে এল। আউলাকেশির মুখের সামনে আলো ধরে সে দেখতে লাগল। সম্ভবত কোনোরকম শনাক্তকরণ হচ্ছিল আউলাকেশির।

'হ ওর কানে দুইডা ফুডা আছে, ঠারইন।' বৃদ্ধা আবার কিছু বলল।

'হ নাকের ফুডার উপরে নাকফুলের মতো এট্টা তিঁলা আছে।'

'তোমার নাম কী মাথারি?'

আউলাকেশি পরিষ্কার উচ্চারণে বলল, 'আমার নাম আউলাকেশি, আউলাকেশি দেছেলবা।'

'তুমি কি খ্রিস্টান হইছ, মাইয়া? তোমার সোয়ামির নাম কী?'

'হ, আমি খ্রিস্টান হইছি। আমার সোয়ামির নাম ইগনেশিয়াস দেছেলবা। মোরা রোমার কাত্তিক।'

'তোমার সোয়ামি কি মগ?'

'না, আমার সোয়ামি পর্তুগিজ ফিরিঙ্গি।'

এতক্ষণে বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেল ইগনেশিয়াস। সে যথা সম্ভব উচ্চস্বরে বলল, 'হা ভগবান, হা ভগবান, এই লইগ্যাই হেলে এতদিন বাচাইয়া রাখছ আমারে? এই লইগ্যাই—হা আমার ধম্মো, হা আমার পোড়াকপালের জাত! এই লইগ্যাই—' কান্নায় তার কণ্ঠস্বর ডুবে গেল।

আঙিনায় স্থির হয়ে বসে থাকা আউলাকেশির শরীরে একটা আলোড়ন উঠল। সশব্দে ফুঁপিয়ে উঠল সেও।

'আমারে একটু আমার মায়ের পাও দুইহান ছুইতে দিবেন, নোয়াবউঠারইন? এজন্মে নোর তো কোনোদিন এমন দিন পামুনা, নোয়াবউঠারইন!'

একটা পুরুষ কণ্ঠে প্রবল নিষেধ উঠল ততক্ষণাৎ, 'না'!

'ওমা, আমি তোমার পাও দুইখান এট্টু ছুমু, মাগো?'

'না, ছুইস না। ছুইয়া কী করবি? আর কি আমাগো জীবন জোড়া লাগবে? এ জীবন তো গেল নরকের আগুনে ভাজাপোড়া হইয়া, যদি ওপারের জীবন এয়াখিকাও ভয়ানক হয়! আমারে আর নতুন করিয়া পাপের ভাগী করিস না!' বৃদ্ধার করুণ কণ্ঠ নিঃশ্বাসের অন্তিমে হারিয়ে গেল। দুবার দপদপ করে প্রদীপও নিভে গেল।

ইগনেশিয়াস বেড়ার বাইরে থেকে আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, কোনো শব্দও আর শুনল না। কিছুক্ষণ পরে অন্ধকারের মধ্যে আউলাকেশি এসে তার গায়ে হাত দিল।

আর তখনি বৃদ্ধার অন্তিম চিৎকার শুনল তারা।

'ও মনু, তুই কি চলিয়া গেছ? ওরে আয় একবার, একবার আমার কোলে আয়।'

শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দে তার বিলাপও আর বোঝা গেল না। ইগনেশিয়াস আউলাকেশির হাত শক্ত করে ধরে অন্ধকারের ভিতরে মিলিয়ে গেল।

পরদিন আগের দিনের লোকটি দুপুরের দিকে ফের আসল। আজ সে নদীর পাড় থেকে নাম ধরেই ডাক দিল।

'আউলাকেশি?'

'কেডা ডাকে?'

লোকটি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'কিছু কইবেন?' আউলাকেশি পাড়ে উঠে এল।

'হ, কই কী, কাইল তুমি চলিয়া আওয়ার পর ধলাঠারইন দ্যাহ রাখছেন। আহাহা, খুব পুণ্যমানী আছিলেন হ্যায়। সাক্ষ্যাত দ্যাবতা!'

আউলাকেশি চোখ ঘুরিয়ে নদীর ভাটির দিকে তাকিয়ে রইল। দু চোখে জল নামল তার। একটু পরে বলল, 'দাহের কাম হইয়া গেছে?'

আগন্তুক বলল, 'ঘাডে লইয়া আইছে। এই বেঁকি পার হইলেই শ্মশান।'

লোকটি চলে গেল।

একটু পরে নিজের নাওয়ে উঠে আউলাকেশি বৈঠা হাতে তুলে নিল। ইগনেশিয়াস কাছেই ছিল, নৌকায় উঠে বলল, 'বৈঠাখানা আমারে দেও।'

বাঁক পার হয়ে যখন তারা শ্মশানঘাটে এল, ততক্ষণে চিতা সাজানো হয়েছে। স্নানের জন্য শব জলের ধারে নিয়ে আসছিল শ্মশানবান্ধব। তারা সবাই ব্রাহ্মণ। ঘাড়ে বুকে ঝোলানো পৈতার গোছাতে যা সপ্রমাণ।

অগ্রবতী একজন শববাহীদের বলল, ''খাড়াও, খাড়াও, ঘাডে বেভাইজ্যার নাও। ও ব্যাডা, ও মাথারি, নাও লইয়া দূরে যাও। বাওনের রাঢ়ির দাহ অইবে।'

ইগনেশিয়াস লগি ঠেলে কিছুটা পিছিয়ে গেল। ব্রাহ্মণের বিধবা ধলাঠারইনের অঙ্গের শেষ বস্ত্রটুকু টান মেরে ফেলে দিয়ে স্নান করানো হল। দূর থেকে হলেও আউলাকেশি জন্মদাত্রীকে দেখল চোখ মুছতে মুছতে। একটু পরে হরিধ্বনি উঠল, 'বলহরি— হরিবল, বলহরি—'

ইগনেশিয়াস বলল, 'আমেন।'

কপালে, বুকে ক্রুশ আঁকল সে, ক্রুশ চিহ্ন আঁকল আউলাকেশিও। নদীর পার তাদের দৃষ্টিকে চিতা থেকে আড়াল করছিল। তারা উঠে দাঁড়াল। প্রবল হরিধ্বনির সঙ্গে ধোঁয়া ঊর্ধ্বগামী দেখল তারা। একটু পড়ে চড়চড় করে আগুন লাফিয়ে উঠতে দেখল। দু-চোখে ধারা আউলাকেশির। অবরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল, 'সিদ্ধা মারিয়া তুমি পরমেশ্বরের মাতা। সাধ্বী, আমরা পাপের কারণ পিরথিমিতে আসি, আর আমারদিগের মৃত্যুর কালে, আমেন যেশুস!'

এসব যন্ত্রণার কথা সবাই জানে। জানে অধোবদন ক্ষেমংকর এবং

অবশ্যই মোগল নওয়ারার এক আঞ্চলিক দারোগা ইগনেশিয়াস।

লোকটা আমার কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। ক্ষেমংকর বলল, 'আমি তাকে সতর্ক করেছিলাম। বলেছিলাম রোগ ছড়িয়ে দেওয়া যায়, চালান করে দেওয়া যায় না। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে লোকটা আমার কথা বিশ্বাসও করেনি, অবিশ্বাসও করেনি। যে হাতুড়ে তাকে এমন পরামর্শ দিয়েছিল, তার কথাও যে সে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিল, হয়তো এমনও নয়। সম্পূর্ণ বিবেকহীন মানুষ আমাদের চারপাশে অজস্র।'

ইগনেশিয়াস বলল, 'শোনা যায় এ দেশে এই রোগের আমদানি আমরা পর্তুগিজরা নাকি করেছি?'

ক্ষেমংকর বলল, 'এমন একটা কথা আমাদের চিকিৎসকদের মধ্যে প্রচলন আছে বটে, কিন্তু নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।'

'আপনাদের শাস্ত্রে এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই?' ইগনেশিয়াস জানতে চাইল।

ক্ষেমংকর বলল, 'না নেই। এ ধরনের রোগে আমরা সেঁকো বিষ অনেক সময়ে প্রয়োগ করি। কিন্তু সে বিষের পরিমাপ ঠিক না হলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ফল বেশিরভাগ সময়েই আশানুরূপ হয় না।'

ক্ষেমংকরের মনে পড়ল তার গুরু, মহাশয় বরণীয়, বলেছিলেন ইউরোপে ধমনিতে ছুঁচ পিচকারির সাহায্যে ওষুধ প্রয়োগে ভালো ফল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেও এখনো পরীক্ষার স্তরে।

ইগনেশিয়াস ফিরে যাওয়ার আগে ক্ষেমংকর বলল, 'ধাত্রীনগরের গ্রামবাসী খান সাহেবের কাছে কিছু আর্জি জানাবার জন্য উপস্থিত হতে চায়। পাঁচ-ছজন হিন্দু মুসলমানকে নিয়ে কাল বাদে পরশু আমরা দরবারে উপস্থিত হব। সাহেব সোহাগপাশায় থাকছেন তো?'

ইগনেশিয়াস বলল, 'অবশ্যই, অবশ্যই। হ্যাঁ, থাকছেন।'

ক্ষেমংকর চোখমুখে সামান্য সতর্কতা নিয়ে বলল, 'এদের মধ্যে দু-একজন ইতিমধ্যেই মগের দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। অথবা বলা ভালো দালাল এদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।'

ইগনেশিয়াস বলল, 'এই প্রয়াসে কি আপনার কোনো ভূমিকা আছে?'

ক্ষেমংকর সংক্ষেপে বলল, 'আছে।'

ইগনেশিয়াস হেসে বলল, 'আপনাকে আশ্বস্ত করছি এই বলে যে সরকারের তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করা হয় না।'

ক্ষেমংকর আবার বলল, 'এ গ্রামের মানুষ তিন পুরুষ আগে ইলশাপাড়ের দশমিনা গ্রাম ত্যাগ করে এই গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে। সেবারও গ্রাম ত্যাগের কারণ এই মগের অত্যাচারই ছিল। এবারও অনেকে ইতিমধ্যে বলাবলি শুরু করেছে গ্রাম ছেড়ে আরো উত্তরে কোথাও চলে যাবে।'

ইগনেশিয়াস একটু অধৈর্য স্বরে বলল, 'না না, এটা কোনো সমাধান নয়। একটু ধৈর্য ধরুন, নতুন সুবেদার শায়েস্তা খান সাহেব অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং প্রতিভাবান মানুষ। মনে হচ্ছে এবার মগ ফিরিঙ্গির দৌরাত্ম্য দমন হবে। এই দুরাত্মাদের জন্য সুবেদার সাহেব কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করছেন, এরকম নির্দেশ আমাদের কাছেও এসেছে।'

ক্ষেমংকর একটু হেসে বলল, 'আপনি নিজেও তো ফিরিঙ্গি?'

'আমি পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত', ইগনেশিয়াস বলল, 'আমার বাবার নাম অ্যাবরেনানশিয়াস এবং মায়ের নাম মারিয়া ল্যাবোর্ডে। তবে আমার স্ত্রীর নাম আউলাকেশি, আউলাকেশি ডি সিলভা।'

ক্ষেমংকর হেসে বলল, 'হ্যাঁ এরকম একটা কথাও যেন কার কাছে শুনেছিলাম।'

একটা লম্বা নলের আগ্নেয়াস্ত্র ইগনেশিয়াসের কোমরের ডানদিকে এবং তলোয়ারখানা বাঁ দিকে। এ দুটো অস্ত্র সামলে তার পক্ষে কোথাও একভাবে বসা খুব মুশকিল।

সে উঠে দাঁড়াল, তারপর বলল, 'আর একটা কথা বোধহয় এখনো কারো কাছে শোনেননি। তা হল আপনার বন্ধু বিষ্ণুপ্রিয়র সঙ্গে আমার একটা কুটুম্বিতার সম্পর্ক আছে।'

'কুটুম্বিতার সম্পর্ক!' ক্ষেমংকর বিস্মিত হল।

'হ্যাঁ, আউলাকেশির এক জ্ঞাতিভাইয়ের ছেলে হল বিষ্ণুপ্রিয়।'

'এরকম একটা কথা কানে এসেছিল বটে, তবে গুজব ভেবেছিলাম। বিষ্ণুপ্রিয় সম্পর্ক রাখে?'

'খুব গোপনে।'

'আশ্চর্য! আমাকেও বলেনি!'

'আউলাকেশি জানতে চেয়েছে বিষ্ণুপ্রিয় তার স্ত্রীকন্যাদের খোঁজ করবে কিনা এবং উদ্ধার সম্ভব হলে তাদের ঘরে নেবে কিনা।'

'আপনি বিষ্ণুপ্রিয়র কাছে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তার যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, তাতে তার কাছ থেকে

কোনো প্রতিক্রিয়াই আশা করা বৃথা।'

'হ্যাঁ! একেবারে জবুথবু হয়ে পড়েছে?'

'আমার কথা যেন বুঝতেই পারল না, এমন মনে হল। কিন্তু তাঁর যে জ্ঞাতিভাইয়ের দায়িত্বে এই মুহূর্তে সে আছে, সে যে আমার প্রস্তাবটা অনুমোদন করল, এমন তো মনে হলই না। উপরন্তু তার চোখমুখের আতঙ্ক দেখে বুঝলাম যে ব্যাপারটা বোধ হয় সম্ভব হবে না।'

ক্ষেমংকর চুপ করে রইল। ইগনেশিয়াস এ কথা বলবার আগেই সে বিষয়টা বুঝে গেছে। বিষ্ণুপ্রিয়র বংশে ইতিমধ্যেই কোনো এক পূর্ব রমণীর কুমিরদোষ পরিবাদের অস্তিত্ব আছে। বিষ্ণুপ্রিয়র বড় মেয়েটির বিয়ের সময় এ নিয়ে জল ঘোলা কম হয়নি। কাজেই জ্ঞাতিদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে। সমাজের দণ্ডের কোনো মানবিক মুখ নেই।

সে বলল, 'সাহেব, ব্যাপারটা আমি একটু বুঝি। বিষ্ণুপ্রিয়র মেয়ে দুটি আমারও বড় প্রিয় ছিল, বিশেষ করে ছোটটি। তারা এখন কোন জঘন্য পরিবেশে ভয়ংকর জীবনযাপন করছে কে জানে! কালবাদে পরশু আমরা হুজুরের দরবারে যাব আমাদের বিপদের কথা জানাতে, তখন আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হবে। ভালো কথা, ওলন্দাজ জাহাজের সেই বণিক, ইয়েকব এখনো আমার অতিথি। কিন্তু তাকে কতকটা লুকিয়ে রাখতে হয়েছে আমাকে। বিগত ভরা কোটালে, জাহাজ সমুদ্রে নিয়ে ফেলতে ওদের চেষ্টা করার কথা ছিল। জাহাজখানা নিরাপদে আছে তো?'

ইগনেশিয়াস বলল, 'জাহাজকে সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জাহাজের জন্য সাহেব বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করেছেন। জাহাজের কাপ্তান হুজুরকে যে হিরার আংটি উপহার দিয়েছে, হুজুর তাতে বেজায় খুশি। ওকে বলবেন নিশ্চিন্ত থাকতে।'

ইগনেশিয়াস অভিবাদন করে উঠে দাঁড়াল। ক্ষেমংকর বলল, 'আর একটু বসুন। আমি ইয়েকবকে জিজ্ঞেস করি সে আপনার সঙ্গে সোহাগপাশায় যেতে রাজি আছে কিনা। কেননা সে বিদেশি এবং এই মগ-ফিরিঙ্গি আক্রমণের পরে যে কোনো সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বিশেষ করে আঁধারমানিকের মুসলমান যুবকেরা আবু নিসারের মৃত্যুটার একটা পালটা প্রতিশোধ—'

ইগনেশিয়াস বলল, 'একথাটা আমার একদম খেয়াল ছিল না। আপনি ওকে তৈরি হতে বলুন, আমি বসছি।'

১৬

ইগনেশিয়াসের সঙ্গে ইয়েকব বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর ক্ষেমংকর নিজের একান্ত বৈঠকখানা ঘরে বসে অনেক সময় ধরে সমস্ত বিপর্যয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। ধাত্রীনগরের কংসবণিক একটি পরিবারের সঙ্গে মগের দালাল এক ব্যক্তি যোগাযোগ করেছে। পরিবারটি ধনী। তাদের গৃহকর্তা এক বৃদ্ধকে মগেরা ধরে নিয়ে গেছে। চর মুক্তিপণের টাকার অঙ্ক নিয়ে দরাদরি শুরু করেছে।

এই খবর শোনার পর ক্ষেমংকর যেন পথের দিশা পেল। সাধারণভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া সবার জন্য এবং বিশেষভাবে বিষ্ণুপ্রিয়র স্ত্রীকন্যাদের জন্য তাহলে একটা কিছু করার আছে, এই চিন্তায় খানিকটা স্বস্তি ফিরে এল তার। সেদিন মগ চলে যাওয়ার পর গুপ্ত জায়গা থেকে বেরিয়ে বিষ্ণুপ্রিয় উর্ধ্বশ্বাসে তার বাড়ির দিকে ছুটে গিয়েছিল। তারপরে আর তার সঙ্গে ক্ষেমংকরের দেখা হয়নি। গ্রামের যাবতীয় খবর লোকমুখেই শুনেছে সে এবং শোনার পর অনেকবার চেষ্টা করেও বিষ্ণুপ্রিয়র মুখোমুখি সে আর হতে পারেনি।

একা ঘরে বসে অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর ক্ষেমংকর উত্তেজিত হয়ে উঠল। দৈবাদিষ্টের মতো তার মনে হল তারও কিছু করার আছে। মনে হল এই স্থবির ধর্ষকাম সমাজের বিরুদ্ধে সে অন্তত কিছুটা লড়াই করতে পারে।

তার ব্যক্তিগত দাসী ময়ূরী দরজা থেকে বার দুয়েক উঁকি দিলেও তার ধ্যানভঙ্গ হল না। তৃতীয়বারে ক্ষেমংকর চোখ তুলে তাকাল।

ময়ূরী বলল, 'সোহাগপাশা যাবার প্রস্তুতি করতে হবে, মালিক?'
ক্ষেমংকর বলল, 'হ্যাঁ।'

'কবে যাত্রা করব?'

ক্ষেমংকর বলল, 'পরশু।'

'আজ রাত্রে কি আমাকে দরকার হবে? মালিক?'

ক্ষেমংকর চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'দরকার না হলে আজ রাতটা মায়ের সঙ্গে কাটিয়ে আসব।'

ক্ষেমংকর বলল 'যা।'

ময়ূরী চলে গেলে ক্ষেমংকর উঠে বাইরে বেরিয়ে এল। অত্যন্ত দ্রুত সুবল কাঁসারির বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। সুবলের বৃদ্ধ বাবাকেই ধরে নিয়ে গেছে মগেরা। এপাড়া থেকে নিয়ে গেছে আরো তিনটি মেয়েকে। গতকাল সুবলই তার কাছে এসেছিল পরামর্শ করতে। প্রথমে সে একটু বিস্মিত হলেও পরে বুঝেছে ফৌজদারের কাছাকাছি থাকার কারণে কাঁসারিরা তার সহযোগিতা চায়।

কাঁসারিপাড়া নদীর ধার ঘেঁষে। সবাই পালাতে পারলেও সুবলের বাবা পালাতে পারেনি অথবা সে মনে করেছিল মগদের সম্ভবত তাকে প্রয়োজন হবে না। কিন্তু মগেরা জানত মেহেন্দিগঞ্জে সুবলদের বড় কাঁসা-পিতলের দোকান আছে। হয়তো এও জানত যে সুবল তার বাপের জন্য টাকা খরচ করবে। গতকাল সুবল যখন ক্ষেমংকরের কাছে গিয়েছিল, ক্ষেমংকর সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ভাববার জন্য একটা দিন সময় চেয়েছিল তার কাছে।

ক্ষেমংকরকে দেখে সুবল অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে এল। ক্ষেমংকর যে তাকে ডেকে না পাঠিয়ে নিজেই চলে আসবে এতটা আশা করেনি সে।

ক্ষেমংকরকে দেখে আশপাশের বাড়ি থেকে আরো দু-একজন বেরিয়ে এল। যে সব বাড়ি থেকে বালিকা তিনটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তারাও এল। কিন্তু এই তিন ঘর গৃহস্থই অত্যন্ত গরিব। মগের দালাল এই তিন জনের জন্য যে দর চেয়েছে, তার দশভাগের একভাগও দেওয়ার ক্ষমতা নেই তাদের। তারা ক্ষেমংকরের হাত-পা ধরে কান্নাকাটি করতে লাগল।

ক্ষেমংকরকে নিয়ে সুবল ভিতরে গিয়ে বসল। মগের দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মগের কাছ থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া মানুষ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নতুন কিছু নয়। যারা সমাজের ধার ধারে না বা যাদের সমাজপতিদের খাতির না করলেও চলে, তারা এভাবে তাদের প্রিয়জনদের টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে আনে। সুবল এরকম এক ব্যক্তি। বলল, 'আপনি যদি

সহায় থাকেন, কবিরাজমশাই, তা হলে আরো অনেকে এগিয়ে আসবে। অনেকের সঙ্গেই আমি কথা বলেছি।'

ক্ষেমংকর বলল, 'কিন্তু সুবল, অনেকের কি টাকার ব্যবস্থা আছে?'

সুবল বলল, 'সেটা একটা বড় প্রশ্ন বটে, কবিরাজমশাই। কিন্তু কী আর করা যাবে। যারা টাকার ব্যবস্থা করতে পারবে, আপাতত তাদের জন্যই চিন্তাভাবনা বা ব্যবস্থা করতে হবে।'

ক্ষেমংকর বলল, 'কাল যদি নাও পারি, পরশুদিন আমি সোহাগপাশা যাব। ফৌজদারের সঙ্গে কথা বলে তারপরে পরিকল্পনা ঠিক করব। কিন্তু সুবল, কোথা থেকে ছাড়িয়ে আনব এই বন্দিদের? মগরা তাদের ঠিক কোথায় নিয়ে যাবে?'

সুবল বলল, 'আগে তো এদিক থেকে ধরা লোকজনকে নিয়ে মগেরা মহিষাদলের বাজারে তুলত। এখন শুনছি শায়েস্তাখানের ভয়ে কাছাকাছি কোথাও তোলে না তারা। আরো পশ্চিমে পিপলিতে নিয়ে যায় বন্দিদের।'

ক্ষেমংকর বলল, 'তুমি আরো একটু বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা কর। আর কাল হোক, পরশু হোক তোমাকে কিন্তু আমার সঙ্গে সোহাগপাশা যেতে হবে।'

সুবল বলল, 'আজ্ঞে, সে তো অবশ্যই।'

বেলা পড়ে গিয়েছিল। সুবলের সঙ্গে কথা সেরে ক্ষেমংকর বাড়ির পথ ধরল। কেমন যেন একটা উদ্দীপনা টের পেতে লাগল সে নিজের ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ইতিমধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়র সঙ্গে দেখা না করে সে ঘোরতর অন্যায়ই করেছে। বস্তুত, বিপদ এবং বিপর্যয়, সম্পত্তি এবং মানুষ লুঠ ইত্যাদি ব্যাপার এত ব্যাপক যে বিষ্ণুপ্রিয়র কথা এ-ক'দিন আর পৃথকভাবে মনে আসা অবকাশও হয়নি যেন তার।

পরদিন সকালবেলা বিষ্ণুপ্রিয়র বাড়িতে আসল ক্ষেমংকর।

বিষ্ণুপ্রিয়র বাড়ির চেহারা স্বাভাবিক কারণেই লক্ষ্মীছাড়া। গোবর লেপা দূরে থাক প্রাঙ্গণে ঝাঁট পর্যন্ত পড়েনি এ কয়দিন, শুকনো পাতা, আবর্জনা, গোরুর গোবরে ইতিমধ্যেই পরিত্যক্ত বাড়ির চেহারা পেয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়র ঘরবাড়ি।

কিন্তু নজর যে আছে তা বোঝা গেল ক্ষেমংকর উঠান থেকে ঘরের দিকে এগোতেই।

'কে?'

বিষ্ণুপ্রিয়র নিকটস্থ জ্ঞাতির বাড়ি অন্তত এক দেড়শো হাত দূরে। সেদিব থেকে হাঁক উঠল, 'কে?'

এই জ্ঞাতিভাই রত্নেশ্বরকে চেনে ক্ষেমংকর। বিষ্ণুপ্রিয়ব থেকে অন্তত দশ বছরের বড় রত্নেশ্বরের সঙ্গে জমিজমা নিয়ে বিরোধ থাকলেও নিকট প্রতিবেশী হিসাবে সে-ই বিষ্ণুপ্রিয়র সব থেকে কাছের লোক।

ক্ষেমংকরকে দেখে এগিয়ে এসে রত্নেশ্বর বলল, 'ও তুমি?'

'বিষ্ণুপ্রিয় কি এই ঘরে?'

'হ্যাঁ, এই ঘরেই। এসো।'

প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে একখানা চৌকির উপর হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বিষ্ণুপ্রিয় শুয়ে আছে।

'বিষ্ণুপ্রিয়!'

মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে বিষ্ণুপ্রিয় কিছু সময় নির্বোধের মতো তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঝট করে উঠে বসল।

ক্ষেমংকরের চোখে ভিতরের অল্প আলো সহ্য হয়ে এতক্ষণে সবকিছু মোটামুটি দৃশ্যমান। সে দেখল কাঠের চৌকির উপরে কোনো শয্যা নেই। বিষ্ণুপ্রিয় সেই কর্কশ কাঠের উপরই শুয়েছিল। তার মাথার নীচে কোনো বালিশও নেই।

ক্ষেমংকর চৌকির এক কোনায় বসল।

বিষ্ণুপ্রিয় অস্থিরভাবে মুখ, মাথা ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশে যেন কিছু খুঁজছে এমন মনে হল তার।

'কিছু খুঁজছ?'

'হ্যাঁ!'

'কী খুঁজছ?'

'নাঃ, কিছু না! ইস!'

পিঠের একটা দুর্গম জায়গায় আঙুল পৌঁছাবার প্রচেষ্টায় সফল হয়ে সে সশব্দে চুলকাতে শুরু করে।

সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক বিশৃঙ্খল একটা মানুষ।

ক্ষেমংকর ব্যথিত হয়। আঘাত সাময়িকভাবে ভারসাম্য কিছুটা নষ্ট করে দিয়েছে। এমন অবস্থায় কিছু বলা হয়তো বৃথা।

তবুও সে বলল, 'শোন বিষ্ণুপ্রিয়, তোমার পিসি আউলাকেশি ডি সিলভা জানতে চেয়েছেন তুমি বউঠাকরুন এবং মেয়েদের মগদের হাত থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে সম্মত আছ কিনা।'

রত্নেশ্বর এতক্ষণ দরজার কছে দাঁড়িয়েছিল।

এবার এগিয়ে এসে বলল, 'তার মানে ওই ফিরিঙ্গি দারোগাটা তোমার কাছেও গিয়েছিল?'

ক্ষেমংকর বলল, 'হ্যাঁ। আমি আপনার কাছেও জিজ্ঞেস করি মগদের হাত থেকে ওদের উদ্ধার করে নিয়ে আসার ব্যাপারে আপনাদের সম্মতি আছে কিনা।'

রত্নেশ্বর আচমকা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! মগে নিয়ে যাওয়া বউ ছেলেমেয়েকে কে কবে ফিরিয়ে আনতে যায়? আর ফিরিয়ে এনে হবে কী? বিষ্ণুপ্রিয় আর কি ওদের নিয়ে ঘর করতে পারবে? ধর্ম নষ্ট হয়ে জাত নষ্ট হয়ে আমাদের এই পুরো পরিবারটাই শেষ পর্যন্ত মগুয়া-ব্রাহ্মণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে বংশ পরম্পরায় অভিশাপ বহন করবে?' রত্নেশ্বর বলল, 'না ক্ষেমংকর আমরা এমন অনাচার হতে দিতে পারি না।'

একটু সময় চুপ করে থেকে ক্ষেমংকর বলল, 'কিন্তু সেই শিশুটি? আপনাদের সেই যুবতী কন্যাটি? বউঠাকরুন? তাদের কথা কি একবারও আপনাদের মনে পড়ছে না?'

বাড়ির ভিতর দিকের দরজা ঠেলে একজন সাদা থান কাপড় পরা বিধবা স্ত্রীলোক প্রবেশ করল। স্ত্রীলোকটির বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না কোনোমতেই। কঠোর বৈধব্য শৃঙ্খলা এবং চেপে বসা অনুশাসনের রুক্ষ ছাপ তার সর্বাঙ্গে। সে আরো এক পা এগিয়ে এসে বলল, "না, মনে পড়ছে না, কবিরাজ মশাই। মনে পড়ে কী হবে? মগ যখন লুট করে নিয়ে গেল, আপনারা তাদের বাধা দিতে পারেননি। সেই মগকে এখন খুঁজে নিয়ে ফের সেই লুণ্ঠিতদের টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে আসা, এই তো আপনাদের ব্যবস্থা? তারপর? তারপর কী হবে সেই হতভাগ্যদের? সমাজ তাদের গ্রহণ করবে? বিষ্ণুপ্রিয় দাদা বউঠাকরুনকে নিয়ে ঘর করতে পারবে? জামাই ফিরিয়ে

নেবে শর্মিকে? মনজিকে কি বিয়ে করার জন্য এই সমাজে কোনো পাত্র পাওয়া যাবে? আউলাকেশি পিসিমাকে মগেরা লুট করেছিল আমাদের জন্মের অনেক আগে। আউলাকেশি পিসিমার বাড়ির লোকেরা নৃশংস প্রায়শ্চিত্ত করেও সমাজের অবিচার থেকে মুক্তি পায়নি!'

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে স্ত্রীলোকটি উত্তেজনায় মৃদুমৃদু দুলছিল। ক্ষেমংকর সহসা এসব কথার বিপরীত কোনো কথা খুঁজে পেল না। বস্তুত তাকে উপলক্ষ করে যেসব কথা বলা হল, সেসব তো তারও কথা।

হঠাৎ বিষ্ণুপ্রিয় ওয়াক দিতে শুরু করল। মেয়েটি দ্রুত এসে চৌকির নীচ থেকে একটা মাটির পাত্র বের করে তার মুখের সামনে ধরল। বিষ্ণুপ্রিয় প্রাণপণে ওয়াক দিতে থাকলেও তার গলা দিয়ে খানিকটা শ্লেষ্মাজড়িত জল ছাড়া কিছুই উঠল না। সে তবুও ওয়াক দিয়ে যেতে লাগল, এমন প্রচেষ্টা যেন বুকের খাঁচার ভিতর থেকে তার হৃৎপিণ্ডকে বের করে ফেলবে সে।

মেয়েটি তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলতে লাগল, 'হবে না, বমি হবে না, শুয়ে পড় তুমি, শোও।'

বিষ্ণুপ্রিয় সামান্য আয়েসেই একেবারে গড়িয়ে পড়ে গেল চৌকির উপর। শুয়ে পড়ে সে প্রবল হাঁপাতে লাগল।

ক্ষেমংকর তার নাড়িতে হাত রাখল। নাড়ি অস্বাভাবিক চঞ্চল, অবশ্য তাতে অন্য কোনো বিপজ্জনক লক্ষণ নেই। সে হাতখানা ধীরে নামিয়ে নিল।

চৌকি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে ক্ষেমংকর বলল, 'রত্নেশ্বরদাদা, কাউকে দিয়ে কিছু বড়ি পাঠিয়ে দেব। সকালে একটা এবং সন্ধ্যায় একটা সেবন করাবেন। ওর ঘুম আর বিশ্রাম দরকার।'

তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার কোনো দ্বিমত নেই। আমি মুসলমান সংসর্গ করি, ফিরিঙ্গি সংসর্গও করি। আমার সমাজ এ কারণে আমার প্রতি বিরূপ হলেও, তা প্রকাশ করে না। তার কারণ আমি সমাজপতিদেরও প্রয়োজনে লাগি। তাছাড়া সমাজ জানে যে আমি সমাজকে ভয় পাই না। আমাকে ত্যাগ করলে আমার কিছু যায় আসে না। এই কারণে ধাত্রীনগরের সমাজ আমাকে সমীহও করে। আপনাদের আউলাকেশি পিসিমা অত্যন্ত সাহসী মহিলা। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। মগলুণ্ঠিতা স্ত্রীলোকের কী হয়, আমরা সবাই তা জানি। তিনি এই হওয়াটাকে নিজের সাহস এবং বুদ্ধি দিয়ে উলটে দিয়েছেন। আরো একটা কথা,

আপনাদের ছোট মেয়ে মঞ্জরী আমার ভারি প্রিয় ছিল। বিষ্ণুপ্রিয়র স্ত্রীও। বড় মেয়েটিকে আমি দু'একবারই দেখেছি। এদের সবাইকে উদ্ধার করার একটা জেদ কেন যেন আমার ভিতর চেপে বসছে। আমি আপনাদের জানিয়ে যাচ্ছি যে তাদের উদ্ধার করার চেষ্টা আমি করব। তারপর দেখা যাক সমাজ কী বলে।'

হঠাৎ বিষ্ণুপ্রিয় স্বপ্নোত্থিতের মতো কেঁদে উঠল। বলল, 'ক্ষেমংকর, আমার স্ত্রীকন্যাকে উদ্ধার করে দাও। আমি ওদের নিয়েই থাকব। আমি সমাজ মানব না, সংসার মানব না,' মেয়েদের নাম ধরে বিকৃতস্বরে সে কাঁদতে লাগল। মেয়েটি মুখে আঁচল দিয়ে পাশ ফিরে দাঁড়াল।

ক্ষেমংকর বলল, 'বিষ্ণুপ্রিয়, ওষুধ পাঠিয়ে দেব। নিয়মমতো খেয়ো। তাড়াতাড়ি সুস্থ হও। তারপর দেখা যাবে।'

নিজের বাড়িতে ফিরে এসে ক্ষেমংকর দেখল গোবর্ধন গুহ তার জন্য অপেক্ষা করছে।

'কী ব্যাপার, গুহ মশাই?'

'কবিরাজ মশাই, নমস্কার।'

'নমস্কার। কেউ অসুস্থ নাকি?'

'আজ্ঞে না, সে ব্যাপার নয়। চক্রবর্তী মশাই আমাকে পাঠালেন আপনার কাছে।' গোবর্ধন মুখের অভিব্যক্তিতে একটা কাচুমাচু ভাব আনল।

'তিনি কি অসুস্থ?'

'হ্যাঁ, তা একটু বলতে পারেন। তাঁর আবার বাতের ব্যথা—'

'সেই কারণে কি ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ— মানে— না, ঠিক সেই কারণে নয়। সে আপনি গেলেই বুঝতে পারবেন। কাল সকালে একবার চক্রবর্তী মশাইয়ের বাড়িতে—'

'কাল সকালে কেন? এখনো তো অনেকটা বেলা আছে। আজই চলুন। বসুন আপনি, আমি আসছি।'

বিষ্ণুপ্রিয়র বাড়ি থেকে একটি বালক তার সঙ্গে এসেছিল। ওষুধঘরে গিয়ে ক্ষেমংকর ওষুধ নির্বাচন করে তার হাতে দিল। সেবনবিধিও বলে দিল। তারপর বেরিয়ে এসে গুহকে বলল, 'চলুন।'

গুহ ক্ষেমংকরের সিদ্ধান্তে এই একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। বস্তুত,

দয়ালহরি তাকে আগামীকালের কথাই বলেছিল। কবিরাজ যে আজই যেতে চাইবে, এমন ভাবেনি। কিন্তু এখন আর পিছোবার পথ নেই।

সে বলল, 'হ্যাঁ চলুন।'

দয়ালহরি এবং জিতু ক্ষেমংকরকে দেখে একেবারে হকচকিয়ে গেল। গোবর্ধনের ধরে আনতে বললে বেঁধে আনার খ্যাতি আছে। কিন্তু দুভাইয়ের কেউই অস্বস্তি প্রকাশ করল না।

'আরে কবিরাজ এসো এসো, বোস।'

দয়াল খুব উদার আপ্যায়ন করল।

ক্ষেমংকর যেহেতু তার বাল্যকাল থেকে সাধারণ বিদ্যা এবং চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা হেতু গ্রাম থেকে বাইরেই কাটিয়েছে, গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে তার তেমন খুড়ো-জেঠা সম্পর্ক হয়নি।

সে বলল, 'আপনার শরীর ঠিক আছে তো?'

দয়াল বলল, 'চিকিৎসক সামনে দাঁড়ালে কোনো ব্যক্তি আর সুস্থ আছি বলে? শরীরং ব্যাধিমন্দিরং। সুতরাং আছে, সবই আছে। তবে এই মুহূর্তে, এই অমাবস্যায় চাগিয়ে আসা কোমর এবং জঙ্ঘার বাতের ব্যথা হেমন্তের হিমের স্পর্শে আরো যেন জাঁকিয়ে—'

ক্ষেমংকর বলল, 'কোমর এবং হাঁটুর ব্যথা কমাতে হলে আপনাকে দেহের মেদ বেশ কিছুটা কমাতে হবে। আর মেদ কমাতে হলে আহার্যের পরিমাণ কিছুটা কমাতে হবে। আপনার হাঁটু আপনার দেহের ওজন সহ্য করতে পারছে না।'

'আহার্য কমাতে হবে?' দয়ালহরি জীবনে এমন আশ্চর্য কথা শোনেনি।

'আহার্য শুধু কমাতেই হবে না,' ক্ষেমংকর বলল, 'যেসব বস্তু আপনার সব থেকে প্রিয় অর্থাৎ মাংস, ঘি, শর্করা জাতীয় খাদ্য, যাতে শরীরের মেদবৃদ্ধি হয়, সেসব একেবারেই বাদ দিতে হবে।'

'কবিরাজ কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছে?' দয়াল গোবর্ধন এবং জিতুর মুখের দিকে যথার্থ আতঙ্কের দৃষ্টিতেই তাকাল। ফের বলল, 'তোমার বাবার চিকিৎসা বিধিতে তো এরকম কোনো বিধান কোনদিন শুনিনি!'

ক্ষেমংকর হাসল। বলল, 'বাবা মশাইয়ের কাছে যখন চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন, তখন তো আপনার যৌবনকাল। যৌবনকালের জন্য এসব বিধান তো তেমন প্রযোজ্য নয়। যাক্‌গে, এখন যে কারণে ডেকেছেন—'

'হ্যাঁ,' দয়ালহরি যেন রেহাই পেল। খাওয়া ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকার অর্থ কী ? কবিরাজের প্রতি তার বিতৃষ্ণা আরো বাড়ল। বলল, 'হ্যাঁ, গ্রামে মগ আক্রমণ এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতি বিষয়ে তোমার সঙ্গে একটু আগাম আলোচনা করতে চাই।'

'বলুন,' ক্ষেমংকর গম্ভীর হল।

দয়ালহরি বলল, 'ভেবেছিলাম দিল্লির বাদশার রাজত্ব সুস্থিত হলে দুরাত্মা মগরা দমিত হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা হয়নি। বরং কীর্তিনারায়ণ, অনন্তমাণিক্যর রাজত্বে এদেশের মানুষ যে পরিমাণ সুখে শান্তিতে কাটাত, দিল্লির বাদশাহের আমলে তার ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট নেই। দুরাত্মা মগ ও ফিরিঙ্গিরা আমাদের দেশের ধনসম্পদ, এমনকী মানুষ পর্যন্ত লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ দিল্লির বাদশা সে ব্যাপারে যে আদৌ ভাবিত এমন মনে হচ্ছে না।'

ক্ষেমংকর বলল, 'মোগল নওয়ারার একটি ক্ষুদ্র অংশের একজন কনিষ্ঠ ফৌজদারের অধীন জনৈক চিকিৎসক আমি। দিল্লি অনেক দূর। রাষ্ট্রনীতির বিষয় কিছু বুঝি না। তবে আপনি যা বললেন, আমার মনে হয়, তার সবটা ঠিক নয়। মহারাজা কীর্তিনারায়ণ কিংবা মহারাজা অনন্তমাণিক্যের আমলে মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা বারবার আমাদের গ্রামাঞ্চল আক্রমণ করে লুট করেছে। অনন্তমাণিক্য, কীর্তিনারায়ণ ইত্যাদিরা মগ ফিরিঙ্গিদের সহায়তায় একে অন্যকে পর্যুদস্ত করতে চেষ্টা করেছে। ফলে আমরা যে খুব শান্তিতে ছিলাম, একথা বোধ হয় ঠিক নয়। বস্তুত, এই মগ-ফিরিঙ্গি দৌরাত্ম্য এদেশে শুরু হয়েছে গৌড়ের বাদশা হোসেন শাহের আমল থেকেই। যদি কাউকে নির্দিষ্টভাবে দোষী করতেই হয়, তবে বলব যে বঙ্গোপসাগরে পশ্চিম থেকে আসা ফিরিঙ্গিদের একাংশই এ ব্যাপারে সব থেকে অধিক এবং প্রাথমিকভাবে দোষী। এইসব মানুষের মধ্যে দুর্বৃত্ত স্বভাবের মানুষ এবং দেশ-দেশান্তর থেকে তাড়া খাওয়া, বিতাড়িত অপরাধীরা প্রথমে আমাদের সমুদ্রে উপস্থিত হয়ে এই দৌরাত্ম্য শুরু করেছে। পরে মগদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এই ঘৃণ্য কাজে তাদেরও নিযুক্ত করেছে। দিল্লির বাদশা এবং মগদের রাজার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সন্দেহ বেড়ে যাওয়ার ফলে এই দৌরাত্ম্য বিভিন্ন রাজকীয় কর্তৃত্বের কাছ থেকে উৎসাহও পাচ্ছে। মোগল প্রশাসনের সংস্পর্শে থাকার ফলে আমার অবশ্য মনে হচ্ছে যে দিল্লীশ্বর এই দুর্বৃত্তপনা বন্ধ করার জন্য

যথার্থই চেষ্টা করছেন। সে যা হোক, এতসব গুরুতর বিষয়ে আমাদের বোধহয় না যাওয়াই ভালো। এই মুহূর্তে আমাদের এই গ্রামটি নিয়েই বোধহয় চিন্তা করা ভালো, চক্রবর্তী মশাই কী বলেন?'

ক্ষেমংকরের কথা শুনতে শুনতে দুই চক্রবর্তীর ভুরু ক্রমশ কুঞ্চিত হচ্ছিল। তার কথার মধ্যে প্রকাশ্যেই যে মোগল শাসনের প্রতি পক্ষপাত আছে তা তাদের পছন্দ হয়নি। তবুও ক্ষেমংকর যেহেতু ক্ষমতা ও শক্তির কাছাকাছি থাকে, তাকে বিদ্রূপ করাও ঠিক নয়।

জিতু চক্রবর্তী বলল, 'শোনো কবিরাজ, আমরা গরিব গ্রামীণ গৃহস্থ, রাষ্ট্রনীতির মধ্যে আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন সত্যিই নাই। কিন্তু আমাদের গ্রামের সমাজ ভাবনা বিষয়টাতো একান্তভাবে আমাদেরই। সনাতন ধর্মের আদর্শে সমাজকে রক্ষা করা সমাজপতিদের কর্তব্য। আমরা শুনতে পাচ্ছি মগলুণ্ঠিত মানুষদের মধ্যে কাউকে কাউকে তাদের পরিবার ফিরিয়ে আনার বন্দোবস্ত করছে।'

ক্ষেমংকর শুনে একটু আশ্চর্য হল। জিতু চক্রবর্তী 'কাউকে কাউকে' শব্দটা বলেছে। তার অর্থ বিষ্ণুপ্রিয়র পরিবার সম্পর্কে তার প্রয়াসের কথা যদি জানাজানি হয়েও যায়, হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক, কেননা, সে তো বিষয়টা প্রথম থেকেই গোপন করার চেষ্টা করেনি, তাহলে সেটাই দয়ালহরির একমাত্র বিচার্যবিষয় নয়!

সে বলল, 'কে কে এই প্রয়াস করছে?'

গোবর্ধন বলল, 'এখন পর্যন্ত সাতঘর গৃহস্থ। ছোটলোকদের ভিতরে তিন ঘর, কায়স্থদের মধ্যে দু'ঘর, বামুন এবং বৈদ্যদের মধ্যে, অবশ্য এরা আগেই জাতমরা, একঘর একঘর করে।'

ক্ষেমংকরের ভিতরে সহসা আনন্দভাব জাগ্রত হল। এত বিস্তৃত খবর তার কাছে ছিল না। তাহলে সে একা নয়। চাপা উল্লাসে সে যথার্থই বলল, 'সে তো খুব ভালো কথা।'

'ভালো কথা!' দয়ালহরি বিস্ময়ে এবং ক্রোধে মাত্রা ছাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এটা খুব ভালো কথা হল তোমার কাছে? তোমাকে ডাকলাম পরামর্শ করতে, সমাজের একজন শীর্ষ ব্যক্তি তুমি কবিরাজ। আর তুমিই বলছ ভালো কথা! তোমার সম্পর্কে যা সব কথাবার্তা শুনছি সব তাহলে তো ঠিকই মনে হচ্ছে!'

ক্ষেমংকর নিজের মেজাজকে উত্তপ্ত হতে দিল না। বলল, 'চক্রবর্তীমশাই, এই মুহূর্তে আমরা যে চার ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছি, সৌভাগ্যক্রমে মগ আক্রমণে তাদের ক্ষয়ক্ষতি সর্বাপেক্ষা কম। সর্বোপরি আমরা কোনো স্বজন হারাইনি। এই অবস্থানে সমাজপতির কর্তব্য করা সহজ। বিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্যের অবস্থানে থাকলে বোধহয় বিষয়টা নিয়ে এত ঠান্ডা মাথায় এসব কথা আলোচনা করা যেত না। সে যাই হোক, এ বিষয়ে আমার প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে আপনাকে জানাচ্ছি। আমি এই প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ পক্ষে।'

দয়ালহরি অন্যদের দিকে তাকিয়ে ভীষণ মুখ করে বলল, 'তাহলে আমরা যা শুনেছি তা ঠিক। অর্থাৎ যদি তোমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়, তাহলে এই ধাত্রীনগরে ওইসব মগস্পৃষ্ট, মগধর্ষিত, মগের উচ্ছিষ্টভক্ষণকারী স্বজনদের নিয়ে তোমরা বসবাস করবে?'

'কোথায় যাবে তারা?' ক্ষেমংকরের কণ্ঠস্বরে করুণা উথলে উঠল। ফের বলল, 'কোথায় নচেৎ যাবে তারা চক্রবর্তীমশাই? তারা আমাদেরই সন্তান, ভাই, স্ত্রী, পিতা মাতা কিংবা ভগ্নী। কোথায় ফেলে দেব তাদের? মানুষ হয়ে কীভাবে চোখ, মন, ইন্দ্রিয়কে ফিরিয়ে রাখব?'

দয়ালহরিকে এই করুণ প্রশ্ন আদৌ বিচলিত করল না। সে সরোষে বলল, 'আমি তোমাকে এই কারণেই ডেকেছিলাম কবিরাজ। আমি জানতাম যে এসবের পিছনে তুমিই আছ। তোমার কাছ থেকেই তোমার মনোভাব পরিষ্কার বুঝতে চেয়েছিলাম। বুঝলাম! তবে শুনে রাখ কবিরাজ, তোমাদের এই প্রয়াস এখানে সফল হবে না। তোমার প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি, সমাজে থাকতে হলে ত্যাগ করতে হবে তাদের, নির্মমভাবে ত্যাগ করতে হবে।'

'আমাদের ধর্মে তো প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে, চক্রবর্তীমশাই? শাস্ত্র বলেছেন প্রায়ঃ পাপং সমুদ্দিষ্টং চিত্তংতস্য বিশোধনা। সান্তপন, চান্দ্রায়ন, প্রাজাপত্যাদি ব্রত তো আমাদেরই শাস্ত্রের বিধান। এসব করলে কি চিত্তশুদ্ধি হবে না, চক্রবর্তীমশাই? আর একবার ভাবুন, কোথায় যাবে আমাদের স্বজাতের এসব হতভাগ্য মানুষ?'

দয়ালহরির চোখমুখের চেহারা ভয়ংকর হয়েছে। 'জাহান্নামে যাবে!' সে ভাবার জন্য সামান্যতম সময়ও ব্যয় করল না। বলল, 'এই ম্লেচ্ছ শব্দটাই আমি ব্যবহার করতে চাই, জাহান্নামে যাবে তারা, কেননা তারা তো শেষ পর্যন্ত ওদের কাছেই ধর্মীয় আশ্রয় পাবে!'

ক্ষেমংকর ফের বলল, 'চক্রবর্তীমশাই, আপনি সমাজপতি, আবার একটু আগে আপনি যেসব রাজাদের নাম করলেন তাঁরাও তো রাজা হিসাবে সমাজপতি ছিলেন? তারা কিন্তু তাদের হারেমে সুন্দরী যবনী এবং ফিরিঙ্গি স্ত্রীলোকদের রাখতেন এবং তাদের সঙ্গে যৌনসংসর্গ করতেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের অন্দরে ফিরিঙ্গি স্ত্রীলোকেরা সমাদৃত ছিল। চাঁদরায়-কেদাররায় লক্ষ্মণমাণিক্য ইত্যাদি অন্য ভুঁইয়াদের মধ্যে—'

'তোমার সঙ্গে আমি শাস্ত্র আলোচনা করতে চাই না,' চক্রবর্তী যেন শেষ কথা বলে দিল। সামান্য সময় পরে ফের রুখে উঠে বলল, 'রাজা সমাজপতি। তাঁর সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। কিন্তু তিনিও সমাজের, শাস্ত্রের ঊর্ধ্বে নয়। রাজা কীর্তিনারায়ণের যবন সংসর্গের কারণে এবং প্রতাপাদিত্যের ব্রাহ্মণবিরোধী স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সমাজ কী ব্যবস্থা নিয়েছিল, তা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। তোমাকে আরো স্মরণ করিয়ে দিই যে তোমার জন্মবৃত্তান্তও সমাজের জানা আছে। সে সময়ে উপর্যুপরি যবন এবং মগ আক্রমণে দেশ এত বিপর্যস্ত ছিল যে সমাজ তার উচিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সমাজ ব্যাপারটা তামাদি করে দিয়েছে!'

রাজা কীর্তিনারায়ণের মুসলমান সংস্পর্শের করুণ কাহিনি না জানে কে? বুদ্ধিমান, সাহসী, বীর এবং ভবিষ্যৎদর্শী কীর্তিনারায়ণ মগ ফিরিঙ্গির অত্যাচার থেকে দক্ষিণের বিস্তৃত অঞ্চলকে মুক্ত করে মানুষের মনে স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছিল। ঢাকার মোগল সুবেদার তার মিত্র এবং বীরত্বমুগ্ধ। সুবেদার স্বয়ং মগ ফিরিঙ্গি দ্বারা নির্যাতিত এবং বারবার আক্রান্ত হয়ে রাজধানীতেই সব সময় সন্ত্রস্ত থাকত। কীর্তিনারায়ণ বহুযুদ্ধে এই সাক্ষাৎ ধ্বংসরূপী বহিঃশত্রুকে পরাজিত করে মেঘনা পার করে সমুদ্রে বিতাড়িত করেছিল, ধ্বংস করেছিল তাদের অসংখ্য রণতরী এবং জনপদ।

এহেন রাজা, যার প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশ চন্দ্রদ্বীপ ছাড়িয়ে দিল্লির মোগল দরবার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিল, চক্রান্তের শিকার হল। মাধবপাশার প্রাসাদে কোনো চক্রান্ত হয়নি, এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যাবে না। সমাজ তার মুসলমান সংসর্গ ভালো চোখে দেখেনি অথবা কোনো স্বার্থপর চক্রান্তকারী কীর্তিনারায়ণের এই মুসলমান প্রীতি এবং খোলা মেলামেশা কাজে লাগিয়ে দিল। রাজার যবনদোষ ঘটেছে! রাজা মুসলমান ঘনিষ্ঠতার কারণে খাদ্যাখাদ্য

বিচার করছে না! পবিত্র হিন্দুধর্মে পাপ ঢোকাচ্ছে! সমাজকে অপবিত্র করছে!

এসব মাত্র পনেরো-ষোলো বছর আগের কথা।

ক্ষেমংকর তখন সবে দেশে ফিরে প্রমথনাথের সহকারী হিসেবে কাজ করতে শুরু করেছে। সুলতান সুজা ঢাকার সুবেদারি তখতে। কীর্তিনারায়ণ স্বয়ং সুলতান কিংবা তার কোনো অধস্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছিল ক্ষেমংকর তা ঠিক করে বলতে পারে না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন রটে গেল রাজা কীর্তিনারায়ণ জাতিচ্যুত হয়েছে। নবাব স্বয়ং অথবা তার অধীনস্থ অন্য কোনো সেনাপতির আমন্ত্রণে রাজা কীর্তিনারায়ণ তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। প্রয়োজনটা নিঃসন্দেহে ছিল সামরিক অথবা রাজনৈতিক, কেননা, রাজা তখন মগ পর্তুগিজদের সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষে জড়িত।

নবাব সে সময় খেতে বসেছে। রাজা বস্ত্রাঞ্চল টেনে নাক ঢেকে একপাশে অপেক্ষা করতে লাগল।

খাওয়া শেষে নবাব গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করল রাজার সঙ্গে। সব শেষে রাজার নাক ঢাকার প্রসঙ্গটিও উঠল। হিন্দুদের নাসারন্ধ্রে মুসলমান খাদ্যের গন্ধ প্রবেশ করলেও জাত যাবে, এমন অদ্ভুত কথা শুনে স্বাভাবিক কারণেই নবাব রুষ্ট হল, কিন্তু সে দিন কিছু বলল না।

পরদিন অন্য অজুহাতে নবাব কীর্তিনারায়ণকে ডেকে পাঠাল।

মোগলরা বহু সময়ই তাঁবুতে থাকে। সুসজ্জিত তাঁবুর ভিতরে নরম গদির উপরে কাশ্মীরি গালিচা।

নবাব সাদরে বলল, 'বসুন রাজা।'

কীর্তিনারায়ণ বসল।

নবাব বলল, 'কাল কী একটা সংস্কৃত শ্লোক বললেন? পরিষ্কার বুঝতে পারিনি। আবার বলুন তো?'

কীর্তিনারায়ণ হাসল। বলল, 'ওঃ সেই ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্? হিন্দুদের জাতপাত বড় জাগ্রত সত্তা, অবহেলা করার জো নেই।'

নবাবের নির্দেশে একজন প্রহরী তাঁবুর একদিকের বনাত খানিকটা সরিয়ে দিল। সেখানে বড় বড় দুটি উনুনে মাংস রান্না হচ্ছে। নির্ঘাত হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস। না হলেই বা কী? সেই সুপক্ক মাংসের ঝাঁঝালো গন্ধ হাওয়ায় উড়িয়ে

এনে তাঁবুকে মোহিত করে ফেলল নিমেষে।

রাজা কীর্তিনারায়ণ নিজের নাক ঢাকার আগেই গন্ধ ঢুকে গেল নাকে।

নবাব একটু অপেক্ষা করে বলল, 'দম বন্ধ হয়ে মারা যাবেন নাকি?'

সত্যিই দমবন্ধ করে কতক্ষণ থাকা যায়? কীর্তিনারায়ণের শুধু দমবন্ধ নয় চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে এল।

নবাব সকৌতুকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হিন্দুর মতো এমন জাত-খেপা জাত কেউ আর কোথাও দেখেনি। ওরা নিজেরাই কখনো কখনো খেপে গিয়ে দলবেঁধে মুসলমান হয়।

নবাব বলল, 'দুনিয়া থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাস সরিয়ে দিতে পারলে তবেই আপনার নিস্তার, রাজা! আল্লা যদি তেমন করেন, তবে তো ঝামেলা মিটেই গেল!'

কীর্তিনারায়ণ নাক থেকে হাত সরিয়ে নিল এবং প্রাণ বাঁচাতে বুক ভরে শ্বাস টানল। সেই সঙ্গে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, গরমমশলা চর্চিত হিন্দুর অখাদ্য অস্পৃশ্য গোমাংসের গন্ধ।

নবাব জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে এখন কী হবে?'

রাজা অধোবদন হয়ে রইল। জাত খোয়ানোর জন্য তো বটেই অপমান অত্যধিক বোধ হল তাকে নিয়ে এই নির্মম রসিকতার কারণে। ক্ষোভ হল, ক্রোধও, কিন্তু একবারও মনে পড়ল না যে নবাবের মধ্যাহ্নের আহারের সময় তার সাক্ষাতে নাকে বস্ত্রাঞ্চল চেপে বসে থাকায় নবাব কী পরিমাণ অপমানিত বোধ করতে পারে! ধীরে ধীরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রাজা বলল, 'আমাকে উঠবার অনুমতি দিন হুজুর।'

নবাব বলল, 'রাজা সাহেব ইসলাম হল পৃথিবীর সেরা ধর্ম। ইসলামের শরণ নেবার জন্য আপনাকে আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম। আপনি প্রতিভাশালী এবং বীর। রাজধর্ম গ্রহণ করলে আপনি নিশ্চয়ই দিল্লীশ্বরের নজরে পড়বেন।'

পৃথিবীর তাবৎ প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিশ্বাসীদেরই নিজ ধর্ম সম্পর্কে অহংকার আছে কিন্তু মহম্মদিদের সঙ্গে অন্যদের এ ব্যাপারে তুলনাও হয় না। এই চরম বিপর্যয়ের সময়েও রাজা কীর্তিনারায়ণ এ কথা স্মরণ না করে পারল না। একটু বেশি নুয়ে পড়েই আজ আদাব জানাল এবং বাংলার মাটির আর্দ্রতা ঠেকানোর জন্য উঁচু করে ঠাসা খড় এবং নারকেলের ছোবড়ার

গদির উপর দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দু'পা পিছোতে গিয়ে পদস্খলন হল। পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আপনার উপদেশ খেয়াল থাকবে হুজুর। কিন্তু তার আগে পণ্ডিতদের পরামর্শ নিই?'

রাজা জানত যদিও তার সহচররা বাইরে অপেক্ষা করছে, যদিও এই সুরম্য তাঁবুতে অন্য কোনো হিন্দু এই মুহূর্তে নেই, তবুও মাধবপাশার রাজবাড়িতে এই তথ্য পৌঁছাতে সময় লাগবে না। কারণ শুধু দিল্লির দরবারে নয়, চক্রান্ত এবং উচ্চাশা মাধবপাশার রাজবাড়ির সভাগৃহ থেকে অন্দর মহলেও খুব কম নয়।

কীর্তিনারায়ণ এমন এক দেশের রাজা, যে দেশে সম্পদ আছে সীমাহীন, আর সে সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য শক্তিশালী, ভাগ্যান্বেষী, ক্রূর প্রকৃতির, পশুর থেকেও হিংস্র মানুষ এসে থাবা বসাচ্ছে। তার বোধবুদ্ধি জন্মাবার পর থেকেই সে বুঝে ফেলেছিল যে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক না থাকলে শুধু বিপদ নয়, প্রাণসহ সর্বস্বান্ত হওয়ার ভবিতব্য। তার মাতামহ যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য অতীব শক্তিশালী এবং সাহসী হওয়া সত্ত্বেও অতি অল্প সময়ে অস্তমিত। মোগলদের বিরুদ্ধে স্পর্ধা করেছিল সে। মানসিংহের থেকে টোডরমলকে ভীতি তার বেশি ছিল। একবার জড়িয়ে ফেলতে পারলে মাকড়সার জালে মাছির মতো অবস্থা হবে তাদের। একথা শুধু প্রতাপ নয়, সব ভুঁইয়ারাই জানত। কীর্তির কখনো মনে হয়েছে তার মাতামহের অন্য কোনো উপায়ই যেন ছিল না। ফলে অপরিসীম ক্রোধী রাজা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত, ধৃত এবং পিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে দিল্লির পথে। বারাণসী পৌঁছে সেই পিঞ্জরের মধ্যেই করুণ মৃত্যু হল তার। অতি অল্পদিনে ভয়ংকর প্রতাপাদিত্যের বীরগতি হল।

মাতামহের সঙ্গে তার পিতার সম্পর্ক ভালো ছিল না। রামচন্দ্র রায়ের বিয়ের সময় যশোরে এক বীভৎস নাটকীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। তাতে জামাইসহ তাবৎ বরযাত্রীকে প্রতাপাদিত্য কেটে ফেলার নির্দেশ দেন।

সে যাত্রা কোনো মতে পার পেয়ে গেলেও বাকলার সঙ্গে যশোরের সম্পর্ক কখনো আর ভালো হয়নি।

শেষ পর্যন্ত দয়ালহরি প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করেছে, ক্ষেমংকর সে বিষয়েও জানে। সহোদর বিধবা বোনের বিধবা সপত্নীকে প্রতাপ ধর্ষণ করেছিল। সুন্দরী এবং যুবতীরা প্রতাপের সংস্পর্শে কোনো কালেই নিরাপদ

ছিল না। ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হল না রাজা। পুরোহিতকে বলল বিয়ের আয়োজন করতে। ব্রাহ্মণ তাতে রাজি হল না। প্রতাপ তাকে বলল যে সংকল্পের সময় কায়স্থকে শূদ্র বল তোমরা। এখন এই বামনাই নিয়ম কেন? হয় বিয়ে দেও, নাহলে কুকুর দিয়ে তোমার কান চাটাব! কিন্তু পুরোহিত এবং অন্য ব্রাহ্মণেরা এই ভয়ংকর শাসানিতেও রাজি হল না। ইতিমধ্যে ওই মহিলা আত্মহত্যা করে প্রতাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল। এছাড়া 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করার সময়েও প্রতাপের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিরোধ হয়েছিল। দাম্ভিক এবং নৃশংস প্রতাপ সেবারেও পরাজয় বরণ করে।

যশোরের এবং ধূমঘাটের রাজবাড়ি ছত্রখান অবস্থা প্রাপ্ত হলে সেখানকার কিছু মানুষ স্বজন হিসেবে রামচন্দ্র রায়ের মাধবপাশায় স্বাভাবিকভাবেই আশ্রয় নিয়েছিল। কীর্তি জানে এইসব মানুষ সবাই তেমন নিরীহ নয় এবং তাদের মধ্যে কারো কারো উচ্চাশা বাঁকা পথ ধরতেই পারে।

এছাড়া আছে তার জ্ঞাতিরা। কায়স্থদের কূটবুদ্ধি এবং স্বার্থপরতার নানা গল্পকথা নিয়ে তারা নিজেরাই একে অন্যকে পরিহাস করে।

কাজেই রাজধানীতে ফিরে এসে সরাসরি অন্দর মহলে ঢুকল না কীর্তি। বহির্বাটিতে সভাগৃহ সংলগ্ন গুপ্তকক্ষে প্রবেশ করল সে। মন্ত্রীদের ডাকার আগেই তারা এসে উপস্থিত হল। সবার মুখ গম্ভীর। কেউ কিছু বলার আগেই রাজা কীর্তিনারায়ণ জেনে গেল সে এবং সেই সঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ দুইয়েরই ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।

অনেক পরে ক্ষেমংকর বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানা আছে। আরো জানি, চর্চিত ধর্ম এবং আশ্রিত সমাজ ছেড়ে যেতে দেহ ছেড়ে যাবার মতো মানসিক কষ্ট হয়, আমি চিকিৎসক হিসেবে একথা জেনেছি। কিন্তু চক্রবর্তী মশাই, আপনাদের মতো সমাজপতিদের প্রচেষ্টায় হিন্দু সমাজ এদেশে কী পরিমাণ ভাঙনের মুখে পড়েছে সে খবর হয়তো রাখেন না। সবাই জানে হিন্দু হয়ে জন্মাতে হয়, হিন্দু হওয়ার অন্য কোনো উপায় নেই। অন্য ধর্মে এমন বিধান নেই। ভালোবেসে, বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে বা নিরুপায় হয়ে, এই তিন উপায়েই হিন্দু সমাজের মানুষ দলে দলে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। আমার বহু সময়ই মনে হয়েছে, আপনাদের মতো সমাজপতিরা যখন আছেন বলপ্রয়োগের কোনো কারণই নেই। এক সময়ে এদেশে কোনো মুসলমান ছিল না, এখন হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা দশ আনা-ছ আনা। আমি অসংশয়ে

বলতে পারি আগামী একশো বছরের মধ্যে এই অনুপাত আধাআধি এবং পরবর্তী শত বছরে তা ছআনা-দশআনা হবে। চর্চিত ধর্ম ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হয়, চক্রবর্তী মশাই, এ কথা ঠিক কিন্তু একবার ছেড়ে গেলে, তা মানুষ যেভাবেই যাক, নতুন ধর্মকে মনেপ্রাণে আশ্রয় করতেও বেশি সময় লাগে না। আপনার মতো কাষ্ঠহিন্দুর আঁধারমানিকের গেদু মোল্লার মতো নিকষ মুসলমান হতে এক প্রজন্মই যথেষ্ট। আচ্ছা প্রণাম। আশা করি আমার কথাগুলো আর একবার চিন্তা করবেন।'

উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষেমংকর নিজেকে সংযত করে আবার বলল, 'আমার উত্তেজনা মার্জনা করবেন। তবে বিষয়টির গুরুত্ব দয়া করে অনুধাবন করুন। শাস্ত্রকারেরা যুগানুযায়ী বিধি নিষেধ লঘু-গুরু করেছেন। এক সময় বাঙালি ব্রাহ্মণের আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে শাস্ত্র তো আপনাদের সে অনুমতি দিয়েছে। রঘুনন্দন স্বয়ং ধর্মান্তরিত মানুষের পুনরায় হিন্দু হবার ব্যবস্থা করে গেছেন।'

দয়ালহরির মুখমণ্ডল আরো কুটিল হল। বঙ্গে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সব জাতই শূদ্র। বৈদ্যদের মধ্যে কোনো কোনো গোষ্ঠী উপবীত ধারণ করে নিজেদের ব্রাহ্মণদের প্রতিস্পর্ধী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। করছে অন্য জাতীয়রাও। কিছু লোভী দরিদ্র ব্রাহ্মণ এসব ব্যাপারে এদেরকে সহায়তা এবং উৎসাহ পর্যন্ত দিচ্ছে। বৈদ্যরা ভুলে যাচ্ছে যে তাদের উৎপত্তিতে হস্তীচিকিৎসক, সর্পবেদে এবং ক্ষৌরকারের মতো নিকৃষ্ট রক্তের সংমিশ্রণ আছে। এই সাতঘাটের জল খাওয়া বদ্যিটাকে কিছু শিক্ষা দিতে হবে। সে বলল, 'তোমার ধৃষ্টতা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি! তুমি কি আমাকে শাস্ত্র শেখাচ্ছ! কোটালিপাড়া, নলচিরা, ধাত্রীনগর এবং উজিরপুরের ব্রাহ্মণ সমাজের যবন এবং মগস্পর্শ দোষহেতু প্রায়শ্চিত্ত বিধান নির্দিষ্ট আছে। যথাসময়ে সেসব জানতে পারবে। সেই প্রায়শ্চিত্ত পালন করে যারা পুনরায় হিন্দুধর্মে স্থিতিলাভ করতে চাইবে, তারা থাকবে। যারা চাইবে না—'

ক্ষেমংকর বাধা দিয়ে বলল, 'চক্রবর্তী মশাই রঘুনন্দন, দেবীবর ইত্যাদি মহাত্মারা সান্তপন, চান্দ্রায়ন এবং প্রাজাপত্য, এই তিন বিধানে শুদ্ধ হওয়ার পদ্ধতি সমাজে চালু করেছিলেন। আমি আপানাদের অনুরোধ করব যাতে এই তিন উপায়েই শুদ্ধি অনুষ্ঠিত হয়।'

চক্রবর্তী বলল, 'অনুরোধ করার তুমি কে? চন্দ্রদ্বীপের ব্রাহ্মণসমাজই এ

বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। যাই হোক, তোমার সঙ্গে কথা বাড়াতে চাই না। যথাসময়ে সব জানতে পারবে।'

ক্ষেমংকর কিছুক্ষণ নিশ্চুপে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সখেদে বলল, 'চক্রবর্তী মশাই, আপনি এই ধাত্রীনগর এবং এর আশপাশের পাঁচ-দশটি গ্রাম-নগরই দেখেছেন। আমি কিন্তু উত্তর ভারতের অনেক প্রাচীন, অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত অধ্যুষিত গ্রাম, নগর, জনপদ দেখেছি। উত্তর কিংবা দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণেরা গৌড়বঙ্গের ব্রাহ্মণদের দ্বিতীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণ মনে করে। কিন্তু বাঙালি ব্রাহ্মণের মতো জাতের শুদ্ধতা রক্ষার নামে এমন অত্যাচার আমি অন্য কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

ক্ষেমংকর এই ব্রাহ্মণ সমাজের ক্ষমতার কথা জানে। ধাত্রীনগরে এদের সর্বশেষ শিকার সদাশিবের পরিবার। সদাশিবের মা তার পিত্রালয়ে যাওয়ার পথে নদীতে ঝড়ের কবলে পড়ে। ঝড়ে নৌকাসহ যাত্রীরা নদীতে নিমজ্জিত হলে নিকটস্থ গ্রামের মুসলমানেরা কয়েকজনকে উদ্ধার করে এবং নিজেদের গ্রামে আশ্রয় দেয়। সদাশিবের মায়ের কাণ্ডজ্ঞান ফিরতে দু'দিন পার হয়ে যায় এই দু'দিন এবং তার পরের আরো তিনটি দিন নদীতীরের উদ্ধারকারী ব্যক্তিদের একজনের গৃহে সে অধিষ্ঠান করে, খবর পেয়ে যথাসময়ে সদাশিব তাকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর ধাত্রীনগরের সমাজ প্রথমে তাকে মাতৃত্যাগ করতে বলে। শাস্ত্রে এবং তর্কবিদ্যায় দুইয়েতেই দক্ষ সদাশিব সমাজের এই সিদ্ধান্তের শুধু প্রতিবাদ নয়, যুক্তি ও শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা চাইল। ব্রাহ্মণরা মুসলমানগৃহে আশ্রয় এবং অন্নজল গ্রহণের অভিযোগে সাদশিবকে মাতৃত্যাগ করতে বলল। সদাশিব মানবধর্মের প্রসঙ্গ তুলল এবং শাস্ত্রসম্মত 'আতুরে নিয়মোনাস্তি' এই প্রবচনে সমাজের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাইল।

দয়ালহরির নেতৃত্বে সমাজ তপ্ত ঘৃত পানের বিধান দিলে সদাশিব বুঝতে পারল এই মূর্খ ব্রাহ্মণ আসলে তার প্রতিশোধস্পৃহাই চরিতার্থ করতে চায়। তার কুরূপা মেয়েটিকে সদাশিববের ছোটভাই বটুকের সাঙ্গে বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল দয়াল। মেয়েটি শুধু কুরূপা নয়, ভগ্নস্বাস্থ্যও। তার বয়সও গ্রামসুদ্ধ সবাই জানে। বটুকের থেকে বেশ কয়েক বছরের বড়। স্বাভাবিক কারণেই দয়াল আশাহত এবং ক্রুদ্ধ হয়। এতদিন পরে সে সুযোগ পেয়েছে। সুতরাং সদাশিব বুঝতে পারল তার নিস্তার নেই। শেষ প্রয়াস হিসাবে সভাস্থ ব্রাহ্মণদের কাছে সে খোলা আহ্বান রাখল এই নরপিশাচদের বিধান অমান্য

করতে। সে বলল, 'তপ্ত ঘৃত পান কিংবা জ্বলন্ত অঙ্গারের পাত্র মাথার উপরে ধারণ করা আসলে নরহত্যার নামান্তর। আপনারা আমাকে কলিযুগের পরশুরাম হতে বলবেন না। দোহাই আপনাদের! আপনারা আমার সহায় হোন। অগ্রাহ্য করুন এইসব কুচক্রীদের, যারা শাস্ত্রের কিছুই জানে না।' ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজনও একটি শব্দ উচ্চারণ করল না। এমনকী বিষ্ণুপ্রিয়, চক্রবর্তীর এই কুরূপা মেয়েটির কারণে যে নিজেও নিগৃহীত হয়েছিল, সদাশিবের আবাল্য সুহৃদ কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সহপাঠী বিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্য পর্যন্ত আধোমুখ হয়ে বসে রইল।

ফলে মাতৃহত্যা অপেক্ষা সদাশিব সপরিবারে ধর্মত্যাগ শ্রেয় মেনে নিল।

সদাশিবের কথা স্মরণ করে মনে মনে একটু আতঙ্কিতই হল ক্ষেমংকর। উদার এবং নানা শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও সে তো বৃহত্তর হিন্দু সমাজেরই অংশ। তার প্রতি স্পর্ধা কি এতখানি শক্তিশালী হবে?

ক্ষেমংকর দয়ালহরিকে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে না পেরে বৃথা সময় নষ্ট করল না। নানা ধরনের ধর্মীয় জীবন দেখার অভিজ্ঞতা হওয়ার ফলে এতদিন তার একটা ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম, তা যে কোনো ধর্মই হোক না কেন, মানুষের উপকারের থেকে অপকারই বেশি করেছে। একটি নতুন ধর্ম বিশ্বাস অবশ্যই পুরাতন ধর্মবিশ্বাসগুলোর এবং অনাগত ভবিষ্যৎ ধর্মবিশ্বাসগুলোর প্রতিস্পর্ধী। ফলে মহাশক্তিশালী সংগঠন তৈরি করে ধর্মীয় প্রবক্তারা ঈশ্বরকে এবং মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করে।

নিজের বাড়িতে ফিরে এসে খানিক সময় সে অন্ধকার বৈঠকখানায় একাই বসে রইল। সদা সজাগ এবং সতর্ক ময়ূরীকে সে কাল রাতের মতো ছুটি দিয়েছিল। ময়ূরী মায়ের অসুস্থতার কারণে লোক দিয়ে আরো একদিন অনুপস্থিত থাকার কথা জানিয়েছে। কাজেই এ বাড়ির ভৃত্যদের না ডাকলে তারা খেয়াল করবে না। হঠাৎ নিজেকে ভারী নিঃসঙ্গ বোধ হল তার। সত্যিই তো, এ বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? তিন বছর বয়সে দুচোখ বিস্ময় নিয়ে এ বাড়িতে এসে সে ঢুকেছিল। মহামায়া তার স্বামীর বংশের নির্ভুল নিশানা ঈষৎ সংযুক্ত দীর্ঘায়িত দু'টি ভুরু এবং তার নীচের গভীর এবং তীব্র দু'টি চোখ দেখে ক্ষেমংকরকে বুকে টেনে নিয়েছিল। কিন্তু কোনোদিনই তার মায়ের প্রসঙ্গ তোলেনি বা সেই প্রাথমিক পর্বে প্রমথনাথ

যে বন্দোবস্ত করেছিল, তার অন্যথা হতে দেয়নি।

নিজেকে ভারী নিঃসঙ্গ দেখল ক্ষেমংকর। নিঃসঙ্গ সে কিশোর বয়স থেকেই। আজ এই মুহূর্তে কী এক তীব্র হতাশা তাকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। চিকিৎসক হিসাবে সে জানে হতাশা থেকে তাৎক্ষণিক রেহাই পেতে এক গেলাশ আরক এবং শয্যায় ময়ূরীকে তার দরকার। আরকের ব্যবস্থা তার হাতের কছেই আছে কিন্তু ময়ূরীকে আজ রাতে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ময়ূরীবিহীন আরকে তার যন্ত্রণা আরো বৃদ্ধি পাবে, এই আশঙ্কায় সে অন্ধকার শয্যায় একাই দগ্ধাতে থাকল।

১৭

সেই প্রাথমিক বন্দোবস্ত প্রমথনাথ সব দিক বিবেচনা করেই করেছিল। প্রথম দিন মাধবীকে দেখার পরই তার মন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় ত্রিপুরাশঙ্করের সঙ্গে মাধবী বিষয়ে সকৌতুক আলোচনা এবং আরো পরে ত্রিপুরার অনুরোধে আমদানি করা ইউরোপীয় মদ তিন চার পাত্র খাওয়ার পর তার মনের উপরের আগল একেবারে হাট হয়ে খুলে গিয়েছিল। এক সময়ে নিজের মনের ভিতরের নানা বিরুদ্ধ বিশ্বাস এবং ক্ষোভ ঠেলে স্বগতোক্তি বেরিয়ে এসেছিল 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি!'

মদ এবং স্ত্রীলোক বিষয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ ত্রিপুরা বলেছিল, 'মাভৈঃ, স্মৃতিতেও সমর্থন পাবে। মনু এসব বহু আগেই তোমার জন্য ব্যবস্থা করে গেছেন! কখনো কখনো হিন্দুশাস্ত্র সত্যিই ভারী বিবেচক।'

কিন্তু মদের নেশার ভিতরেও প্রমথনাথ তার তীব্র আবেগঋদ্ধ, সীমাহীন অভিমানী স্ত্রীর কথা ভোলে না। তাদের খুব অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছিল এবং মহামায়া তার থেকে বয়সে মাত্র তিন বছরের ছোট। সম্ভবত সেই কারণেই

মহামায়া মহাশক্তিশালী বিরুদ্ধতা তৈরি করতে পারত যদি প্রমথনাথ তার মতের বিপরীতে কিংবা গোপনে কোনো কাজ করত। কিন্তু এই মুহূর্তে নেশার কারণে মস্তিষ্ক যখন তরল, তখন এসব প্রতিবন্ধকতা প্রমথনাথের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হল না।

রাত আরো এগিয়ে যেতে তারা পানের আসরেই রাতের খাওয়াও সেরে নিল। শেষে নির্দিষ্ট ঘরে রাত্রিবাসের জন্য পৌঁছে দিয়ে ত্রিপুরাশঙ্কর নিজের শয়নকক্ষে চলে গেল।

শোয়ার পরে রক্ত থেকে নেশা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে থাকলে প্রমথনাথ সেখানে অতৃপ্তির হতাশা জমে ওঠা টের পেল। নেশা স্নায়ুকে স্তিমিত করে দিলে মানুষের দ্রুত ঘুম আসে। কিন্তু ত্রিপুরাশঙ্করের মেঘনা তীরবর্তী বাড়িতে শুয়ে ব্যাপারটা একেবারে উলটো হল তার। দুচোখের ঘুম কোথায় হারিয়ে গেল, কে জানে? নেশার অবসাদ হঠিয়ে পাকস্থলীর নীচের প্রবল প্রবৃত্তি হঠাৎ রাত্রির রহস্যের দাবিদার হয়ে ওঠল। কুলুঙ্গির ভিতর রাখা প্রদীপে তেলের অভাবে শেষ পর্যন্ত বুক জ্বলে নিবে গেল। পোড়া তেলের কটুগন্ধ অন্ধকার ঘরের পুরো দৈর্ঘ্য প্রস্থ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

তীব্র একটা হতাশা প্রমথনাথের শরীর ও মন অধিকার করে নিল। সে বারকয়েক এপাশ-ওপাশ করল অন্ধকার শয্যায়। শেষে উঠে মাথার কাছের জানলা খুলে বাইরের অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়াল সে।

জানালার বাইরে অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে ছোট বড় গাছ। কার্তিকের ঈষৎ হিম বাতাসের স্পর্শে তার ভালো লাগল। সামনে সামান্য দূরেই মেঘনা, এই জানালা থেকে অবশ্য তাকে দেখা যায় না। কিন্তু বিশাল বিস্তৃতি নিয়ে, অতল গভীরতায় দিগন্তকে ছুঁয়ে সে আছে।

এই বাড়ির কোথাও মাধবী শুয়ে আছে। শুয়ে আছে অথবা হয়তো তার মতোই কোনো জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সাত হাত ঘোরা সাতঘাটের জল খাওয় স্ত্রীলোকটি কী সুন্দর! কী গভীর তার দুই স্তন মধ্যবর্তী খাঁজ! কী অতল সম্মোহন তার দুই চোখে! কী করে এসব সে রক্ষা করল! চল্লিশ অতিক্রান্ত প্রমথনাথের মনে হল কেউ যেন সারাজীবন তাকে ফাঁকি দিয়েছে। অথবা ভারী নির্বোধের মতো সারাটাজীবন ধরে সে ঠকে গেছে!

সে ত্রিপুরাশঙ্করকে কিছু বলল না কিন্তু পরের সারাটা দিন মাধবীকে নিয়ে মনে মনেই আচ্ছন্ন হয়ে রইল। আবিষ্টতা কখনো কখনো ত্রিপুরাশঙ্করের

সাক্ষাতেই তাকে অন্যমনাও করে ফেলছিল। সন্ধ্যার পরে বন্ধুর ইঙ্গিতেও আজ সে পান করতে উৎসাহ দেখাল না। অবশেষে রাত্রের আহারের পর তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে এসে শয্যায় বসতে প্রমথনাথের মনে হল এমন অধীরতা সে তার প্রথম যৌবনেও কখনো অনুভব করেনি।

শয্যার উপর বসে সে টের পেল যে শুধু অধীরতা নয়, এতক্ষণে সে অপেক্ষাও করতে শুরু করেছে। সে কাউকে আহ্বান করেনি, কেউ তাকে কোনো কথা দেয়নি, তবুও তার শরীর মন জুড়ে আকুল অপেক্ষা।

একজন মধ্যবয়স্কা দাসী ভিতরে এসে জলের পাত্র রাখল শয্যার কাছাকাছি। রুপোর থালিতে করে দু'টি পানের খিলি রাখল প্রমথর শয্যার কাছের কুলুঙ্গিতে। দূরের কুলুঙ্গিতে যেখানে প্রদীপ রাখা আছে, সেখানে গিয়ে বঁশের চোঙা থেকে খানিকটা তেল ঢেলে ভর্তি করল সে।

নিঃশব্দে এসব করে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে প্রমথনাথ অকস্মাৎ বলল, 'তোদের সবার খাওয়া-দাওয়ার পাট মিটেছে, দাসী?

দাসী একটু চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক হলেও কণ্ঠস্বরে তা প্রকাশ করল না। বলল, 'আজ্ঞে না, কবিরাজ মশাই, তবে সামান্য সময়ের মধ্যেই হয়ে যাবে।'

প্রমথ অকম্পিত কণ্ঠে বলল, 'হয়ে গেলে মাধবীকে একবার এ ঘরে আসতে বলবি।'

দাসী ঈষৎ মাথা হেলিয়ে বাইবে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে মাধবী এসে ঘরে ঢুকল।

প্রমথনাথ এমন ব্যগ্র হয়ে প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়েছিল যেন সে দমবন্ধ করে আছে।

মাধবী সম্ভবত রাত্রিকালীন বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। শাড়ির উপরে ঊর্ধ্বাঙ্গে একখানা চাদর জড়ানো তার। দরজা দিয়ে ঢোকার সময়ও সে আধোমুখী, যেন জানত প্রমথনাথ এই দিকেই দৃষ্টিনিবদ্ধ করে আছে।

'মশাই ডেকেছেন আমাকে?' আধোমুখেই মাধবী বলল। মূল প্রবেশদ্বার থেকে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে সে।

প্রমথনাথ তৈরি হয়েই ছিল। বলল, 'হ্যাঁ। বোসো।'

তার শয্যার বাঁ দিকে বসার জন্য রাখা একটি ছোট চৌকি ছিল। প্রমথ সেদিকেই ইঙ্গিত করল।

মাধবী যে খানিকটা বেশ সপ্রতিভ, প্রমথ তা আগেই লক্ষ করেছে। সে ছোট চৌকিতে বসল।

'আজ থেকে ওষুধ সেবন শুরু করার কথা ছিল না? ওষুধ সেবন করেছ?' প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

মাধবী আধোমুখ থাকায় প্রমথ স্বচ্ছন্দে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারছিল, না হলে, স্বাভাবিক শিষ্টতাবোধে তার মতো মানুষ এমন নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে থাকতে পারত না। এই মুহূর্তে তার দৃষ্টি অবশ্যই চিকিৎসকের দৃষ্টি নয় কোনোভাবেই।

মাধবী মৃদস্বরে বলল 'সন্ধেবেলা ওষুধ নিয়েছি।'

'ওই ওষুধেই কাজ হবে। আপাতত সন্ধেতেই এক বড়ি করে সেবন করবে', প্রমথ কথা বানাবার চেষ্টা করছিল। কেননা, এমন নিভৃতে ডেকে ওষুধের কথা জিজ্ঞেস করার কোনো দরকার ছিল না। আবার বলল, 'ওষুধে কোনো অস্বস্তি বোধ হচ্ছে না তো?'

'ঘুম পাচ্ছে, এত তাড়াতাড়ি তো ঘুম আসে না।'

মাধবীর কণ্ঠস্বর যেন একটু শ্লথ হয়েও এসেছে।

প্রমথনাথ এ ব্যাপারটাও জানে। আরো জানে ওষুধের প্রভাবে মাধবীর মনের উপরের চাপও শিথিল হয়েছে। সে বলল, 'সকালে অন্যদের সমক্ষে একটা দরকারী বিষয় জেনে নেওয়া হয়নি। তোমার মাসিকের কোনো অসুবিধা নেই তো? মানে ব্যাপারটা স্বাভাবিক আছে তো?'

মাধবী গায়ের চাদরখানা আরো একটু আটো করে মুঠোর মধ্যে ধরে থাকল। কেন যে এই লোকটির সামনে কথা বলতে তার এত আড়ষ্ট লাগছে, কে জানে? সে কোনো উত্তর করতে পারল না।

প্রমথনাথ বেশি সময় তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না। বলল, 'তোমার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য অবশ্য বেশ ভালো, কাজেই ও ব্যাপারটা ঠিক থাকারই কথা। তবুও যদি কোনো অসুবিধা থাকে জানাতে সংকোচ কোরো না।' নতমুখ মাধবীর দিক থেকে চোখ সরাতে পারছিল না সে।

মাধবী এ কথার উত্তরে শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

প্রমথ বলল, 'ত্রিপুরাশঙ্করের কথায় এবং তোমার সঙ্গে কথা বলেও আমার মনে হচ্ছে যে বর্তমানে যে স্থিতাবস্থায় তুমি আছ, সেখান থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে দেওয়ার বা অন্য কোনো ব্যবস্থার সম্ভাবনাতেই তোমার

শরীর ও মন আশঙ্কায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, ঠিক বলেছি?'

এই প্রথম মাধবী তির্যক মাথা তুলে এক ঝলক তার চিকিৎসকের দিকে তাকাল। আর প্রমথর তৎক্ষণাৎ মনে হল, সত্যিই বিধুমুখী!

মাধবী এবার অস্ফুটে বলল, 'আমি ক্রীতদাসী, শরীর মনের মালিক তো আমি নিজে নই। আশঙ্কায় যাতে বিরূপ না হয়ে ওঠে সেই ব্যবস্থা করুন মশাই। আমার জন্য আমার মালিকের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।'

এই দীর্ঘ বাক্যটি শুনে প্রমথনাথ আরো চমকিত হল। এই যুবতী শুধু সুন্দরী নয়, বুদ্ধিমতীও বটে।

সে বলল, 'আমার বন্ধু তোমাদের সৌভাগ্যক্রমে অন্যান্য ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর মতো নৃশংস নয় বলেই আমার ধারণা। কিন্তু সে তো মূলত ব্যবসায়ীই। তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমার কোনো নিজস্ব হিসাব আছে? কোনো পরিকল্পনা?'

'মশাই জানেন, আমি ক্রীতদাসী!' খুব শ্লথ ভঙ্গিতে এবং যেন একটু তরল হাসিও ছিল সঙ্গে এমনভাবে বলল মাধবী।

প্রমথনাথ মনে মনে উত্তেজিত হল। পূর্ব পরিকল্পনা কিছু ছিল না কিন্তু এখন সে জানে সন্ধ্যায় সেবন করা ওষুধের প্রভাবে মাধবী উত্তরোত্তর অধিক প্রগলভ হবে। তার আশ্লেষ আকাঙ্ক্ষা এই সম্ভাবনায় যাবতীয় চিকিৎসক শিষ্টাচারেরও সীমা অতিক্রম করে যেতে লাগল। সে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখে ফের জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পূর্ব জীবনের কথা কিছু বলবে আমাকে মাধবী? কীভাবে, কত হাত ঘুরে ত্রিপুরাশঙ্করের এই আবাসে এসে উপস্থিত হয়েছ?'

মাধবী তার গায়ের চাদরের ভিতর থেকে হাত বের না করেই একটা উদ্গত হাইকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই জৃম্ভণ এত দীর্ঘ ছিল যে কিছুতেই ব্যাপারটা গোপন রাখা গেল না। খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে সে একবার বলল, 'আজ্ঞে?' তারপর বলল, 'চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে আমার বিয়ের দিনে ফিরিঙ্গিরা আমাকে লুট করে নিয়ে যায়, এই তো আমার পূর্বজীবনের কথা।'

মাধবীর ভঙ্গিতেই প্রকট যে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলার উৎসাহ তার নেই। সম্ভবত অনেককেই এসব কথা তার বলতে হয়েছে, তাই আরো একবার বলতে তার ক্লান্তি।

'কোথায় বাড়ি ছিল তোমাদের?' প্রমথ ব্যাপারটা এত অল্পে ছেড়ে দিল না। মনের ভিতরে তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল।

মাধবী ক্লান্ত চোখ তুলে সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে রইল। এত দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইল যে প্রমথরই অস্বস্তি হল। সমকৌণিক দূরত্বে অবস্থিত প্রদীপের শিখা মাধবীর উত্তোলিত দীর্ঘপল্লব চোখ দুটির ভিতরে দুটি আলোক বিন্দু হয়ে কাঁপতে লাগল।

'যশোর রাজ্যের দেউলহাটায়।' ক্লান্ত দূরবর্তী কণ্ঠে বলল মাধবী।

'তোমার পৈতৃক পদবি কী?'

মাধবী জলচৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সুললিত ভঙ্গি করে শরীরের আড় ভাঙল। খুবই সম্ভব যে এই সুললিত মদালসা ভঙ্গিটি প্রমথ প্রদত্ত ওষুধের মাদক প্রতিক্রিয়া। চৌকিটির আয়তন ছোট, তার মতো ভরাভরতি যুবতীর সেখানে বেশিক্ষণ বসে থাকা অস্বস্তির কারণ নিশ্চয়ই হতে পারে।

আর একবার হাই তুলল সে, তারপর হেঁটে পুবদিকের জানালার কাছে গিয়ে জানালা খুলে দিল। বলল, 'মশাই, আমি কায়স্থ ঘরের মেয়ে ছিলাম। কিন্তু তাতে কি কিছু যায় আসে? মশাই, আপনি এতসব জানতে চাচ্ছেন কেন?' অপরিসীম নিদ্রালুতা সত্ত্বেও মাধবী সতর্ক থাকতে চেষ্টা করছিল।

'তোমার কি আদৌ বিবাহ হয়েছিল?'

মাধবী জানালার দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'না। বিবাহের দিনই নদী দিয়ে আসা ফিরিঙ্গি ডাকাতেরা লুণ্ঠন করে আমাকে। তারপর দশটি বছর কেটে গেছে। এই দশ বছরের মধ্যে শেষ সাত বছর আমি ব্যানডেলে একজন ফরাসি ব্যবসায়ীর বাড়িতে ছিলাম। সে আমাকে পর্তুগিজ পিদ্রুর কাছ থেকে কিনেছিল। ফরাসি ব্যবসায়ীর পক্ষাঘাত রোগ হয়েছিল। বস্তুত, তার দেখাশোনার জন্যই তার স্ত্রী আমাকে কিনেছিল। কিন্তু মশাই—'

দুই হাত উপরে তুলে, বাঁ হাতের মধ্যে ডানহাত নিয়ে মাধবী কাতর ক্লান্তিতে আড় ভাঙল আবার। আর এইভাবে হাই তুললে তার উত্তোলিত বাহু দুটির টানে গায়ের চাদরও বেশ খানিকটা ঊর্ধ্বে উঠে গেল এবং প্রমথনাথের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ফণা তোলা সাপের মতো মাধবীর দুটি স্তন দুলে উঠল।

শরীরের যাবতীয় প্রাণশক্তিতে ঝাঁকানি লেগে প্রেম এবং সন্তান আকাঙ্ক্ষা একই সঙ্গে জেগে উঠল প্রমথনাথের শরীরে।

হাত নামিয়ে জড়িত কণ্ঠে মাধবী বলল, 'মশাই আমাকে এতসব জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমাকে কিনে নিয়ে যাবেন?' দেয়ালে হেলান দেওয়া অবস্থায় সে ঈষৎ দুলতে লাগল। ঠিক দোলা নয়, তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে যেমন হয়, তেমন আর কি!

প্রমথনাথ ফিসফিস করে বলল, 'যাবে আমার সঙ্গে? আমাকে পছন্দ হয়? আমাকে একটি-দুটি সন্তান দেবে?'

ওষুধের প্রতিক্রিয়া মাধবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। চিকিৎসক প্রমথনাথ জানে তার শরীর এখন নিবিড় শয্যা চাচ্ছে। শয্যা না পেলে মাটিতেও লুটিয়ে পড়ে সে ঘুমিয়ে পড়বে। বস্তুত, তাই যেন হতে যাচ্ছিল। দেয়াল ঘেঁষটে খানিকটা এলিয়ে পড়েই সতর্ক হল মাধবী। বলল, 'আমার খুব ঘুম পাচ্ছে মশাই। যদি অনুগ্রহ করে—, বাকিটুকু জড়িয়ে গেল তার কণ্ঠে।

প্রমথনাথ শয্যা থেকে নেমে এসে তাকে দুই বাহুতে ধরল। মৃদু আকর্ষণ করে বলল, 'এদিকে এস, পড়ে যাবে যে।'

মাধবী চেষ্টা করেও নিজের দেহকে পুরোপুরি বশে রাখতে পারছিল না। প্রমথর শরীরে ভর দিয়ে যে প্রমথর শয্যাতেই এসে বসল।

শিবনেত্র হয়ে শক্তভাবে বসবার চেষ্টা করাতে তার শরীরে অপরিচিত এক লাস্য এসে জড়িয়ে গেছে।

প্রমথনাথ তাকে ওইভাবে রেখে আধা-খোলা দরজার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল। চারদিক ঘিরে ঘরতোলা উঠানটি অন্ধকার এবং শুনশান। সে কাউকে ডাকবে কিনা বা কাকে ডাকবে, স্থির করতে পারল না। হঠাৎ মেঘনার দিক থেকে একপাল শিয়ালের প্রহর অন্তের প্রবল ঘোষণা শুনে প্রমথনাথ চমকে উঠল। তাহলে দ্বিতীয় যাম শেষ হল।

দরজার হুড়কো তুলে দিয়ে সে পুবের জানালার কাছে গেল। শিয়ালেরা প্রবল হুল্লোড়ে ডাকছে। সে জানালাও বন্ধ করে দিল। শয্যার দিকে তাকিয়ে দেখল মাধবী তার উপরে গড়িয়ে পড়ে গেছে। সে শিয়ালদের ভাষা বোঝে না। মানুষের প্রবল বিশ্বাস শিয়ালেরা সংকটের মুহূর্তে মানুষকে কিছু উপদেশ দেয়, সংকটকালে সতর্ক করে।'

প্রমথনাথ দুই এক মুহূর্ত শেষবারের মতো চিন্তা করে অথবা কিছুই চিন্তা না করে শয্যায় এসে মাধবীর পাশে বসল। বলল, 'পা উপরে তুলে ঠিক হয়ে শোও।'

মাধবী দু-একবার ওঠার চেষ্টা করে বিফল হল।

প্রমথ তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'কাল থেকে এই বড়িটা অর্ধেক করে খাবে। মাত্রাটা তোমার পক্ষে একটু বেশি হয়ে গেছে।'

মাধবী ততক্ষণে ঘুমে তলিয়ে গেছে।

প্রমথর অদম্য ইচ্ছা হতে লাগল তাকে একবার সবলে আলিঙ্গন করে চুম্বন করে। প্রায় অচেতন হয়ে পড়া মাধবীর দেহকে আগলাবার ভঙ্গিতে প্রমথ তার দুই পাশে দুহাত রেখে খানিকটা ঝুঁকেও পড়ল।

প্রদীপ আজ উজ্জ্বল। সেই আলোয় ভিষক প্রমথনাথের প্রথমেই মনে হল প্রকৃতির একেবারে ত্রুটিহীন আয়োজন। এর কোল জুড়ে, বাহু জুড়ে সন্তানেরা ঝাঁপিয়ে নেমে আসবে, তবেই না প্রকৃতি তৃপ্ত হবে। মুগ্ধ দুই চোখে যুবতীর বলিষ্ঠ স্তন, ঢল নামার মতো নিম্নাঙ্গ এবং এই মুহূর্তে দৃশ্যমান নাভি অলৌকিক কল্পদৃশ্যের মতো মনে হল প্রমথর। সঙ্গে সঙ্গে তার গভীর এক উপলব্ধি হল। শুধু কামনা নয়, কামলালসা নয়, পুরুষের শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে, কোষে, রক্ততন্তুতে, শিরা, উপশিরা এমনকি প্রতিটি কেশে জড়িয়ে আছে প্রকৃতির প্রজাবৃদ্ধির এক উদগ্র কর্মপ্রেরণা। এ কাজে কেউ ফাঁকি দিলে প্রকৃতি তাকে ক্ষমা করবে না।

অথচ কী আশ্চর্য চন্দ্রদীপের বিস্তীর্ণ উপকূলের প্রায় সর্বত্র জন্মহার মৃত্যুহারের থেকে কমে গেছে। তাদের শৈশবে ঘরে ঘরে যেমন সারাক্ষণই শিশুদের কলকাকলি শোনা যেত, এখন তা কমই শোনা যায়। উচ্চবর্ণীয় বহু মানুষের সংসারে বন্ধ্যা স্ত্রীপুরুষ থাকা যেন একটা স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে গেছে। তার নিজের সংসারও যে নতুন প্রজন্ম থেকে বঞ্চিত তার কারণই বা কী? প্রমথনাথের হঠাৎ মনে হল এই প্রাচুর্যের দেশে প্রকৃতির মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণের মধ্যে মগ হার্মাদের নরখাদক সদৃশ ভূমিকাই একমাত্র কারণ। কী ভয়ংকর!

পরের দিন প্রাতরাশের সময় প্রমথনাথ বলল, 'এবার তো আমাকে বিদায় নিতে হবে, ত্রিপুরা। চিকিৎসক বিদায় কী দিয়ে করবে?'

ত্রিপুরাশঙ্কর সকৌতুকে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রহস্য ধরবার চেষ্টা করল। কী যেন আছে প্রমথর কণ্ঠস্বরে। বলল, 'তুমি যা চাইবে! অবশ্য তা

আমার সাধ্যের মধ্যে তো হতে হবে।'

প্রমথনাথ আর কোনোরকম ভূমিকা না করেই বলল, 'মাধবীকে চাই, দেবে? প্রমথর চোখ দুটিতে যেন কাঙালপনা দেখল ত্রিপুরা!

ত্রিপুরাশঙ্করের চোখ বিস্ফারিত হল। বন্ধুর আচরণে গতকাল একটু কৌতুক বোধ করলেও এতটা সে আশা করেনি। গতরাত্রের ঘটনাটি এখন পর্যন্ত তার গোচরে আসেনি।

সে যথার্থই বিস্মিত ভঙ্গিতে বলল, 'রসিকতা করছ না তো? সবদিক ভেবে দেখেছ? পরিবার? সমাজ? তোমার নিজের জীবন?'

প্রমথনাথ বলল, 'কাল তো তুমিই বললে শাস্ত্রে অনুমোদন আছে।'

ভালো লোককে শাস্ত্রকার ঠাউরেছ, ত্রিপুরাশঙ্কর উচ্চস্বরে হেসে উঠে বলল, 'শাস্ত্রের অধিকার তোমারও নেই, আমারও নেই। তবে এ কথা বলতে পারি, হিন্দুশাস্ত্রে আশ্রয় পাওয়ার মতো কোনো না কোনো ব্যবস্থা তুমি পাবেই। অবশ্য তোমাকে ক্ষমতাশালী হতে হবে, অর্থ ব্যয় করতে হবে। কিন্তু ভাই তুমি কি যথার্থ বলছ?'

প্রমথনাথ বলল, 'হ্যাঁ ভাই, যথার্থ বলছি। মাধবীলতার সঙ্গে কথাও বলেছি। কাল প্রায় সারারাতই ও ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করেছি। আরো পরিষ্কার করে তোমাকে বলছি, ক্রীতদাসী কিংবা উপপত্নী হিসেবে নয়, মাধবীকে আমি বিবাহিত স্ত্রী হিসাবেই চাই।'

ত্রিপুরাশঙ্কর হতবাক হয়ে গেল। প্রমথনাথ এতবড় ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে কেন? সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীলোকের কি অভাব আছে এই দেশে?

যেন তার মনের কথাটা শুনেই প্রমথ উত্তর করল, 'নিয়তি ত্রিপুরা, নিয়তি কেন বাধ্যতে! না হলে এতকাল পরে তুমিই বা আমাকে ডেকে আনবে কেন? আর আমিই বা এমন সংকটে পড়ব কেন?'

ত্রিপুরাশঙ্কর একটু অস্তস্তি সহকারে বলল, 'কিন্তু একেবারে বিয়ে করার প্রয়োজনটা কী?'

প্রমথ বলল, 'পুত্রার্থে। নিয়তিকে আমি এভাবেই খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করছি।'

'কিন্তু তোমার স্বজাতি সমাজ?' ত্রিপুরাশঙ্কর পুরোটা বুঝতে চাইল।

প্রমথনাথ বলল, 'আমার স্বজাতি সমাজ একটা বিবেচনার বিষয় বটে। বৈদ্যরা ক্রমেই অতি দাম্ভিক একটি জাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে এবং

প্রাণপণে তাদের উৎসকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছে। বৈদ্যরা এখন আর স্বীকারই করতে চায় না যে, তাদের জাত গঠন হয়েছে হামবৈদ্য, সাপের বেদে, ক্ষৌরকার, হস্তীচিকিৎসক ইত্যাদিদের নিয়েও। কারো কারো দম্ভ এই পর্যায়ে গেছে যে, তারা মনে করে দ্বিজেষু বৈদ্যঃশ্রেষ্ঠঃ! তবে সমাজকে তো এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তুমি এ ধরনের বিবাহ অনেক দিয়েছ, সুতরাং সব দিক বাঁচিয়ে একটা উপায় বার কর।'

'উপায় হচ্ছে অর্থব্যয়,' ত্রিপুরা বলল, 'সমাজপতিদের এবং অবশ্যই পণ্ডিতদেরও অর্থের প্রয়োজন হয়। সমাজপতিরা যদি তোমার প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়, তবে অর্থব্যয়েই তুমি পার হয়ে যাবে। মগদোষ, যবনদোষ, ফিরঙ্গদোষ, জাতপাত এসব পরিবাদে হিন্দু সমাজ যে ক্রমশই হতবল হয়ে উচ্ছন্নে যাচ্ছে, সে ব্যাপারটা শুধু চৈতন্যদেব নন, রঘুনন্দনও খেয়াল করেছেন। ফলে সান্তপণ, চান্দ্রায়ন এবং প্রাজাপত্যাদি প্রায়শ্চিত্তের কৃত্য মানবিক হয়েছে। এসব সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করে জাতভ্রষ্ট মানুষ আবার জাতে পুনঃপ্রবেশ করতে পারে। আর এসব বিধানের সঙ্গে অর্থদণ্ডের মহাবিধান তো আছেই। আগেকার কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্তবিধি, যেমন তপ্তঘৃতপান, ব্রহ্মতালু এবং দুই হাতের তালুতে জ্বলন্ত অঙ্গারের মালসা দীর্ঘসময় ধরে রাখার মতো বর্বর প্রথা এখন আর খুব একটা প্রচলিত নেই। তবে তোমার তৃষ্ণার জল যেখানে, সেখানে প্রায়শ্চিত্তের ভয় কী?'

প্রমথ বলল, 'নেই, এমন নয়। সবই সমাজপতিদের মর্জির উপরে নির্ভর করছে। যাই হোক তুমি ব্যবস্থা কর। মাধবীলতা প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করবে, তারপর আমি তাকে বিয়ে করব। এসব দিক দিয়ে মহম্মদি ধর্ম যথার্থ অগ্রণী। কুলটা স্ত্রীলোকদের পরিবর্তিত জীবনে বিবি হতে বাধা নেই। তাদের সমাজ সেক্ষেত্রে তাকে কিংবা তার বংশকে পতিত করে না।'

অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে অধিক দক্ষিণা সহকারে প্রায়শ্চিত্ত শেষে মাধবীলতার সঙ্গে প্রমথনাথের বিবাহ হল। ধাত্রীনগরে কেউ কিছু জানল না। মোতাহার হোসেনের আশ্রয়ে থাকল মাধবীলতা। যে ত্রিশ বিঘা সম্পত্তি চৌধুরী কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দান করেছিল, তা কাজে লাগল। পৃথক বাড়িতে দাসদাসীর ব্যবস্থায় মাধবীলতাকে সুরক্ষিত করল প্রমথনাথ। নবদম্পতির প্রাথমিক উন্মত্ততা দশদিনে কিছুটা প্রশমিত হলে প্রমথ বলল, 'আমাকে এবার

ধাত্রীনগর ফিরতে হবে। আশাকরি ভূতে আর ধরবে না তোমাকে। সময়মতো আমি আবার আসব। আপাতত গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে।'

কিন্তু গোপনীয়তা বেশিদিন বজায় থাকেনি।

বিয়ের দ্বিতীয় বছরে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিল মাধবী। সন্তান যে কী অসীম আনন্দের উৎস হতে পারে, চিকিৎসক প্রমথনাথের তা শুধু তত্ত্বগতভাবেই জানা ছিল। এখন সন্তানকে ছুঁয়ে, ছেনে, বুকে চেপে সে যথার্থই বুঝতে পারল কয়েক বছর আগে যখন মহামায়াকে প্রবোধ দিয়েছিল, তখন ব্যাপারটা সে আসলে বুঝতই না।

কিন্তু এই সুখ স্থায়ী হল না। মেয়েটির ছ-সাত মাস বয়সের সময়ে হঠাৎ একদিন প্রবল দাস্তবমি হয়ে মারা গেল। ধাত্রীনগরে এই খবর যখন পৌঁছল, প্রমথনাথ শোকে মূক হয়ে গেল। শেষে একবারে নাটকীয় সংঘাতের অনুরূপ চরম উচ্চতায় পৌঁছে মহামায়ার কাছে আত্মসমর্পণ করল প্রমথনাথ।

কিন্তু তাতে তার সংকট বাড়ল বই কমল না। মহামায়ার বিস্ফারিত চোখের ভাষায় প্রমথনাথের হৃদয়-বিদারক হাহাকারের জন্য কোনো আশ্রয় তো ছিলই না, কোনোকালে যে মার্জনা বা নিদেন সহানুভূতি নেমে আসবে এমনও মনে হল না।

আঘাতের প্রাথমিক পর্যায় পার হবার পর মহামায়া নিজের কোঠার দরজা বন্ধ করল। দুদিন এভাবে থাকার পর দরজা খুলে বাড়ির প্রধান পরিচারককে ডেকে নৌকার ব্যবস্থা করতে বলল। তার বাপের বাড়ি ধাত্রীনগর থেকে নৌকায় এক দিনের পথ। বাপের বাড়ির উদ্দেশে নৌকায় ওঠার আগে কেউ একজন এসে সাহস করে প্রমথনাথকে জানাল যে বড় বউঠাকুরুন পিত্রালয়ে যাচ্ছেন। পরপর আঘাতে বিধ্বস্ত প্রমথনাথের মনে হল, আপাতত এ মন্দের ভালো।

আটমাস পরে মহামায়া ফিরে এল। ইতিমধ্যে প্রমথনাথ দুবার ভাইদের পাঠিয়েছে, একবার নিজে গেছে। কিন্তু মহামায়াকে স্বাভাবিক করতে পারেনি।

অবশেষে আরো একবার নিজে গিয়ে মহামায়ার মুখোমুখি বসল প্রমথ। বলল, 'তুমি যদি ফিরে নাই যাও, ধাত্রীনগরের সংসার আমি তুলে দেব। অনাবশ্যক বসে বসে সংসার ধ্বংস হওয়া দেখে লাভ কী?'

মহামায়া অনেক কথাই বলতে পারত কিন্তু বলল না। প্রায় শিশু বয়স

থেকে নিজের হাতে তৈরি সংসার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এ কথা লোকমুখে সে আগেও পেয়েছে। মানুষটার বিশ্বাসঘাতকতা যতখানি বেজেছে, একটা গোছানো সংসার নষ্ট হয়ে যাওয়া তার থেকে কম বাজছে না। হায়রে মেয়ে মানুষের মন! উপরন্তু বাপের বাড়িতে ভাইয়ের সংসার। সেখানে অশান্তি এখনো হয়নি, হতে কতক্ষণ?

শুষ্ক তপস্বিনী সদৃশ, মুখের দিকে তাকিয়ে বুক ভেঙে গেল প্রমথনাথের। বলল, 'সবই আমার ভবিতব্য, নিয়তি। মানুষের জীবনে এমন সন্ধিক্ষণও আসে যখন কোনো কিছুই আর নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। বিশ্বাস করো আমি এখনো তোমাকে ভালোবাসি।'

মহামায়া শান্তস্বরে বলল, 'বিশ্বাস করি না!'

কিন্তু উঠে সে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল।

পরবর্তী জীবনে প্রমথনাথ কখনো আর মহামায়াকে নিজের শয্যায় পায়নি। তাকে ধাত্রীনগরেই বেশিরভাগ সময় থাকতে হত। ফলে স্বাভাবিক কারণেই স্ত্রী সহবাস তার জরুরি হয়ে উঠত এবং অনেক সময় প্রবল অস্বস্তির কারণ হত।

কিন্তু মহামায়া তার ইঙ্গিত কিংবা অনুরোধ উভয়ই নির্দয় উপেক্ষার সঙ্গে পাশ কাটিয়ে যেত।

অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছিল এর বছর চারেক বাদে ক্ষেমংকরকে এ বাড়িতে নিয়ে আসার পর। মহামায়া ক্ষেমংকরকে কোলে তুলে নেওয়ার মধ্যে অচেনা, অজানা এবং অদেখা মাধবীলতার উপর কিছুটা শোধ নেয়া হল হয়তো ভেবেছিল, কিন্তু প্রমথর শয্যাতে সে আর কখনো ওঠেনি।

কখনো কখনো যন্ত্রণা এবং হতাশায় বিনিদ্র রজনী কাটালেও প্রমথনাথ স্ত্রীলোকের এই আশ্চর্য ক্ষমতার উৎসকে খুঁজতে চেয়েছে। খুঁজে কিছু পাইনি। মহামায়াকে আরো নির্লিপ্ত এবং আরো নির্মম হতে দেখেছে।

১৮

অন্ধকার গভীর হয়েছে। বাড়ির কেউ এখনো টের পায়নি যে ক্ষেমংকর বৈঠকখানা ঘরে এখনো একাকী বসে আছে। তার মা মাধবীলতা তার মানসিক অবসাদ রোগের একটা দফা থেকে আরেকটা দফায় যাবার মাঝখানে কিছুদিনের জন্য একটা রেহাই পেত। সেইসব সময়ে সে ছেলেকে কাছে পেলে তার প্রাক্‌বিবাহ জীবনের কথা শোনাত। ক্ষেমংকরের বয়স সাত-আট বছর হতেই মা তাকে এমন সব কথা বলে ফেলেছিল, যা প্রমথনাথেরও জানা ছিল না। সম্ভবত, এ সবের কারণেই মায়ের মৃত্যুর পর এবং ক্রমশ বড় হতে হতে ক্ষেমংকর ক্রমশ আবিষ্কার করেছিল মায়ের সান্নিধ্য-ধারাবাহিকভাবে কিংবা বেশি দিন না পেলেও মাধবীলতার প্রভাব গভীরভাবে তার চরিত্রে গাথা হয়ে গেছে। দয়ালহরি আজ তাকে তার মায়ের প্রসঙ্গ তুলে শাসিয়েছে। তার মা-বাপ ব্রাহ্মণনির্দিষ্ট বিধান মতেই প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। এতদিন পরে মনে হচ্ছে প্রমথনাথ সেই মুহূর্তে অর্থ দিয়ে বশীভূত করলেও ধর্মকাম ব্রাহ্মণ্য সমাজ চল্লিশ বছর পার হওয়ার পরেও ছোবল মারার সুযোগ খুঁজছে। ব্যক্তি, পরিবার কিংবা সমাজ নয়। এমনকী ধর্মও বিবেচ্য নয়, ব্রাহ্মণ্য অহংকার শুধু নিজেকেই স্ফীত; শুধু নিজেকেই তৃপ্ত দেখতে চায়।

বিগত পাঁচশো বছর ধরে হিন্দুসমাজ যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। একই স্মৃতি, একই অনুশাসনের অধীন। সেই অনুশাসন যে কখন সমগ্র সমাজকে কঠিন নিগড়ে বেঁধে ফেলেছে, সে ব্যাপারে কারো কোনো যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং অনুশাসন আরো কত কঠিন করে ব্যক্তির উপরে, গোষ্ঠীর

উপরে প্রয়োগ করা যায়, সমাজের উচ্চশ্রেণি সর্বদা সেই পদ্ধতিকে আরো নিপুণ করতে ব্যস্ত। শ-দেড়েক বছর আগে চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ বেদবিরোধী বৈষ্ণবধর্মের যে প্লাবন সারাদেশে প্রবাহিত করেছিলেন, চতুর ব্রাহ্মণ্য তার ভিতরেও অন্তর্ঘাত করে বিভেদের প্রাচীর সেখানেও তুলে দিতে সমর্থ হয়েছে। হিন্দু সমাজের মানুষ শুধু দ্বন্দ্বে দীর্ণ, নিঃসঙ্গ, সব সময় একটা প্রবল অলীক ভয়ে হত্যোদম এবং কুণ্ঠিত।

ক্ষেমংকর শৈশব থেকেই নিঃসঙ্গ। সেই অবুঝ বয়সে তাকে যখন মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল, সেই সময় থেকেই একাকিত্ব লালন করতে শুরু করেছিল সে। যদিও প্রমথনাথের তার প্রতি মনোযোগ, আগ্রহ, কিংবা, স্নেহের কোনো অভাব ছিল না, যদিও মহামায়া তাকে সাগ্রহে বুকে টেনে তুলে নিয়েছিল, তবুও কোথাও একটা শূন্যতা ছিল। সেই স্মৃতি ক্ষেমংকরকে এখনো তাড়িত করে। প্রথম প্রথম তার ইচ্ছা হত পাখি হয়ে তার মায়ের কাছে উড়ে যায়। নিঃসঙ্গ শৈশবের সেই কাতরতা সে এখনো ভুলতে পারে না। মানুষের মধ্যে অবশিষ্ট একমাত্র প্রাকৃতির সম্পর্ক মা ও শিশুর।

প্রথম প্রথম অবশ্য প্রমথনাথ তাকে বছরে একবার দুবার পাঁচ-সাত দিনের জন্য মায়ের কাছে যেতে দিত। কিন্তু যখন বোঝা গেল যে ক্ষেমংকর এই বিচ্ছেদকে অগত্যা মেনে নিয়েছে, তখন মায়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা কমই হত তার জন্য। এই বিচ্ছেদের একটি বড় কারণ অবশ্য মাধবী নিজে। তার সেই 'ভূতে ধরার রোগ' বিয়ের বছর পাঁচেক বাদে ফিরে এসেছিল। রোগের আক্রমণের প্রথম পর্বে মাধবী ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে ফেলত। তখন অনেক বেশি সময় বিছানায় থাকত সে। এক ধরনের অশরীরী ব্যথা শরীরে বাসা বাঁধত তার। নিজের সন্তানের কিংবা স্বামীর প্রতি যাবতীয় কর্তব্য বিস্মৃত হত সে। শেষ পর্যায়ে সেই প্রাক্‌বিবাহ আত্মহত্যার প্রবণতা ফিরে এল তার। নিজের শরীরকে ঘৃণা করত সে। ফলে অযত্ন করত। কখনো কখনো কোনো অজ্ঞাত আক্ষেপ তাকে এমন পীড়িত করত যে আত্মনিগ্রহের স্থূল পদ্ধতি খুঁজে বার করত সে। এক হাত মাটিতে রেখে ভারী কিছু অন্য হাতে নিয়ে মারাত্মক আঘাত করত নিজেকে। প্রমথনাথ সামনে থাকলে 'আমি আর পারছি না, আমি আর পারছি না' বলে অজ্ঞান হয়ে যেত সে। এরকম এক-একটা পর্ব কখনো কখনো ছ-মাস, আট মাসও চলত। প্রমথনাথ এর ভিতরেও বাঙালি স্ত্রীলোকের মনস্তত্ত্বে

মগহার্মাদের প্রভাব দেখত।

প্রমথনাথের কাছে এ রোগের বিশেষ কোনো চিকিৎসা ছিল না। মাধবীকে সারা দিন মুহ্যমান কিংবা ঘুমিয়ে রাখার মতো ওষুধের ব্যবস্থা করা ছাড়া প্রমথনাথের আর কিছু করার ছিল না।

অবশেষে ক্ষেমংকরের যখন বারো বছর বয়স, দীর্ঘ আট মাসের কষ্টকর রোগে ভুগে মাধবী মারা যায়। তার অজ্ঞাত অপরাধবোধ যা তাকে সমস্ত রকম বিবেচনা সত্ত্বেও কখনো শান্তি বা স্বস্তি দেয়নি, প্রমথনাথের অকুণ্ঠ ভালোবাসা সত্ত্বেও তার নিজের কাছ থেকে রেহাই দেয়নি, শেষপর্যন্ত মন থেকে শরীরকে আশ্রয় করল। মাধবীর জরায়ুতে কিছু একটা সংক্রমণ বা ক্ষত প্রমথনাথের যাবতীয় চিকিৎসা ব্যর্থ করে ভয়ংকর আকার ধারণ করে। প্রমথ অনুমানে বুঝল এ নিশ্চয়ই জরায়ুর কর্কট রোগ, একবার হলে স্ত্রীলোকের যার থেকে রেহাই নেই। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে মাধবী যখন মারা যায়, ক্ষেমংকর তখন ঝালকাঠি বন্দর সংলগ্ন একটা গ্রামে প্রমথনাথের একজন সতীর্থের কাছে আয়ুর্বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষারত।

মায়ের মৃত্যুশয্যায় সে আসতে পারেনি, এমনকী মায়ের দাহকার্যে সময়মতো ক্ষেমংকর এসে পৌঁছতে পারেনি।

মায়ের সঙ্গে অবশ্য মানসিক সংযোগ তার শৈশব থেকেই ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই বারো বছর বয়সে মায়ের মৃত্যুসংবাদ একটা তাৎক্ষণিক এবং স্বল্পস্থায়ী শোকোচ্ছ্বাস ছাড়া তার উপরে তেমন প্রভাব বিস্তার করল না। কিন্তু যত বড় হতে লাগল, ততই বুঝতে শুরু করল যে মা তার চেতনা জুড়ে ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছে। মায়ের মৃত্যুর দু-এক বছরের মধ্যেই প্রমথনাথের আদর্শ এবং ইচ্ছানুযায়ী সে অবশ্য নিজেকে তৈরি করার ব্রতে একটা দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করল।

ঝালকাঠির রামগোবিন্দ রায়ের আয়ুর্বেদাচার্য হিসাবে খ্যাতি ছিল। রামগোবিন্দ প্রমথনাথের সতীর্থ। শুধু যে চরক, সুশ্রুত বা নাড়িমালা এবং নাড়িপ্রকাশে তার পাণ্ডিত্য ছিল, এমন নয়। রামগোবিন্দ ব্যাকরণ, দর্শন ইত্যাদিতেও সুপণ্ডিত ছিল।

ক্ষেমংকর পাঁচ বছর রামগোবিন্দ রায়ের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে প্রমথনাথের সহকারী হিসাবে ধাত্রীনগরে আরো পাঁচ বছর কাজ করল এবং ক্রমশ আয়ুর্বেদে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন করল।

১৯

ওলন্দাজ জাহাজখানা অমাবস্যার কোটালে ইলশা নদীর অগভীর মোহনা থেকে বহু কষ্টে সমুদ্রের নাব্য গভীরতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইয়েকব এখনো সোহাগপাশায় অবস্থান করছে। ইউসুফ জাহাঙ্গির এবং ক্ষেমংকরের অনুরোধে সে জাহাজখানাকে আরো দিন দশেক অপেক্ষা করানোর জন্য রাজি হয়েছে। জাহাজখানা মসুলিপত্তন হয়ে নাগাপত্তনে ওলন্দাজ জাহাজিদের প্রধান আড্ডায় ফিরে যাবে।

ওলন্দাজ জাহাজের অনুরোধ রাখার কারণ আছে। বছর কুড়ি আগে ওলন্দাজেরা বোর্নিওর মালাক্কা অধিকার করেছে। বাটাভিয়াতে তাদের ঘাঁটি আরো বিশবছরের পুরানো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ওলন্দাজ কোম্পানি তাদের বাণিজ্যনীতি-অনুরূপ অবাধবাণিজ্য প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বঙ্গোপসাগরে দেশ দখল করে, সৈন্যবাহিনী গঠন করেও পর্তুগিজরা একাজ করতে সফল হয়নি। পর্তুগিজ রাজশক্তি ইউরোপে এবং আরব সাগরে দুর্বল হয়েছে। এই সুযোগে ওলন্দাজ কোম্পানি নানাভাবে চেষ্টা করছে বঙ্গোপসাগরের বাণিজ্যকে এক তরফা কব্জা করতে, যেমনটি তারা বাটাভিয়াতে করতে সমর্থ হয়েছিল।

কাজেই মোগলদের সহায়তা ওলন্দাজ বণিকদের প্রয়োজন ছিল, আবার উলটোটাও হত। মগরাজা বা পর্তুগিজদের সঙ্গে বিরোধে মোগলরাও ডাচদের সহায়তা পেত।

কবিরাজ ক্ষেমংকর সেন বিদেশি পর্যটক এবং বিদেশি বণিকদের সঙ্গে ওঠবোস করার ফলে মনের গোপনে শৈশব থেকে গড়ে ওঠা ধনপতি

সওদাগর, চাঁদ সওদাগরদের উত্তরসূরি হওয়ার কল্পনা অনেক সময় ডানা মেলতে চাচ্ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্র বাংলা থেকে হুগলির কয়েকখানা ছোট জাহাজই এই মুহূর্তে সমুদ্রগামী হয়, তাও তাদের গন্তব্য মালদ্বীপ পর্যন্ত এবং পণ্য মালদ্বীপ থেকে নিয়ে আসা কড়ি। ধনপতি কিংবা চাঁদ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষার একটা পদ্ধতি আছে। মোগল সেনানায়কদের এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত পুঁজি বাণিজ্যে খাটে। প্রয়াত সেনাপতি মিরজুমলা গোলকোণ্ডার বিখ্যাত সমুদ্র বণিক। বর্তমান সুবাদার শায়েস্তা খানও মূলত বণিক।

হিন্দুশাস্ত্র বর্তমানে সমুদ্রযাত্রার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কিন্তু ক্ষেমংকর জানে ধনে এবং মানে কর্তৃত্ব হয়ে উঠতে পারলে তবেই সমাজকে শাসন করা যায়। ক্ষেমংকরের কাছে জাতপাতের বাছবিচার কোনো কালেই নেই, কোনো চিকিৎসকেরই থাকে না বা থাকা উচিত নয়। সে এইসব চিন্তা ভাবনা করেই ওলন্দাজ জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করবে স্থির করেছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পাওয়া গেছে যে, পর্তুগিজ জলদস্যুদের জাহাজখানা পশ্চিমের দিকে পাল তুলেছে। গুপ্তচরের মুখ থেকে আরো জানা গেছে যে বৃদ্ধদের এবং অল্প বয়স্ক স্ত্রীলোকদের নিয়ে তারা পিপলি বন্দরে যাবে। সমর্থ পুরুষদের নিয়ে মগেরা পুবমুখী পাল তুলে তাদের কোশা চালিয়েছে তাদের স্বদেশের দিকে। মোগলদের সঙ্গে বিগত যুদ্ধে পরাজিত হলে সেই ডামাডোলের সুযোগে দশ-বিশ হাজার দাস আরাকনের কৃষিক্ষেত্র থেকে পালিয়ে বাংলায় তাদের ঘরে ঘরে ফিরে এসেছে। এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য মগ দস্যুরা মরিয়া হয়ে আক্রমণ করতে শুরু করেছে। মগদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। সমর্থপুরুষদের কিছু অংশ রাজাকে দেবে, বাকিদের দাস করে নিজেদের খেত-খামার-গৃহস্থালিতে লাগাবে এবং যুবতী ও বালিকাদের তারা বিক্রি করে দেবে পিপলিতে। পিপলিতে দেশি-বিদেশি বহু ক্রেতা সস্তায় দাসদাসী কেনার জন্য অপেক্ষা করে। যেসব বৃদ্ধদের মগেরা আটক করেছে, তাদের পরিবারের কাছে ইতিমধ্যেই মগদের চর মুক্তিপণের ইঙ্গিত দিয়ে গেছে। সুবল কাঁসারির সঙ্গে মগের চরের সরাসরি কথাও হয়েছে যে পিপলিতে তারা তার বাবাকে হস্তান্তর করবে।

মিরবহর ইউসুফ জাহাঙ্গিরের কাছ থেকে ওলন্দাজ জাহাজে সমুদ্রযাত্রার

অনুমতি নিয়েছে ক্ষেমংকর। আউলাকেশি ডি সিলভা যাবে তার সঙ্গে। ধাত্রীনগরে লুণ্ঠিতাদের একজনের প্রেমিক স্বামী, আঁধারমানিক গ্রামের গোলাম সিদ্দিক নামে এক যুবক—যে আসলে গোবর্ধন কথিত ছোট লোকদের প্রতিনিধি, যাবে এই দলে। এই ছোটলোকদের মধ্যে একঘর কংসবণিক যথেষ্ঠ ধনী। তাদের দুই ঘর থেকে তিনটি বালিকা এবং এক বৃদ্ধ লুঠ হয়েছে। গোলাম কেন এদের প্রতিনিধিত্ব করছে, একথা ক্ষেমংকরের কাছে এখনো পরিষ্কার নয়। সবশেষে আঁধারমানিকের সদাশিব ওরফে সাদাত আলি এসে গোপনে ক্ষেমংকরের সঙ্গে দেখা করল।

'তুমি কেন যাবে?' ক্ষেমংকর তার কাছে জানতে চাইল।

সাদাত অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'বিষ্ণুপ্রিয়র ছোট মেয়েটির জন্য। সে শিশু বয়স থেকে আমাকে বড় ভালোবাসত। বাপের কোল ছেড়ে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে আসত। আমার ছেলের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়র ছোট মেয়েটির বিয়ে দেব, আমাদের দুজনের এক সময় এমন প্রতিজ্ঞা ছিল। পরে তো সব ভেস্তে গেল। এখন তো আবার একটা সম্ভাবনার দরজা খুলে গেছে! আমি জানি বিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্য তাদের ঘরে নেবে না, নিতে পারবে না। আমি তাদের আশ্রয় দিতে চাই।'

ক্ষেমংকর তাদের জন্য একটা পরিকল্পনা করেই রেখেছিল। বলল, 'আশ্রয়ের কথা পরে ভাবা যাবে। ধাত্রীনগরের উচ্চবর্ণীয়ের তরফে প্রতিনিধি এখন পর্যন্ত আমি একা। তিনঘর উচ্চবর্ণের ভিতরে এগিয়ে এসেছে এখন পর্যন্ত একঘর কায়স্থ। তুমি যদি থাকো আমার সঙ্গে তাহলে তো আমার সুবিধাই হবে।'

সাদাত বলল, 'আমি তো কারো প্রতিনিধিই হতে পারব না। তবে মুসলমান হয়ে, এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, জীবন অনেক সহজ হয়েছে। হিন্দু থাকলে এত সহজে কি এগিয়ে আসতে পারতাম?'

ক্ষেমংকর বলল, 'যথার্থ।'

বিষ্ণুপ্রিয়র ব্যাপারে ক্ষেমংকর অবশ্য কারো কোনো মতামতের অপেক্ষা করেনি। তার প্রাণ যথার্থই কাঁদছিল।

ইউসুফ জাহাঙ্গির পিপলির ফৌজদারের কাছে সরকারি শিলমোহরে একখানা চিঠি লিখে দিয়েছে মগ-ফিরিঙ্গিদের হাতে বন্দি মানুষদের মুক্তির ব্যাপারে যথাসাধ্য সহায়তা করতে।

সোহাগপাশায় মগদের যে দু'জন চর গোপনে কাজ করে, তাদের যেহেতু প্রয়োজনে স্থানীয় এমনকী মোগল ফৌজদারের দপ্তরও কাজে লাগায়, তাদের কোনোরকম সন্ত্রস্ত করা হল না। কিন্তু ফৌজদার যুগল সাধুকে গ্রেপ্তার করার দিন সাতেক পরে ক্ষেমংকরের কথায় ছেড়ে দিয়েছে। যুগলের রোগ তার আকাঙ্ক্ষার উলটো আরো ঘোরালো হয়ে উঠেছে এবং নানা ধরনের বিকার ও যন্ত্রণার পর্যায় শুরু হয়েছে। কবিরাজ বলেছে, সে যদি এই বিকারে মরে, সেটা তার কাছে আশীর্বাদ হবে। অন্যথায় বাকি জীবন তার নরক অপেক্ষা বেশি কষ্টকর হবে। ক্ষেমংকর যেন সমাজপতিদের বিরুদ্ধতার জন্য দুটি ঝুঁকি নিয়েছে। সে যে শুধু মগস্পৃষ্টদের উদ্ধার এবং সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এগিয়েছে, তা নয়, সে হিন্দুর নিষিদ্ধ সমুদ্র যাত্রাও করছে। যে স্মৃতিকারের দোহাই ক্ষেমংকর সেদিন দয়ালহরিকে দিয়েছিল, সমুদ্রযাত্রার প্রসঙ্গে সেই রঘুনন্দনের নির্দেশ অবশ্য সে মানল না। দিনক্ষণ দেখে ওলন্দাজ জাহাজ সমুদ্রে পাল তুলে দিল।

অনুকূল মৌসুমি বাতাসে, অনুকূল আবহাওয়ায় জাহাজ দ্রুত পশ্চিম মুখে এগিয়ে চলল।

সুবর্ণরেখা নদীর মুখে পিপলি বন্দর। মগ-ফিরিঙ্গি দস্যুদের জাহাজ পিপলির জাহাজঘাটা থেকে ক্রোশখানেক দূরে সমুদ্রের মধ্যে নোঙর করে থাকে। পিপলি বন্দর প্রতিষ্ঠা করে পর্তুগিজরাই। এই বন্দর প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ ছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে বন্দি করে, লুঠ করে আনা মানুষকে দাস হিসাবে বিক্রি করা। হুগলিতে পর্তুগিজদের ব্যানডেল প্রকৃতপক্ষে দাস ব্যবসারই কেন্দ্র ছিল। মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুরা এইসব দাসবাজারে প্রকাশ্যেই তাদের সওদা নিয়ে আসত। হিন্দু এবং মুসলমান আইনে যদিও ক্রীতদাস রাখার বিরুদ্ধে কোনো বিধিনিষেধ নেই, তবুও সম্রাট শাজাহান তার প্রজাদের এভাবে গোরু-ছাগলের মতো বাজারে নিয়ে এসে কেনাবেচা সমর্থন করতে পারেনি। পর্তুগিজদের সতর্ক করা সত্ত্বেও হুগলিতে তাদের দাসবাজার পুরোদমে চলতে থাকে সমস্ত নৃশংসতা নিয়ে। শেষে ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মোগল নওয়ারা পর্তুগিজদের ব্যানডেল অবরোধ করে এবং কামান দেগে সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেয়। দশ হাজার পর্তুগিজ এবং তাদের অন্যান্য

লোকজন এই যুদ্ধে নিহত হয়।

কিন্তু এ শুধু সাময়িক বিরতি। পর্তুগিজদের অন্যান্য স্থানেও দাস বাজার ছিল। পিপলি বন্দর তৈরি করেছিল পর্তুগিজরাই। পিপলিতে মোগল ফৌজদারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর জলদস্যুরা বন্দিদের নিয়ে সুবর্ণরেখার মুখে এসে নোঙর করত। তাদের তরফে একজন দূত এসে সম্ভাব্য ক্রেতাদের সঙ্গে পিপলিতে যোগাযোগ করবে, এই ছিল ব্যবস্থা।

ওলন্দাজ জাহাজে প্রথম সন্ধ্যায় আউলাকেশি তার অভিজ্ঞতায় গল্প করছিল। ন-বছর বয়সে মগেরা তাকে লুঠ করে নিয়ে যায়। মগের হাত থেকে ফিরিঙ্গিদের হাতে, ফিরিঙ্গির হাত থেকে দাসবাজারে বহু মানুষের হাত ঘুরে শেষে সে নিজের মানুষকে খুঁজে পায়। মগ-ফিরিঙ্গিদের সে শিয়াল কুকুরদের থেকেও বেশি ঘৃণা করে যদিও তার নিজের লোকটি পর্তুগিজ ফিরিঙ্গি। এই এক আশ্চর্য ব্যাপার, এদের মধ্যেও ভালো মানুষ, মহৎ মানুষ আছে। আরো এক আশ্চর্যের ব্যাপার এত সবের পরেও আউলাকেশি মরেনি। সে বোধ হয় সে মেয়েমানুষ বলে। মেয়ে মানুষের প্রাণ কি এত সহজে যায়?

সাতদিন একনাগাড়ে চালিয়ে সুবর্ণরেখা মোহনায় এল ওলন্দাজ জাহাজ। তাদের আশানুরূপ পুরানো একখানা ফিরিঙ্গি জাহাজ মোহনায় নোঙর করা ছিল। এ জাহাজে ওলন্দাজ পতাকা দেখে জলদস্যুদের জাহাজ সন্ত্রস্ত হলেও পাল তুলল না। ওলন্দাজ জাহাজখানা ধীরে ধীরে নদীর ভিতরে ঢুকে গেল।

পিপলির ফৌজদার জলদস্যুদের আক্রমণ করার কোনো চেষ্টা করে না কেননা সে ক্ষেত্রে নৌবলে বলীয়ান পর্তুগিজরা বন্দরের উপর ভয়ংকর প্রতিশোধ নেয়।

কী করে যেন সব খবর আগে থাকতেই প্রচার হয়ে যায়। ফৌজদার জানার আগেই আগ্রহী ক্রেতা দূর দূর থেকেও পিপলিতে এসে ভিড় করে। আসে ধনীরা যাদের পিতামাতাকে শুধু মুক্তিপণ দিয়ে ফেরত পাওয়া যাবে এই আশায় বন্দি করে আনা হয়েছে।

জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করার এক প্রহরের মধ্যে ক্ষেমংকর, ইয়েকব এবং আউলাকেশি তাদের পরিচয়পত্রসহ পিপলির ফৌজদারের দপ্তরে উপস্থিত হল। পিপলির জাহাজঘাটায় তখন অনেক ক্রেতা।

এইসব ঘটনার পর একবছর কেটে গেছে। ধাত্রীনগরে গ্রাম থেকে যারা তাদের স্বজনকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল তারা সবাই সফল হয়নি। কারো স্বজন মারা গেছে, কারো স্বজনকে পিপলিতে আনাই হয়নি, অন্য কোনো অজানা স্থানে চালান হয়ে গেছে হয়তো।

ক্ষেমংকর সেনের সৌভাগ্যবশত সে বিষ্ণুপ্রিয়র দুই কন্যা এবং স্ত্রীকে জীবন্তই পেল। অবশ্য মগদের চরের সঙ্গে গোপন বন্দোবস্ত আগেই করা ছিল। তাদের মুক্তির জন্য দাসবাজারের থেকে বেশি দামই দিতে হল। ক্ষেমংকরের অত্যধিক আগ্রহই এর কারণ। ফৌজদারের সুপারিশও দস্যুদের ব্যবসায়িক গৃধ্নুতাকে টলাতে পারেনি।

ক্ষেমংকর ও আউলাকেশি মুক্ত স্ত্রীপুরুষদের নিয়ে একখানা রক্ষীসহ কোশা ভাড়া করে নদী পথে সোহাগপাশা ফিরে এল। তারপরে শুরু হল আসল লড়াই।

ধাত্রীনগরের সমাজ দস্যুদের হাতফেরতা বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে মগস্পর্শ দোষে সমাজচ্যুত ঘোষণা করল। এই সঙ্গে যারা এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যের হিন্দুদেরও। মগ দস্যুরা সেই আক্রমণের সময় যাদের অঙ্গস্পর্শ করেছে, এমনকী যাদের দিকে থুথু ছিটিয়েছে 'মগো' পরিবাদে তারাও সমাজে অংশত ত্যাজ্য বলে ঘোষিত হল। ফলে কেউ কেউ নিগৃহীত হয়েও হিন্দু সমাজের এক প্রান্তে বংশানুক্রমে নির্যাতীত জীবনযাপনের প্রস্তুতি নিয়ে নামমাত্র হিন্দু থেকে গেল। অন্যেরা অনেকেই ধাত্রীনগরের ভদ্রাসন ও সম্পত্তি বিক্রি করে আঁধারমহিষের মসজিদে গিয়ে ইসলাম ধর্ম বরণ করল। ক্ষেমংকর বিষ্ণুপ্রিয়র স্ত্রী কন্যাকে সোহাগপাশায় আউলাকেশির হেপাজতে রেখে চিকিৎসা করতে শুরু করল। প্রথমে শারীরিক ক্ষতের পরিচর্যা এবং চিকিৎসা করার পর তাদের মানসিক আঘাত নিরাময়ের জন্য সচেষ্ট হল ক্ষেমংকর। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সংকটের বিষয় হল বিষ্ণুপ্রিয়র দিক থেকে কোনোরকম প্রতিক্রিয়ার সমান্য আভাস না পাওয়া। বিষ্ণুপ্রিয় তার স্ত্রীকন্যাদের একবার দেখতে পর্যন্ত এল না। ক্ষেমংকর ধাত্রীনগরে বারতিনেক লোক পাঠিয়েও পরিষ্কার বুঝতে পারল না যে সে স্বেচ্ছায় একাজ করেছে অথবা ধাত্রীনগরের সমাজ তাকে বাধা দিচ্ছে।

এই অসহায় অবস্থায় এবং সর্বদা নিজেকে অশুচি ভাবতে ভাবতে সত্যভামা একদিন বুঝতে পারল যে সে সন্তানসম্ভবা। তার দুর্বল শরীর

ও মনের উপর এই শেষ আঘাতটা তাকে একেবারে ভারসাম্যহীন করে ফেলল। অথবা সেইটুকুই ভারসাম্য রাখল, যতটুকু একজন মানুষকে দড়ি হাতে নিয়ে গাছের পাঁচ হাত উচ্চতায় উঠতে সাহায্য করে। সে আত্মহত্যা করল। সমাজ, পরিবার এবং নিজের হাত থেকে রেহাই হল তার।

কোনো এক রহস্যময় বা আশ্চর্য কারণে মঞ্জরী রোগাক্রান্ত কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েও উপদংশ রোগের শিকার হল না। সে খুব শীঘ্রই স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেল। ক্ষেমংকর কবিরাজের কাছে এও এক শিক্ষা।

পিতা পরিত্যক্ত দুই কন্যা গভীর অভিমান নিয়ে এক সময়ে বাঁচার নিয়মে ক্ষেমংকরকে আঁকড়ে ধরল। আর কবিরাজ ক্ষেমংকর এর প্রায় এক বছর পরে ঋতু পরিবর্তনকালীন জ্বর-জ্বালায় আক্রান্ত শর্মিষ্ঠার চিকিৎসা করতে শুরু করে টের পেল যে, কখন যেন নিজের অজ্ঞাতেই তার এককালীন বন্ধুকন্যার প্রতি সে অন্য ধরনের আগ্রহ বোধ করতে শুরু করেছে। সে ভারী বিস্মিত হয়ে এও লক্ষ করল যে শর্মিষ্ঠা যেন তার আগেই এ ব্যাপারটা জেনে বসে আছে। কোনো এক সন্ধ্যায় বিছানায় শোয়া শর্মিষ্ঠার জ্বর এখনো আছে কিনা দেখতে গেলে ক্ষেমংকর লক্ষ্য করল বালিকা তার চোখ অনুসরণ করছে। পাশে বসে কপালে হাত রাখলে শর্মিষ্ঠা বলল, 'ওখানে নয়, গলায় হাত দিয়ে দেখ।' সে নিজেই ক্ষেমংকরের হাত টেনে নিয়ে বুকের উপরে চেপে রাখল। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে না তো।'

ক্ষেমংকরের মনে হল, কী আশ্চর্য সুন্দর এই মেয়ে এবং উপলব্ধি হল সৌন্দর্যও যেন এক রকমের প্রতিভা।

একমাস পরে শবেবরাতের পর দিন ক্ষেমংকর, শর্মিষ্ঠা ও মঞ্জরী ফৌজদারের উপস্থিতিতে ইসলাম বরণ করল এবং একই অনুষ্ঠান বাসরে ক্ষেমংকর তার ঠিক অর্ধেক বয়সি শর্মিষ্ঠাকে বিয়ে করল।

২০

মহম্মদ নাসির, যে নামটিতে ক্ষেমংকরের অভ্যস্ত হতে সময় লাগবে এমন সে ভেবেছিল আসলে তেমন হল না। ইসলামের যা কিছু ভালো বলে তার মনে হয়েছিল এবং হিন্দুদের যা কিছু তার ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছিল, শুধু সেইসব কারণেই সে ধর্মান্তরিত হয়নি।

কিন্তু ইসলামের শৌর্য, বীর্য, আত্মমর্যাদাবোধ এবং সৌভ্রাতৃত্ব তাকে আকৃষ্ট করে ছিল সন্দেহ নেই। একটা দেশের আপামর মানুষ বহিরাগত মগ ও পর্তুগিজদের ধারাবাহিক নৃশংস আক্রমণে দেড়শো বছরের অধিক সময় ধরে শুধু কাঁপছে, তাদের সমস্ত রকমের উদ্যম, কর্মশক্তি, এমনকী প্রজনন শক্তিও হীনবল হয়ে যাচ্ছে এবং সমাজ তার বিরুদ্ধে কোনো সংঘবদ্ধ প্রত্যাঘাতের বদলে শুধু নিজেকে সংকুচিত করে নিচ্ছে, ভুক্তভোগী এবং অত্যাচারিত মানুষকে সস্নেহ আশ্রয়ের পরিবর্তে উলটো ততোধিক নির্যাতনের এবং শোষণের বন্দোবস্ত করেছে, ক্ষেমংকর এর প্রতিবিধানে ধর্মান্তরিত হওয়া ছাড়া নিজেকে বা ভুক্তভোগীদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থাপনা আর স্থির করতে পারল না।

আউলাকেশি যখন উল্লসিত কণ্ঠে জানাল, 'আমার নাতিন আপনারে কবুল করছে, মহম্মদ নাসির, তাইলে এখন হইতে আপনে আমার নাতিন জামাই হইলেন!'

সমবেত মানুষজন আউলাকেশির ঘোষণা শুনে আনন্দ প্রকাশ করল।

কিন্তু ক্ষেমংকর ওরফে মহম্মদ নাসিরের মনে পড়ে গেল একটা পুরোনো কথা। ছ-বছর বয়সে একদিন সটান সে প্রমথনাথের ওষুধঘরে এসে উপস্থিত

হল। প্রমথ দেখল শিশুর মুখ অস্বাভাবিক থমথমে।

'বাবা, মগের জারুয়া মানে কী?'

খলের মধ্যে ওষুধ, হাতে নোড়া, প্রমথনাথ থমকে চোখ তুলে তার দিকে তাকাল। ঘরে চার-পাঁচজন রোগীও আছে।

কিছু একটা অনুমান করে সে বলল, 'তুমি এখন ভিতরে গিয়ে খেল, পরে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব, কেমন?'

কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। ক্ষেমংকরের চোখমুখে অপমানের রক্তাভাস। বুদ্ধিমান শিশু সে, কিছু একটা যথার্থই অনুমান করে নিয়েছে, জেদ ধরে বলল, 'না, এক্ষুনি বলতে হবে, এক্ষুনি বলতে হবে!'

অপ্রস্তুত প্রমথনাথ খলনোড়া রেখে ছেলের হাত ধরে অন্দরে এল।

'কে বলেছে এই শব্দটা তোমাকে?'

'তুমি আগে বল মগের জারুয়া মানে কী?'

প্রমথনাথ মহাবিপদে পড়ল। মগের অর্থ যদি বা বোঝানো যাবে কিন্তু জারুয়া! প্রমাদ গণল প্রমথনাথ।

সে বলল, 'এটা একটা খারাপ কথা, এ কথার অর্থ তুমি এখন পরিষ্কার বুঝতে পারবে না। মগদের ছেলেমেয়েদের এ কথাটা বলা যায়।

'তুমি কি মগ?'

'না আমি মগ নই!'

'তবে ধনমাসিমা আমাকে মগের জারুয়া বলল কেন?'

এতক্ষণে প্রমথর কাছে বিষয়টা পরিষ্কার হল। ধনমাসিমা আখ্যাত মহিলা প্রমথর ছোটভাই মন্মথনাথের বড় শালি। স্বামী-পরিত্যক্তা এই মহিলা মন্মথের সংসারে আশ্রিতা। আশ্রিতা হলেও তার প্রতাপে মন্মথর সংসারের সবাই তো বটেই, তার ভাইদের সংসারের লোকজনও তটস্থ থাকে। কী কারণে, কে জানে, এ বাড়ির ছোটদের প্রতি তার সব থেকে বেশি আক্রোশ।

প্রমথর ভিতরে বহুদিন ধরে খোঁচা খেতে থাকা একটা জানোয়ার আত্মরক্ষার একটা গভীর কোটর বানিয়ে তার মধ্যে ঢুকে লুকিয়েছিল। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল তার। গভীর গোপন জায়গাটাতেও কেউ খোঁচা দিয়েছে। ছেলেকে দুহাতে ধরে পাশের তক্তপোশে বসে পড়ল সে। বেতপাতার মতো কাঁপছিল প্রমথ। সেই অবস্থায় চিৎকার করে ভাইকে ডাকতে লাগল সে।

'মন্মথ, মন্মথ!'

একটা কিছু হয়েছে বাড়িতে কেউ কেউ সে ব্যাপারটা টের পেয়েছিল।

মন্মথ এসে সামনে দাঁড়াতে ছেলেকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে খানিকটা সরিয়ে দিল প্রমথ। বলল, 'যাও তুমি, খেলতে যাও।'

ক্ষেমংকর বাইরে চলে এসেছিল কিন্তু বেশি দূর যায়নি।

প্রমথ ক্ষুব্ধ, অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'তোমার শালি ক্ষেমংকরকে ''মগের জারুয়া'' বলেছে, এ কথাটাও আমাকে শুনতে হল!'

মন্মথ ইত্যাদি তিনভাইয়ের প্রতিপালন শৈশব থেকে প্রমথই করেছে। অল্পবয়সেই পিতৃবিয়োগ হয় তাদের। প্রমথর ধারণা ছিল ভাইরা সেই ছোটবেলার মতোই অনুগত আছে তার।

মন্মথ খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ঠিকই কিন্তু তারপরে মোক্ষম কথাটা বলেও ফেলল।

বলল, 'তিনি কর্কশভাষী স্ত্রীলোক, তা আমরা সবাই জানি। আমি এ সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক করব এও ঠিক। কিন্তু দাদা, আপনার কৃতকর্মের জন্য আমাদের গোটা পরিবার যে মগোপরিবাদে দূষিত হয়ে গেছে, এ খবর আপনি রাখেন না? আজ দুবছর ধরে জ্যোতির বিয়ের জন্য চেষ্টা হচ্ছে। যে কটি সম্বন্ধ স্থির হচ্ছে, সবকটিই কোনো গোপন বা প্রকাশ্য সংবাদদাতার ভাংচিতে বিকল হচ্ছে। আমরা ঘোর বিপদে পড়েছি, এ কথা আর আপনাকে না জানালেই নয়।'

প্রমথনাথ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। জ্যোতির্ময়ী মন্মথর মেয়ে। তার বিয়ের ব্যাপারে যে এসব সমস্যা হচ্ছে, এ কথা আগে তাকে কেউ জানায়নি। তার মনে হল মন্মথ কিছু বাড়াবাড়ি বলছে। সমস্যা এত বিস্তৃত হলে সে অবশ্যই জানত। তবুও নির্বাক প্রমথ শূন্য দেওয়ালে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে রইল। সমস্যার সমাধান তার আয়ত্তের বাইরে সরে যাচ্ছে।

ক্ষেমংকর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও এই কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল। ছ-বছরের শিশু সাংসারিক জটিলতার জগতে সবে ঢুকতে শুরু করে। অত্যন্ত সংবেদনশীল ক্ষেমংকরের অভিজ্ঞতা বয়সের কারণেই কম কিন্তু বুদ্ধি কম নয়। সে এসব কথাবার্তার বেশ খানিকটা বুঝল, বেশ কিছুটা অনুমানে দুয়ে-দুয়ে চার করে নিল এবং বাকিটুকু মনের ভিতরে রাখল ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিটি সম্পর্কিত পর্যায়ের সঙ্গে মিলিয়ে উপলব্ধি করবার জন্য।

সেই পর্যায় কি তার এতদিনে শেষ হল? সারাজীবন ধরে যে নীল,

বাদামি, ছায়া-ছায়া নানা আত্মপ্রতারণা, আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্মধিক্কার, যুক্তি-তর্ক এবং কাটাছেঁড়া নিয়ে তার যাত্রা, আজ কি তার অবসান হল?

কে জানে, হয়তো হল। হয়তো আরো গভীর গহ্বরে পতন হল তার। কিন্তু এই মুহূর্তে অসম্ভব হালকা লাগছে নিজেকে।

কাজি বিয়ে পড়াবার জন্য তৈরি হল।

ইউসুফ জাহাঙ্গির সবিনয়ে প্রশ্ন করল, 'অপরাধ মাপ করবেন, মশাইয়ের গ্রামের বাড়িতে কোনো হিন্দু স্ত্রী আছে নাকি?'

কথাটা শুনে কোনো গোপন ক্ষতে আঘাত লাগল ক্ষেমংকরের। বাইশ বছর বয়সে তার শিক্ষা শেষ হতে প্রমথনাথ দু-বছর ধরে তার বিয়ের চেষ্টা করেছিল। যেসব পাত্রীর অভিভাবকেরা আগ্রহী ছিল, প্রমথনাথ কিংবা মহামায়া আদৌ তাদের নানা কারণে পছন্দ করেনি। এই নানা কারণের মধ্যে, অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা, বংশমর্যাদাই প্রধান ছিল। ঠিক এই কারণে তাদের পছন্দের পাত্রীরা কিছুদূর এগোনোর পর ক্ষেমংকরের মায়ের বিষয়ে সমস্ত কিছু জেনে পিছিয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে হতাশ প্রমথ কাশিতে আয়ুর্বেদাচার্য ত্রিভুবন গুপ্তের কাছে শিক্ষানবিশির জন্য ক্ষেমংকরকে পাঠিয়ে দেয়।

এই ব্যবস্থার দু-বছর পরে প্রমথনাথের মৃত্যু হলে ক্ষেমংকরের বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহী হওয়ার লোক সংসারে আর কেউ ছিল না। ঘনিষ্ঠদের কাছে আক্ষেপ করা ছাড়া মহামায়ার অবশ্য আর কিছু করার সামর্থ্যও ছিল না। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধা মাঝেমধ্যে এ নিয়ে শুধু বিলাপ করত।

ক্ষেমংকর নিজেকে সংযত করে হেসে বলল, 'আজ্ঞে না সাহেব, আমি এই একবারই বিয়ে করতে এসেছি।'

কাজি বলল, 'মহম্মদ নাসির, আপনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্যের কন্যা শর্মিষ্ঠাকে, বর্তমানে ধর্মান্তরের পর যার নাম হয়েছে বিবি সায়েমা, দুশো টাকা দেন মোহরের বিনিময়ে শাদি করতে কবুল করছেন?'

আগে থাকতে শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী ক্ষেমংকর ওরফে মহম্মদ নাসির বলল,'আলহামদোলিল্লাহ, কবুল করলাম।'

আরো দুবার কবুল করতে হল তাকে রীতিমাফিক।

এরপরে কাজি কোরান থেকে নির্বাচিত খুৎবা পাঠ করল। পাঠ শেষে সমবেতরা আল্লার কাছে দম্পতির সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে প্রার্থনা করল।

ইউসুফ জাহাঙ্গির করমর্দন করে বলল, 'মহান ইসলামের আশ্রয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনি অতি সঠিক কাজ করেছেন। ইসলাম এত সুস্পষ্ট এবং এর দলিল প্রমাণ এত উজ্জ্বল যে এতে কাউকে প্রবেশ করার জন্য বাধ্য করার প্রয়োজনই নেই, আলহামদোলিল্লাহ'

তিনদিন আগে ময়ূরী চলে গেছে। দশ বছর আগে কাশিতে একজন ধনী ব্যক্তি কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং আশ্রয়হীন মা সহ ময়ূরীকে চিন্তাভাবনা করেই আশ্রয় দিয়েছিল ক্ষেমংকর। ময়ূরীর মা ধনী ব্যক্তিটির রক্ষিতা ছিল। দেশে ফেরার পর ধাত্রীনগর ও আঁধারমানিকের মাঝামাঝি অংশে জমি কিনে তার মা এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাপের জন্য বাড়িঘর চাষের জমির ব্যবস্থাও সে করে দেয়।

প্রায় দশবছর ময়ূরী তার সঙ্গে শয্যা গ্রহণ করেছে। কী বিস্ময়! তিনদিন আগে যাওয়ার জন্য যখন যে অনুমতি চায়, তখন তার জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেছে।

'আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে যাবার জন্য অনুমতি চাই মালিক।'

ক্ষেমংকর তাকে সহসা আর প্রশ্ন করতে পারল না। অনেক পরে বলল, 'কেন? আমি বিয়ে করছি বলে?'

দুচোখ বেয়ে ধারায় জল নামছে ময়ূরীর। সে চুপ করে রইল।

'শর্মিষ্ঠা কিছু বলেছে?'

ময়ূরী নঞর্থক মাথা নাড়ল।

'তাহলে?'

ময়ূরী কাঁদতেই থাকল নিঃশব্দে। অনেক সময় ধরে কেঁদে একেবারে নিঃশেষ হল যেন।

ক্ষেমংকর অধৈর্য কণ্ঠে বলল , 'তাহলে তুই যাবি কেন?' বুক যে তারও ভেঙে আসছিল।

ময়ূরী শেষ পর্যন্ত ফুঁপিয়ে উঠে বলেই ফেলল কথাটা।

'আমি মোছলমানের ভাত খাব না, মালিক!'

ইউসুফ জাহাঙ্গিরের কথার সমর্থনে কাজি বলল, 'বেশক! ইসলাম দুনিয়ার একমাত্র সত্যধর্ম। হুজুর যথার্থ বলেছেন।'

ক্রমশ আত্মস্থ এবং গম্ভীর হয়ে যাওয়া মহম্মদ নাসিরের মনে হল, কে কাকে বেশি ঘৃণা করে? হিন্দু মুসলমানকে? না, মুসলমান হিন্দুকে? কোনোকালে কি এই ঘৃণার বাতাবরণ দূর হবে?

কে জানে! কে জানে! ভাবল সে।

২১

সুবেদারের আসনে বসে শায়েস্তা খাঁ প্রথমেই রাজকীয় নওয়ারা নতুন করে তৈরি করতে মনযোগ দিল।

পদ্মা এবং মেঘনার সঙ্গমে একজন দক্ষ সেনাপতির অধীনে দুশো জাহাজের ঘাঁটি বসল। তার কিছু দূরে ধাপার কাছে আরো একশো রণতরী থাকল অন্য একজন নৌ-সেনাপতির অধীনে। সমুদ্রে অভিযান চালিয়ে দিলালখান নামক একজন ভাগ্যান্বেষীকে, গনজালেসের পতনের পরে যে কিনা সন্দীপ দখল করেছিল, বিতাড়িত করল মোগল নওয়াবা। সন্দীপ অধিকারে আসার পর ইবনে হোসেন নামে একজন সেনাপতি সম্পূর্ণ রাজকীয় রণতরীর সেনাপতি নিযুক্ত হল। নবাব সুবেদার স্বয়ং অবিরাম জোগানের দায়িত্বে নিযুক্ত করল নিজেকে। এক রাত্রে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ইবনে হোসেন শত শত রণতরী নিয়ে আরাকানি রণপোতের উপর আক্রমণ শুরু করল।

সারারাত কাটল দুপক্ষে নিরাপদ দূরত্বের দাগাবাজিতে। পরদিন সকালে রাজকীয় রণতরীর বহর শত্রুর দিকে এগোল। প্রথম সারিতে বৃহৎ রণতরী, তারপরের সারিতে ঘুরাব, তারপরের সারিতে জলবা এবং সবশেষে কোশা শত্রুর উপর চড়াও হল।

মগের পোত পিছিয়ে দ্রুত কর্ণফুলি নদীতে পড়ল। মোগল নওয়ারা

নদীর মুখ বন্ধ করে শত্রুর পিছনে ধাওয়া অব্যাহত রাখল। পর্তুগিজ নৌসেনারা আগেই নবাবের কাছে থেকে উপঢৌকন নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল। মগবাহিনীর একশো পঁয়ত্রিশখানা রণতরী মোগল বাহিনীর অধিকারে এল। অসংখ্য মগ হতাহত হল, বাকিরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করল।

নবাব শায়েস্তা খানের সুযোগ্য পুত্র বুজুর্গ উমেদখানের অধিনায়কত্বে এরপরে চট্টগ্রাম থেকে মগদের বিতাড়ন সম্পূর্ণ হল। বহুকাল বাদে চট্টগ্রাম আবার বাংলার শাসকদের অধিকারে এল।

এরপর থেকে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে মগদের বড় বড় অভিযান বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের বিক্ষিপ্ত আক্রমণে বাংলার বিস্তীর্ণ উপকূল আরো অনেক দিন ধরেই সন্ত্রস্ত হয়ে রইল। অবশ্য শায়েস্তা খানের শক্ত হাতের শাসনে ক্রমশ স্বাভাবিকতা ফিরেও আসতে লাগল।

ধাত্রীনগরের চক্রবর্তী ভ্রাতাদের নেতৃত্বে ইদিলপুরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অন্যান্য সমাজপতিদের একটি সম্মেলন হল। সম্প্রতি মগ হার্মাদ এবং মুসলমান সংস্পর্শে যারা পতিত হয়েছে সেইসব মানুষদের মধ্যে বিশিষ্টদের নামধাম বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করা হল। সমাজ অত্যন্ত উল্লাসের সঙ্গেই ঘোষণা করল যে এতদঞ্চলের সনাতন হিন্দুধর্মের পবিত্রতা এখন পর্যন্ত রক্ষা করতে সে সমর্থ হয়েছে। একজন কায়স্থ সমাজপতি অবশ্য একটা হিসাব দাখিল করল যাতে দেখানো হয়েছে যে বিগত পঁচিশ বছরে সরকার বাকলার সীমার মধ্যেই অন্তত একলক্ষ মানুষ হিন্দুধর্মের পরিধি ছেড়ে ইসলাম আলিঙ্গন করেছে। এই ঘোষণায় ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা হর্ষই প্রকাশ করল। তাদের মতে এতেই প্রমাণ হয় যে হিন্দুধর্মের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণই আছে। রামকুমার ভট্টাচার্যর পরিবার সভায় বিষ্ণুপ্রিয় এবং তার কন্যার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করল।

ধাত্রীনগরের মগ লুণ্ঠিত, এমনকী মগস্পৃষ্ট মানুষদের জন্য চক্রবর্তী ভাইদের নির্দেশিত শৃঙ্খলাই ধার্য হল। এইসব মানুষের সামাজিক 'অপরাধের' কথা কোনো বৈবাহিক সম্পর্কে গোপন করা হলে, সমাজ ভবিষ্যতে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি বিধান করবে, এমন নির্দেশও দেওয়া হল। নিগ্রহ সত্ত্বেও যারা হিন্দুধর্ম আশ্রয় করে থাকবে, হিন্দু সমাজের পরিধির বাইরে আরো একটি অস্পষ্ট অঞ্চল তাদের জন্য নির্দিষ্ট হল। পরিধির বাইরে হলেও এই অপচ্ছায়া অঞ্চল হিন্দু অপবর্গেরই অন্তর্ভুক্ত বলে মেনে নেওয়া হল। এই নব বর্গায়ন মনুর ধ্রুপদী সূত্র ধরেই করা হল, এতে পণ্ডিতেরা সবাই স্বস্তি প্রকাশ

করল। হিন্দুশাস্ত্রে তর্কের যুক্তিজাল অসীম পর্যন্ত টেনে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সূত্রকে অনড় রাখতে হবে।

অঘ্রান মাসের এক দুপুরবেলায় বিষ্ণুপ্রিয় ভট্টাচার্য একদিন তার বাল্যবন্ধু ক্ষেমংকরের সঙ্গে দেখা করতে এল। মহম্মদ নাসির এবং সায়েমার বিয়ের পর মাত্র একমাস তখন পার হয়েছে।

চিকিৎসক হিসাবে ক্ষেমংকরের খ্যাতি আরো বিস্তৃত হয়েছে। জাহাঙ্গির নগরে নবাবের দপ্তরেও সে খ্যাতি পৌঁছেছে। মিরবহর ইউসুফ জাহাঙ্গির তাকে তৈরি থাকতে বলেছে। শিগগির হয়তো রাজধানীর চিকিৎসাকেন্দ্রে তাকে যোগ দিতে হবে। মগদের সঙ্গে মুহুর্মুহু যুদ্ধে অসংখ্য সৈনিক হতাহত হচ্ছে, তাদের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার জন্য প্রচুর চিকিৎসক দরকার।

বাড়ির বাইরের গাছতলায় বাঁশের মাচানের উপর মলিন পোশাক পরা শীর্ণ চেহারার একটি লোককে বসে থাকতে দেখে একজন পরিচারক এগিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই?'

বিষ্ণুপ্রিয় বলল, 'আমি একটু কবিরাজ মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি কি বাড়িতে আছেন?'

'তিনি এখন বিশ্রাম করছেন, তাছাড়া রোগী দেখার সময় তো পার হয়ে গেছে', ভৃত্য জানাল।

বিষ্ণুপ্রিয় বলল, 'আমি রোগী নই। আমি ধাত্রীনগর থেকে আসছি। কবিরাজ মশাইয়ের বিশ্রাম হয়ে গেলে একবার জানিও যে ধাত্রীনগর থেকে একজন দেখা করতে এসেছে, ততক্ষণ আমিও এই গাছতলায় বিশ্রাম করছি।'

ভৃত্য বিষ্ণুপ্রিয়র কথার ভঙ্গি এবং বাক্যের গঠন লক্ষ করল। গলায় দু-থাক তুলসীর মালা গায়ের সুতির চাদরের ফাঁক থেকেও বোঝা যাচ্ছে। বিশীর্ণ আগন্তুকের চোখের দৃষ্টিতে সীমাহীন ঔদাস্য, দূরত্ব বিভ্রম। একফেরতা নিম্নাঙ্গের বস্ত্রে সাধুসন্তের আচরণীয় রীতি।

ভৃত্য ভিতরে এসে সামনে পেল মঞ্জুরা বিবিকে, যার নাম মাসখানেক আগেও লোকে জানত মঞ্জরী। বাড়ির পুরাতন ভৃত্যেরা সব বিদায় নিয়েছে, নতুন মুসলমান পরিচারক বহাল হয়েছে জনাতিনেক।

'একজন লোক ধাত্রীনগর থেকে দেখা করতে এসেছে, বিবিসাব', ভৃত্য মঞ্জরীকে জানাল।

'ধাত্রীনগর থেকে? কী নাম বলল?'

'নাম তো জিজ্ঞেস করিনি।'

ঘর ছেড়ে অভ্যাসমতোই বাইরে এল মঞ্জরী অথবা মঞ্জুরা। আবার তৎক্ষণাৎ ভিতরে ঢুকে মাথায় কাপড় তুলে দিল।

অনভ্যাসের ঘোমটা মাথায় থাকে না। মঞ্জরী আবার আঁচল তুলে মাথায় রাখে।

ঘরের ভিতর থেকেই তাকিয়ে গাছতলার লোকটিকে তার চেনাচেনা মনে হল। তারপর চিনলও। সমস্ত শরীর নিমিষে অবশ হয়ে গেল তার। অনেক দিন ধরে জমে থাকা অভিমান নিমেষে বাষ্পের মতো শূন্যে মিলিয়ে গেল। অসহায়, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার বিষ্ণুপ্রিয়কে দেখে মুহূর্তে অগ্রপশ্চাৎ বিস্মৃত হয়ে গেল সে। একটা গোঙানো 'বাবা' চিৎকারের সঙ্গে সদ্য অভ্যস্ত আব্রু ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাইরে ছুটে এল সে।

বিষ্ণুপ্রিয় উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েকে দেখল, তারপর ছুটে এসে দুহাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে দুজনেই মাটিতে বসে পড়ল। এই তার সেই আদরের দুলালি। দুঃখ আর যন্ত্রণার আগুন সাঁতরে পার হয়ে এখনো যার উজ্জ্বলতা এতটুকু কমেনি। প্রক্ষিপ্ত মলিনতা মানুষের কোন অঙ্গ মলিন করে?

খবর পেয়ে ক্ষেমংকর উঠে বাইরে এসে বলল, 'বিষ্ণুপ্রিয়, চল, ঘরের ভিতর চল।'

শোক, অভিমান, হাহাকার, অনাগত ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোড়ন চলল প্রায় অর্ধ প্রহর। ইতিমধ্যে ক্ষেমংকর একবার খাওয়ার কথা উত্থাপন করল।

'তোমার যদি আপত্তি না থাকে বিষ্ণুপ্রিয়, রামরতন ভট্টাচার্য মশাইয়ের বাড়িতে তোমার জন্য আহারের বন্দোবস্ত করি?'

বিষ্ণুপ্রিয় বলল, 'আমি ইদানীং একাহারী হয়েছি, ক্ষেমংকর এবং সে কাজটা শেষবারের মতো ধাত্রীনগরের বাড়িতেই সেরে এসেছি।'

'অর্থাৎ!' ক্ষেমংকর তার কথার ভঙ্গিতে বিস্মিত এবং সন্ত্রস্ত হল।

বিষ্ণুপ্রিয় বলল, 'হ্যাঁ ক্ষেমংকর, আমি চিরজীবনের মতো দেশত্যাগ করে বৃন্দাবন যাচ্ছি আর সেই কারণেই তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। এবার উঠতে হবে, সন্ধ্যা হতে আর বেশি দেরি নেই। আজ শেষ রাত্রে সোহাগপাশার ঘাট থেকে তীর্থযাত্রীদের নৌকা ছাড়বে।'

খানিক সময় চুপ করে থেকে ক্ষেমংকর বলল, 'তাহলে বৈষ্ণবপন্থার

মধ্যে তুমি শেষ পর্যন্ত সত্য এবং শান্তি খুঁজে পেয়েছ?'

বিষ্ণুপ্রিয় যে তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গভীর চিন্তাভাবনা করেছে, তা বোঝা গেল।

সে বলল, 'শান্তির কথা এ জীবনে আর ভাবি না, সত্য কাকে বলে, তাও জানি না। তবে আজীবন যে সব কথা বিশ্বাস করেছি, সেখান থেকে সরে যাব কোথায়? তোমার কোনো ধর্মবিশ্বাস আছে, এমন আমার কখনো মনে হয়নি। এমনকী তোমাকে আমার সেই প্রথম যৌবন থেকে নাস্তিকই মনে হয়েছে। তবু তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছ। মনে হয়, এতদিনে তুমি তোমার বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছ। আমি তো আগাগোড়াই বৈষ্ণব, মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের অনুসারী। আমি এখন আর সত্য খুঁজি না, আমি একটা জীবনচর্যা শুধু খুঁজি, যা আমার কাছে আদর্শ মনে হবে। তুমি কি ধর্মান্তরে তোমার সত্যকে খুঁজে পেয়েছ?'

ক্ষেমংকর শুষ্ক হেসে বলল, 'আমার কথা ছাড়ো, আমি বিশ্বাসের জন্য কিংবা সত্য খোঁজার জন্য ধর্মান্তরিত হইনি। তবে আমিও তোমার মতো একটা জীবনচর্যা খুঁজি, তার সঙ্গে ধর্ম বা আস্তিক্যের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি মানুষ হিসাবে কিছু কর্তব্য ও সামাজিক দায়িত্বের কথা ভাবি। যা সঠিক মনে করি, সাধ্যমতো তা করতে চাই।'

বিষ্ণুপ্রিয় অনেক সময় চুপ করে থেকে বলল, 'কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালনের মতো সাহস এবং কর্মক্ষমতা সকলের থাকে না। আমার নেই, কিন্তু চিরকাল স্বীকার করেছি, তোমার আছে। এখন মনে হয় ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে এর যেন একটা সম্পর্ক আছে। আস্তিক্য মানুষকে কমবেশি নিয়তিবাদী করবেই। নিয়তি আমার যাবতীয় ইন্দ্রিয় ব্যাধিগ্রস্ত করে ফেলেছিল, সে তুমি দেখেছ। এই সব উপলব্ধির কারণেই আমি তৃণের থেকে দীন এবং বৃক্ষের থেকেও সহিষ্ণু হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি জানি ক্ষেমংকর যে, এতেও প্রবল সাহসী হতে হয়। তোমার কাছে এবং আমার দুই কন্যার কাছে আমার প্রার্থনা, এই লক্ষ্যে পৌঁছতে তোমরা আমাকে সাহায্য কর। আমি এখন উঠব ক্ষেমংকর।'

সে আপ্লুত হয়ে কাঁদতে লাগল। তার সঙ্গে তার কন্যারা। সজল হয়ে উঠল ক্ষেমংকরের চোখও।

কিছু সময় পরে ক্ষেমংকর স্বয়ং তাকে নদীর ঘাটে তীর্থযাত্রীদের নৌকার আড্ডায় পৌঁছে দিল।